গল্পবিচিত্রা

61629

মযহারুল ইসলাম

গল্প বিচিত্রা

সম্পাদক

ডক্টর মযহারুল ইসলাম

স্টুডেন্ট ওয়েজ ॥ ঢাকা

GALPA BICHITRA
By
Dr. Mazharul Islam
Rs. 8·00

প্রকাশক ঃ
মোঃ ওহিদউল্লাহ
ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ
বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৫৯
দ্বিতীয় সংস্করণ,
ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৬৯
দ্বিতীয় সুলভ-সংস্করণ,
জুন ঃ ১৯৬৯
প্রচ্ছদপট ঃ কালাম মাহ্‌মুদ
মুদ্রণে ঃ
এম. চৌধুরী
রিপাবলিক প্রেস,
২, কবিরাজ লেন, ঢাকা।

মূল্য ঃ আট টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

গল্প		নাম		পৃষ্ঠা
একরাত্রি	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১
সমাপ্তি	...	,,	...	৯
অতিথি	...	,,	...	৩১
দুর্বুদ্ধি	...	,,	...	৫২
ফেল	...	,,	...	৫৮
মন্ত্রশক্তি	...	প্রমথ চৌধুরী	...	৬৩
মহেশ	...	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৬৯
চিকিৎসা-সঙ্কট	...	রাজশেখর বসু (পরশুরাম)	...	৮৩
পুঁই মাচা	...	বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৯৫
আবহাওয়া	...	মাহাবুব-উল্ আলম	...	১১১
ইমারত	...	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১১৮
পদ্ম-গোখরো	...	নজরুল ইসলাম	...	১৫০
মানুষের মন	...	বনফুল	...	১৬৯
পুন্নাম	...	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	১৭৪
সমুদ্রের স্বাদ	...	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৮৮
ফসিল	...	সুবোধ ঘোষ	...	১৯৭
পাদটীকা	...	সৈয়দ মুজতবা আলী	...	২১২
উস্তাদ মেহেরা খাঁ	...	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	২২২
রস	...	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	২৪৩
নতুন জন্ম	...	শওকত ওসমান	...	২৬৬
মিলনান্ত	...	বিমল মিত্র	...	২৭৯

গল্প		নাম		পৃষ্ঠা
শাড়ী বাড়ী গাড়ী	…	আবু রুশদ	…	২৯৩
দুই তীর	…	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	…	৩০৬
জিব্রাইলের ডানা	…	শাহেদ আলি	…	৩৩০
এপার ওপার	…	মযহারুল ইসলাম	…	৩৪৯
✓ জোঁক	…	আবু ইসহাক	…	৩৫৯
কয়লা কুড়ানো দল	…	আলাউদ্দিন আল্ আজাদ	…	৩৬৮
লাল মেঘ	…	আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	…	৩৮৬
কালামাঝির চড়নদার	…	সৈয়দ শামসুল হক	…	৪০০

ভূমিকা

বিবর্ত্তন

……

মানুষের গল্প বলার ও শোনার প্রবণতা চিরন্তন। প্রাগৈতিহাসিক গুহা জীবনে যখন জীবন ও জীবিকা ছিল ঘোর অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ, সেদিনও অন্ধকার অরণ্যতলে স্তিমিত আলোছায়ার সম্মুখে বসে মানুষ তার কাহিনী শুনবার এক নিগূঢ় আগ্রহকে বার বার প্রশ্রয় দিয়েছে। সে কাহিনী শুনেছে দুঃসাহসী শিকারের, প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ উলংঘনের এবং অনুকূল সূর্যের। সেই সব কাহিনী লোকের মুখে মুখে শাখায়িত এবং পল্লবিত হয়েছে--আর জন্ম নিয়েছে রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, প্রাণীবাচক লোককাহিনী ইত্যাদি—এ-সবের জন্মলগ্নে মানুষের দুর্লভ হৃদ্যতার এবং অবাধ কল্পনার সীমান্তকে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, স্মৃতিকথাসংগ্রহ, হিতোপদেশ, জাতক কাহিনী, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কাহিনীমালা বহুদিন ধরে মানুষের মধ্যে অখণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এসব কাহিনী সেদিনের শিশুমনকে যেমন দিয়েছিল দুর্লভ ঐশ্বর্য, তেমনি লোকশিক্ষা ও লোকচরিত্র নির্মাণে এগুলো কাজ করেছিল সমুজ্জ্বল আলোক-বর্তিকার অসামান্য ভূমিকায়। পৃথিবীর ঐতিহ্যবান সকল দেশেই কাহিনী-ভাণ্ডারের যে বিপুল সমৃদ্ধি দিনের পর দিন উন্মোচিত হয়ে চলেছে, তার মূলে রয়েছে লোকজীবনের কাহিনী শুনবার অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা, তার উৎস নিহিত আছে আদিম থেকে আধুনিক মানুষের কাহিনীর প্রতি অবিসংবাদিত আকর্ষণের বিবর্তনময় ইতিহাসে। আসলে যুগে যুগে বিচিত্র-ধর্মী কাহিনীর মধ্যেই মানুষ নিবিড় করে নিজেকে জানতে চেয়েছে—অনাবিল আনন্দে আবিষ্কার করতে চেয়েছে তার মানস-প্রকৃতিকে ও তার সার্বিক প্রতিকৃতিকে।

বিশ্বের ছোট গল্পের সৃষ্টি বিবর্তনের ইতিহাস জানতে হলে বোধকরি আদিম মানুষের কাহিনীর প্রতি এই যে আকর্ষণ তার উৎস থেকেই ঐতিহাসিককে যাত্রা শুরু করতে হবে। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের সুবিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবেশের অবকাশ আমাদের নেই। এখানে শুধু একথা জানলেই বোধকরি যথেষ্ট হবে যে, ছোট গল্প মানুষের জীবন-ভিত্তিক এবং উপন্যাসের পাশাপাশি প্রায় তার জন্ম—তবু ছোট গল্প উপন্যাসের মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্রাবয়ব প্রকারভেদ মাত্র নয় – এর সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে আধুনিককালের যুগযন্ত্রণা থেকে। আর সত্যিকার ছোট গল্প বলতে আজ আমরা যা বুঝি তার উন্মেষ হয়েছে প্রাচ্যে নয়, পাশ্চাত্য অঞ্চলে। বলা যেতে পারে, ওভিদের "মেটামর্ফোসিস" একদিন ছোট গল্পের সূতিকাগারের কাঠামো প্রস্তুত করেছিল। অনুরূপভাবে বোক্কাচিও'র "ডেকামেরন", চসারের "ক্যান্টারবেরী টেল্‌স" এবং র‍্যাবলের গার্গান্তুয়া – পান্তাগুয়েল প্রভৃতিতে প্রথম জনজীবনের বিচিত্র আচরণ একটি অসংহত বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করবার প্রয়াস প্রতিফলিত হয়েছে, যে প্রয়াস পরবর্তী কালে ছোট গল্পের উপাদানে রূপান্তরিত হবার পথ খুঁজে পেয়েছে।

একথা বলা যেতে পারে যে, পাশ্চাত্যে এবং বলতে গেলে সারা বিশ্বে ফরাসী দেশ ছোটগল্পের শরীর ও প্রাণশক্তি নির্মাণে ছোটগল্পের ইতিহাসে আজো সার্থক দিশারী হিসেবে চিহ্নিত। ছোটগল্পের চারিত্র্য ও মেজাজ যেসব লেখকের সাধনায় বারবার বিবর্তিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ফরাসী লেখক প্রস্পার মেঁরিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শক্তি ও অবদানের কথা স্মরণে রেখেই বলতে হয় বোক্কাচিও পাশ্চাত্য জগতে ছোটগল্পের জন্য এনেছিলেন কাহিনীর দিক-নির্দেশনা, চসার চরিত্রের, র‍্যাবলে সংলাপের, আর সবার উর্ধে মেঁরিমে দিয়েছিলেন ছোটগল্পের তির্যক গঠন শিল্পের এক সুনির্দিষ্ট পথসন্ধান। চসার, র‍্যাবলে, মেঁরিমে প্রভৃতির পথ ধরে ধীরে ধীরে সাহিত্য জগতে দেখা দিল একদিকে যেমন যুগযন্ত্রণায় অস্থির মানুষের সংক্ষিপ্ত সংলাপে আবর্তিত ছোটগল্প প্রণয়নের অশান্ত প্রেরণা, অন্যদিকে তেমনি জাগলো মানুষের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনা মিশ্রিত অখণ্ড জীবনের রূপায়ণ-বাসনায় উদ্দীপিত বিপুলকায় কাহিনী রচনার এক অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা। এই বিবর্তনের উজ্জ্বল

আলোয় সাহিত্যের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন রিচার্ডসন, ডিকেন্স ফ্লবেয়ার, কোলা, টলষ্টয়, গোর্কী প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা। এই প্রেরণারই উৎস অবলম্বন করে জীবনের দুঃখভারাক্রান্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সার্থক ছোটগল্প সাহিত্যের জন্মদান করলেন আমেরিকার এডগার এ্যালান পো। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে ফ্লবেয়ার শিষ্য মোঁপাসা যেদিন আবির্ভূত হলেন ছোটগল্প রচনার আসরে, সেদিন সারা বিশ্বের অপেক্ষমান পাঠক সমাজের বিস্ময় তরঙ্গ যেন নতুন এক আবেগের উপলরেখায় এতে প্রতিহত হোল। ঘটনার নাটকীয়তা, চরিত্রসৃষ্টির বাস্তবতা, জীবন অধ্যয়নের প্রোজ্জ্বল আকাংখা এবং সর্বোপরি গল্পগ্রন্থনার অনন্যসাধারণ কলাকৌশল মোঁপাসার ছোটগল্পগুলোকে বিশ্বের সামনে এক নতুন অথচ উর্বর সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল—বিশ্বের সাহিত্য জগতে এক অভিনব দিগন্তের অর্গল যেন সহসা উন্মোচিত হয়ে বিপুল সম্ভাবনার ইংগিতকে ভাস্বর করে তুললো। মোঁপাসার গল্পের রূপকর্ম আমাদের সত্যি বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। এ বিষয়ে তাঁর গুরু ফ্লবেয়ারের কঠোর নির্দেশ ছিল, তিনি নিজেই শিষ্যের কোন কোন রচনাংশ বর্জন করে পুনর্লিখনে বাধ্য করেছেন। উপন্যাসের সার্থকতা যেমন জীবনের বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে অজস্র গ্রহণে, ছোটগল্পের সার্থকতা তেমনি জীবনের বিশেষ বিশেষ এলাকা থেকে প্রচুর বর্জনে—মোঁপাসা এ শিক্ষা তাঁর গুরুর নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর গল্পে জীবনের অবান্তর অংশ ঠাঁই পায়নি। মোঁপাসার রচনায় বস্তুনিষ্ঠতা যেন এক সংগীত ধ্বনিতে মুখর হয়েছে। গুরুর নিকট থেকে শিক্ষানবিশী লাভ করলেও মোঁপাসা গুরুর কৃতিত্বকে নিজের শক্তিতেই অতিক্রম করেছিলেন। আসলে মোঁপাসার গল্পনির্মাণের সার্থকতা নিহিত ছিল তাঁর নিজস্ব চারিত্র্যে, তাঁর সংবেদনশীল মননে। জীবনের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁর ছোটগল্পগুলো তারই প্রতিভাষণে অভিষিক্ত। তিনি জীবনের রূপকার মাত্র ছিলেন না—ছিলেন একজন সুদক্ষ শিল্পী। রূপকর্ম ও শিল্প-প্রকরণ এই দুই সীমান্তের সমন্বয় সাধনে তাঁর যে সাফল্য তার পশ্চাতে ছিল তাঁর দীর্ঘ দিনের দুর্জয় সাধনা। তাঁর 'নেকলেস' গল্পটির কথাই ধরা যাক। গল্পটি বিশ্বসাহিত্যে অসাধারণ। এ-গল্পে একটি মেকী

নেকলেসের জন্যে নায়ক নায়িকার প্রাণান্ত পরিশ্রম এবং জীবনের মূল্যবান আয়ু অপচয়ের মাধ্যমে তাহাদের নিদারুণ বঞ্চনা যেমন বাস্তব তেমনি করুণাঘন হয়ে উঠেছে। গল্পটি পড়েই মনে হবে লেখক যেন মানুষ সম্পর্কে তাঁর সঞ্চিত ও অর্জিত এক সম্প্রসারিত অভিজ্ঞতাকেই অভিনব তির্যক দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পরশপাথর' কবিতার কথা মনে হতে পারে, কিন্তু সেখানে বর্তমান সভ্যতা উদ্ভূত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ নেই, সেখানে সমাজ নিরপেক্ষ চিরন্তন মানুষের ক্ষুব্ধ দুঃশ্চেষ্টাই বিদ্রূপায়িত হয়েছে, পক্ষান্তরে 'নেকলেস' গল্পে সভ্যতার উৎকট অন্তসারশূন্যতা উন্মোচিত হয়েছে এবং একটি শাণিত অথচ অশ্রুসজল হিউমারে গল্পের পরিসমাপ্তি মৃত্যুর মতই ধীরে ধীরে বিলীয়মান হয়েছে। মোঁপাসার এই জাতীয় কৃতিত্বই বিশ্বসাহিত্যে ছোট গল্পের সম্ভাবনাকে এক উজ্জ্বল সূর্যালোক-রঞ্জিত জগতে পোঁছে দিয়েছে।

পাশ্চাত্য অঞ্চলে ছোটগল্পের বিবর্তনে মোঁপাসার ভূমিকা শুধু সার্থক পথ সৃষ্টিতেই নিঃশেষিত নয়। তাঁর যাত্রা এই সাহিত্যের প্রায় প্রাথমিক যুগ থেকে মধ্যাহ্ন-লোক পর্যন্ত। একারণেই তাঁর আরো দু'একটি গল্পের কথা বর্তমান আলোচনায় স্মরণ করা অপরিহার্য মনে করছি। মোঁপাসা লিখিত আমার আর একটি প্রিয় গল্পের কথা এখানে উল্লেখ করব— গল্পটি 'দি ষ্টোরি অব অ্যান ওল্ড হর্স''। বর্তমান সমাজের শ্রেণী বৈষম্য ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি একটি তীব্র ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করা হয়েছে এই গল্পে। ঘোড়াটি যেহেতু বৃদ্ধ এবং অক্ষম হয়ে পড়েছে, সেজন্যে স্বার্থপর ও পঙ্কিল সমাজে তার বাঁচবার অধিকার নেই। অথচ জীবনের প্রতি কি গভীর আকুতিই না এই বৃদ্ধ অশ্বের চালচলনে ও চিন্তা ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে—আর সেই স্বাভাবিক আকুতিকেই যখন শ্যামল শস্যের সন্নিকটে উপস্থাপিত করে একটি রজ্জুবদ্ধ নিষিদ্ধ পরিধিতে উৎসাহের সঙ্গে নিহত ও হত্যা করা হয়েছে, তখন আমরা উপলব্ধি করেছি স্বার্থের চক্রান্তে উন্মাদ ও দ্বন্দ্বমুখর বর্তমান সমাজে সবার পক্ষেই সবকিছু পাওয়া সম্ভব নয়। আর সে কারণেই অক্ষমের দীর্ঘশ্বাসে এ-গল্পের হাহাকার যেন মর্মস্পর্শী হয়েছে। এ গল্পের সামগ্রিক কাঠামো জীবনচেতনার গভীরতায় যেমন প্রোজ্জ্বল, তেমনি বর্তমান বৈশ্যসভ্যতার হৃদয়হীন কপটতা উদ্‌ঘাটনেও অমোঘ শক্তির

পরিচয়ে অনন্যসাধারণ। এমনি করেই মোঁপাসা একের পর এক তাঁর যুগের মানব সমাজের বিকৃতিকে তাঁর ছোট গল্পে তুলে ধরে আমাদের স্থবির অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছেন। একটি নারী পতিতা হলেও যে মহতী মানবগুণে গুণান্বিতা হতে পারে তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ রচনায় ব্যুঅল দ্য সুইফ বা 'চর্বি গোলার কাহিনী' গল্পে। একটি পতিতার মধ্যে যে সহৃদয়া নারীর আবির্ভাব এই গল্পের নায়িকার চরিত্রে জাজ্জ্বল্যমান হয়েছে তা চিন্তাশীল পাঠকসমাজকে নতুন জিজ্ঞাসায় উদ্‌বোধিত করে তোলে। এই গল্পে মোঁপাসার লক্ষ্য সমাজের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ। মার্জিত মুখোশের অন্তরালে তাদের ভয়াবহ ও প্রচ্ছন্ন মুখচ্ছবি যে কত ক্লেদাক্ত ও ঘৃণিত হতে পারে মোঁপাসা এই গল্পে একটি পতিতার কাহিনীতে তা বিশিষ্টরূপে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। এ-ছাড়া তাঁর অনুরূপ আরেকটি গল্পে তাঁরই সৃষ্ট বিগতযৌবনা অভিনেত্রীর বিষণ্ণবেদনার চারপাশে অভিজাত সমাজের অন্তসারশূন্যতা যে কী জঘন্য আয়োজনে সমৃদ্ধ, তার প্রতি যেন মোঁপাসার একটি নির্বিকার আক্রোশ ও বিদ্রূপাত্মক অনুকম্পাও তিনি প্রকট করে তুলেছেন।

মোঁপাসার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার আর একজন প্রিয় ইউরোপীয় ছোটগল্প লেখক আন্তন চেকভের (জন্ম ১৮৬০ খ্রীঃ) কথা স্মরণ করব। বয়সে তিনি মোঁপাসার মাত্র দশ বছরের ছোট, কিন্তু অনুভূতির নিবিড় দাহনে মাঝে মাঝেই মনে হয়, মোঁপাসার তুলনায় চেকভ যেন অধিকতর সিদ্ধহস্ত। চেকভের গল্পে পরিদৃশ্যমান জীবনের একটি অখণ্ড ভাববলয় যেন মোঁপাসাকে অতিক্রম করেছে। একটি জ্যোতির্ময় আবেগের উত্তপ্ত পরিবেষ্টনীতে চেকভের ছোটগল্প যেন কোন বাস্তব গীতিকবিতার আস্বাদন বহন করে আনে। ঘটনা সংস্থানে মোঁপাসার মত চেকভের ছোটগল্পে নাটকীয় চমক হয়তো প্রায়শই অনুপস্থিত, কিন্তু অতি নগণ্য ও সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনাও যে মানুষের জীবনে কত বৃহৎ ও মহৎ ব্যঞ্জনা বয়ে আনতে পারে আর সেই ঘটনাও যে আশ্চর্য ও শক্তিশালী ছোটগল্পের উপাদানে পরিণত হতে পারে, চেকভ যেন তাঁর সৃষ্টিতে তারই প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গল্প পড়ে মনে হয়, আমাদের চারপাশের অতিপরিচিত সাধারণ

চরিত্রগুলোই আমাদের কাছে কত অপরিচিত—একটি সংহত অথচ ঋজু আলোক-সম্পাতে তিনি যেন আমাদের দৈনন্দিনতাকে দুর্লভ অসাধারণত্বে উন্নীত করেছেন। ব্যঞ্জনাগর্ভ মিতভাষণ চেকভের গল্পগুলোর মহৎ বৈশিষ্ট্য। হৃদয়ের গভীরতম সহানুভূতির অপক্ষপাত বণ্টনে তাঁর চরিত্রগুলো যেন বিচিত্র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে চেকভের দু'একটি গল্পের আলোচনা করা এখানে সঙ্গত মনে করছি। তাঁর 'দামুশ্চকা' গল্পের 'ওলেঙ্কা'র কথাই ধরা যাক। একাধিক পুরুষের সান্নিধ্যে 'ওলেঙ্কা' যে ভাবে তার মনোরঞ্জন বাসনা চরিতার্থ করেছে সামাজিক দৃষ্টিতে তা পতিতাসুলভ মনে হতে পারে, কিন্তু চেকভের অমর লেখনি এই নারীর মানসিক প্রেমকে চিরন্তন প্রেমের আবরণে ভাস্বর করে তুলেছেন। এ ছাড়া গল্পের পরিণতিতে 'ওলেঙ্কা'র বঞ্চিত মাতৃহৃদয় তার প্রাক্তন স্বামীর পুত্রকে কেন্দ্র করে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা যেমন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে অন্যদিকে তেমনি আবার নারী ও মাতা হিসেবে তার নিদারুণ অসহায়তার জন্য পাঠকচিত্তে এক বিনম্র সমবেদনা উৎসারিত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আমাদের হয়তো মোঁপাসার 'ব্যুঅল দ্য সুইফ' গল্পটির কথা মনে হতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে মোঁপাসার এই গল্পে একটি নারীচরিত্রের অন্তর্নিহিত করুণা ও মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, পতিতাবৃত্তির নীচতা এই নারীর মাহাত্ম্যকে কলঙ্কিত করতে পারে নি। অন্যদিকে চেকভের 'ওলেঙ্কা', বাইরের দিক থেকে সমাজের আর দশজন নারীর মতই জীবনাচরণ করলেও সে একজন অপেশাদার পতিতার গ্লানিতে সঙ্কুচিতা—কিন্তু তার এই গ্লানি এবং কুণ্ঠা যেন হৃদয়কে স্পর্শ করে নি, আর সে কারণেই তাকে নিষ্প্রভ ও কলঙ্কিত মানবী বলে ভাবতে পারা যায় না। উভয় ক্ষেত্রেই নারীর দৈহিক দুর্বলতার উর্ধ্বে তার স্বকীয়তাকেই মাহাত্ম্য দান করা হয়েছে—কিন্তু মোঁপাসার চরিত্র রেখায়িত হয়েছে অভিজাত শ্রেণীর হীনতার ক্যানভাসে আর চেকভের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে সামাজিক জীবনের পল্লবঘন পলিমাটিতে। চেকভের 'ওলেঙ্কা' একটি বিশেষ জীবনাদর্শের আলোক-নিক্ষেপে বিশিষ্টা।

চেকভের আর একটি গল্পের কথা স্মরণ করা যাক। গল্পটির নাম 'দি ডেথ অব এ ক্লার্ক।' এই গল্পে উচ্চবিত্ত সমাজের স্বার্থপর জীবনব্যবস্থা যে

কী ভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের সমগ্র আত্মপ্রত্যয়কে নিঃশেষিত করে ফেলতে পারে তারই ভয়াবহ কাহিনীকে একটি করুণ আলেখ্যে রূপায়িত করা হয়েছে। সামান্য একটি অনিচ্ছাকৃত অসৌজন্য শেষ পর্যন্ত একজন চাকুরী-জীবী মানুষের অনুভূতিকে পীড়িত করল এবং ক্রমে ক্রমে এই অকারণ অপরাধবোধ এমন একটি চরমসীমায় পৌঁছল যার ফলে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হল। পেশাগত জীবনের হীনতা নিয়ে মোঁপাসাও 'দি ষ্টরি অব এ ক্লার্ক' নামক একটি গল্প লিখেছিলেন। সে গল্পে চাকুরীজীবী মানুষটি ও তদীয় পত্নীর ভয়ঙ্কর লোভাতুর স্বপ্ন উন্মোচিত হয়েছে—তাদের মৃত্যু পথযাত্রী বিত্তবান শাশুড়ীর আরোগ্যলাভে উভয়েরই বিত্তসম্পর্কিত স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটেছিল। এ গল্পে প্রথম থেকে শেষাবধি মোঁপাসা তাঁর একটি বিদ্রূপাত্মক চেতনাকে যেন প্রখর করে তুলেছেন। অন্যদিকে চেকভের গল্পে আছে সমাজচেতনার এক বলিষ্ঠ স্বাক্ষর এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বেদনা-ঘন পরিণতি। মোঁপাসার গল্পে আছে চাকুরে জীবনের হীনতা এবং নীতি বিগর্হিত আচরণের জন্যে একটি ঘৃণামিশ্রিত ব্যঙ্গবোধ, অন্যদিকে চেকভের গল্পটিতে একজন যথার্থ চাকুরীজীবীর মানসিক হীনমন্যতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ কারণেই চেকভ তাঁর চাকুরীজীবীর জন্যে পাঠকের সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন।

মোঁপাসা ও চেকভের গল্প পড়ে মনে হয় উভয়েই তাঁদের সমসা-ময়িক সমাজ ও মানুষকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জেনেছেন আর উপলব্ধি করতে চেয়েছেন একটি বিশেষ তির্যক প্রজ্ঞালোক থেকে। অনেক সময় চেকভের লক্ষ্যস্থল যেখানে ব্যক্তি, মোঁপাসার সেখানে সমাজ—অথবা উভয়ের ক্ষেত্রে এই রীতির পালাবদলও অনেক সময় ঘটেছে। কিন্তু প্রায়শই লক্ষণীয়, চেকভ যেন আক্রান্তের বেদনায় সহানুভূতিতে অশ্রুপাত করেছেন, আর মোঁপাসা অত্যাচারীকে বহু বিদ্রূপে ক্ষতবিক্ষত করে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসেছেন। এ-কারণেই মনে হয় সামাজিক গ্লানির বিপর্যয়ে বিষণ্ণ চেকভ পরিণামে নিবিড়ভাবে আশাবাদী হয়েছেন—আর বিদ্রূপের হাতিয়ারে আপাত উৎফুল্ল মোঁপাসা অবশেষে গভীরভাবে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েছেন। এর কারণ ছিল। চেকভ-পূর্ববর্তী ফরাসী মোঁপাসা ছিলেন ফ্লবেয়ারের শিষ্য—গুরুর বাস্তবতাবোধ ও বিদ্রূপাত্মক

মনোভঙ্গীর প্রভাবকে তিনি সচেতন মনে অতিক্রম করলেও যেন তাঁর অবচেতন মানসিকতায় এই প্রভাবকে লালন করেছেন। এ ছাড়া মোঁপাসার সম্মুখে ছিল একটি ব্যর্থ-বিপ্লবের পটভূমিকা। সেজন্যেই তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলোতে শরাহত পাখীর ন্যায় মুমূর্ষু চোখে যন্ত্রণার গভীর ছায়া এবং কণ্ঠে মৃত্যুপথযাত্রীর তীব্র অভিশাপ নিয়ে আবির্ভূত। অন্য দিকে রাশিয়ান চেকভের গুরু ছিলেন আনন্দবাদী টলষ্টয়। ধর্মীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাস গুরুর মতই চেকভকে দান করেছিল এক বিস্তৃত অথচ প্রসন্ন প্রজ্ঞা। সমস্ত যন্ত্রণার নেপথ্যে প্রফুল্ল সূর্য অপেক্ষমান, এই আশায় যেন তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর সম্মুখে ছিল আগামী দিনের এক প্রত্যাসন্ন সার্থক বিপ্লবের স্বপ্ন, যার প্রচ্ছায়া বারবার তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যেন এক সুদূরগামী বলাকা যার পক্ষ তীরবিদ্ধ হলেও চোখে নীলাকাশের স্বপ্ন অম্লান, দিগন্ত যাকে অন্য এক উজ্জ্বল দিনের সঙ্কেত জানিয়ে কেবল অস্ফুট বাণীতে বলে চলেছে —

> "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা,
> অন্য কোন খানে।"

অবশ্যি চেকভেও যে তিক্ততা নেই তা নয়, তবে সেই তিক্ততা নির্যাতিতের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধে বেদনাঘন। চেকভ তুলনামূলকভাবে ক্ষমাসুন্দর, মোঁপাসা বিদ্রূপাত্মক বিদ্রোহে অনিরুদ্ধ এজন্যেই চেকভের গল্প ভাবৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ আর মোঁপাসার গল্প রূপবৈভব ও সংবেদন চেতনায় ভাস্বর। ছোটগল্পের শিল্পরীতিতে এই দুই দিগন্তেরই প্রয়োজন যেমন দুর্নিবার তেমনি অসামান্য। তাই মোঁপাসা ও চেকভ উভয়েই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

ছোটগল্প সম্পর্কে মোঁপাসা ও চেকভ ইউরোপে যে ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার বেশ কিছুকাল পূর্বেই আমেরিকার একজন সুদক্ষ শিল্পীর হাতে বর্তমান কবিতা ও ছোটগল্প সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়। তাঁর সেই প্রভাব অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

আমি এডগার এ্যালেন পো'র কথা স্মরণ করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, মোঁপাসার ও চেকভের জন্ম যথাক্রমে ১৮৫০ এবং ১৮৬০

খ্রীষ্টাব্দে, আর পো'এর সাহিত্য-জীবন ১৮২৭ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৮৪৮ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তিনি মাত্র চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প-পরিসর সাহিত্য-জীবনে পাশ্চাত্য কবিতা ও ছোটগল্পের জগতে তিনি যে চিন্তা, চেতনা, প্রজ্ঞা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন, বৈচিত্রীকরণ, শিল্প প্রকরণ ইত্যাদি অবদান রেখে গিয়েছেন, তার তুলনা হয়না। তাঁকে বর্তমান পাশ্চাত্য কবিতা ও ছোটগল্পের জনক বলা যায়। মোঁপাসা, এমন কি তাঁর গুরু ফ্লবেয়ার ও তদীয় বন্ধু এ্যামিল জোলা সাহিত্য-জগতে প্রবেশের পূর্বেই পো-র জীবনাবসান হয়েছে। সুতরাং এঁদের সবার পূর্বসূরী হিসেবে পো যে ইউরোপীয় ও আমেরিকার কবিতা এবং ছোটগল্প সাহিত্য সৃষ্টিতে পথ প্রদর্শনের কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই বিশ্বের আধুনিক কবিতা ও ছোটগল্পের জন্মদাতা।

এই অসাধারণ্য সাহিত্য-প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর সাহিত্য-জীবন শুরু হয় সাংবাদিকতার মাধ্যমে। সেজন্যেই তাঁর প্রাথমিক ছোটগল্পে 'যথাদৃষ্ট তথা লিখিত' রীতির অনুবর্তন লক্ষণীয়। কিন্তু এই রীতিটিকে ধীরে ধীরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন একটি পর্যায়ে তিনি উন্নীত করেছিলেন যা বিশ্বের ছোটগল্পের বিবর্তনে বিশেষভাবে মূল্যবান অবদান হিসেবে স্বীকৃত। একদিকে তিনি এ্যাডভেঞ্চারাস গল্পের জনক। অন্যদিকে জীবনের অতিপ্রাকৃত অংশকে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিন্যাসে সুসংহত করে তুলতে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তার মূল্যও কম নয়। এদিক দিয়ে তিনি কোলরিজ ও লংফেলোর উত্তরসূরী। লংফেলো, কোলরিজ এবং ওয়াণ্টার ডি-লা-মের প্রভৃতি কবিতার ক্ষেত্রে যে অবিশ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন, পো ছিলেন ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তারই প্রাক্তন পদদ্রষ্টা অনুধ্যায়ী শিল্পী। পরবর্তীকালে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন ইংল্যাণ্ডর আর্থার ক্যানান ডয়েল। এ্যালান পোর 'ব্ল্যাক ক্যাট' এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক দিয়ে শুধু আমেরিকান সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে একটি স্মরণীয় ছোটগল্প।

বস্তুত এমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের বিবর্তন যুগে যুগে সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে। পো যেমন জীবনের অতিপ্রাকৃত

অঞ্চলের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের বিন্যাসসাধন করেছেন, ব্যালজাক, আঁলফেস দোঁদে প্রভৃতি গল্পকার তেমনি প্রকৃতির লীলাখেলার সঙ্গে মানবজীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে কাব্যোপম ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মানুষের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি যে কি এক নিগূঢ় রহস্যের বাঁধনে বাঁধা আছে, এসব গল্পকার তাঁদের বিচিত্র কাহিনীতে তাঁরই রূপ দান করেছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিভুতিভূষণের ছোটগল্পে আমরা এই প্রবণতার ঐশ্বর্য লক্ষ্য করেছি। অবশ্যি মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও ভিন্নতর সম্পর্ক নিয়েও ইউরোপীয় বিশিষ্ট গল্পকার হাক্সলী, হার্ডি এবং সমারসেট মম প্রভৃতি বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য গল্প লিখেছেন। শুধু দোঁদের একটি গল্পের উদাহরণ এখানে উল্লেখ করেই প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করবো। গল্পটির নাম "দি অনারেবল ম্যাজিস্ট্রেট ইন দি মিউস"। এ গল্পে একজন কর্তব্য সজাগ ম্যাজিস্ট্রেট তার বৃত্তির কর্কশতায় এবং কর্মের একঘেয়ে আবর্তে যখন অস্থির ও নিরাশ হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই ঘটনা প্রবাহে সে লাভ করলো প্রকৃতির অনাবিল ও পর্যাপ্ত দাক্ষিণ্য। মানবজীবনে এমন শিক্ষার মূল্যকে কোনদিক দিয়েই ছোট করে দেখা যায় না।

ছোটগল্পের বিবর্তনে জীবন-জরার উপলব্ধি একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে যাঁরা স্বকীয় শক্তিতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে আমেরিকার 'ও হেনরী'র নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়। তাঁকে আমেরিকার জরা জীবনের সার্থক ভাষ্যকার বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর গল্পে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে মিশেছে ব্যঙ্গ, হিউমার ও কটাক্ষের সঙ্গে সমন্বয়িত হয়েছে এক অশ্রুসজল সহানুভূতি। এছাড়া গল্পকে সত্যিকার ভাবেই কি ভাবে ছোট করতে হয় সেই প্রয়াসে তিনি যেন একজন সুদক্ষ শিল্পী। তাঁর ছোটগল্পগুলোর কাহিনী যেমন ছোট, মিতভাষণে ও সীমিত সংলাপে তেমনি সুসংহত। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের কয়েকটি ছোটগল্পে ও হেনরীর এই পদ্ধতির কিছু কিছু সাক্ষাৎ মিলবে। ও হেনরীর "দি গিফ্ট অব দি ম্যাজাই" গল্পটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এ গল্পে অত্যন্ত সংহত ভাষণে আমেরিকার মেহনতী নরনারীর প্রেম-স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে। জীবিকার অনিবার্য পেষণে ক্ষত বিক্ষত মানুষ রক্তাক্ত জিঘাংসার

সম্মুখীন হয়েছে, তার সমগ্র সৌন্দর্যবোধ যেন একটি অনল-গর্ভ হাহাকারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে, কিন্তু তবু এসবের মাধ্যমেও যা নির্বিকল্প ঐশ্বর্যে বেঁচে রয়েছে তা হোল প্রেম। তাঁর "দি পপ এ্যাণ্ড দি এ্যানথেম" গল্পটির পরিকল্পনা এবং পরিবেশনাও অপূর্ব। মানব জীবনে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও মুহূর্তের প্রভাব তার প্রত্যাশাকে যে কিভাবে আহত করে এবং অনেক সময় তাকে অভিপ্রায়-বহির্ভূত পথে পরিচালিত করে, এমন একটি ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনাই আমরা আলোচ্য গল্পটিতে দেখতে পাই। এ গল্পের নায়ক সোফী ভিক্ষুক জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে নতুন জীবনের সন্ধানে একের পর এক ক্রাইম করে চলেছে, কেননা তার বিশ্বাস, আইনের চোখে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপরাধী হলে সে গরম স্রোতের সবুজ দ্বীপে কারাবরণ করতে পারবে এবং জীবিকার চিন্তা, ক্ষুধার আক্রমণ আর শীতের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে বারবার শত অপরাধেও সে নিরপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। অবশেষে ক্রাইমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সোফী যখন একদিন দেখেছে গীর্জার মাথার ওপর দিয়ে একটি পূর্ণ চাঁদ আকাশে আলো বিকিরণ করে চলেছে, তখন সে যেন নতুন করে নিজেকে আবার আবিষ্কার করেছে—স্বাভাবিক ও ভদ্র জীবনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে তখন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা—সেই মুহূর্তেই অপরের একটি গুরুতর অপরাধের সম্ভাবনায় সেদিনের নিরপরাধ সোফী পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত এবং আইনের চোখে অপরাধী প্রতিপন্ন হয়েছে। এরপর যে উষ্ণ সবুজ দ্বীপে নির্বাসনের জন্য অপরাধের বাড়াবাড়ি সে এতদিন করে এসেছিল, নিরপরাধ সোফী সেখানেই নির্বাসিত হয়েছে। এ কাহিনীতে শুধু পরিবেশের প্রভাব নয়, কিংবা মানুষ যে অনেক সময় পরিস্থিতির হাতের ক্রীড়নক তাও মাত্র নয়, এ সবের সঙ্গে সঙ্গে ও' হেনরী তাঁর সমাজের শাসনব্যবস্থা, নীতিবোধ এবং বিচার পদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা এক শাণিত অথচ সংহত বিদ্রূপাত্মক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বিশ্বের ছোটগল্প সাহিত্যের বিবর্তনে এই সব এক্সপেরিমেণ্ট নিঃসন্দেহে নবতর সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচয়িতা হিসেবে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ ছোটগাল্পিকের সঙ্গে তুলিত হতে পারেন। বৃটিশ বাংলার, বিশেষ করে পদ্মা-অধ্যুষিত বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের মানুষের জীবন-চিত্র বিচিত্রভাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ধরা পড়েছে। এ-মানুষ যেমন আমাদের চারপাশের মানুষ তেমনি তারা যে কোন যুগের এবং যে কোন দেশের চিরন্তন মানুষের আনন্দ-বেদনাকেই যেন আমাদের সম্মুখে বয়ে এনেছে। চিরকালীন মানুষ রবীন্দ্রকাব্যে যেমন, তাঁর ছোটগল্পেও তেমনি প্রাণবন্ত হয়েছে তার ক্ষণকালীন আচরণের বিশিষ্টতায়—খণ্ডের মধ্যে এ যেন অখণ্ডেরই এক বিস্ময়কর আবির্ভাব। এ দিক দিয়ে হয়তো তিনি চেকভেরই উত্তরসূরী। কিন্তু গল্পের সংক্ষিপ্ত বাকবিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টির মুন্সিয়ানা এবং মানুষের অন্তর্গভীরের প্রকৃতি, প্রেম ও নৈর্ব্যক্তিক রহস্য প্রভৃতির সার্থক সন্ধানে তাঁর সাদৃশ্য মিলবে আঁলফেস দোঁদে, আলডাস হাক্সলী, টমাস হার্ডি ইত্যাদি গল্পকারের সঙ্গে। শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে তাঁর গল্পের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী, নাটকীয় পরিণতি এবং মানবজীবনের ব্যর্থতার আর্তনাদ আমাদের নিঃসন্দেহে মোঁপাসার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি যে একটি বলিষ্ঠ নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন তার মূল্য বিশ্বসাহিত্যে অপরিসীম।

বিশ্বের ছোটগল্প সাহিত্যের বিবর্তনে চেকভেরই সমসাময়িক ম্যাক্সিম গোর্কীর (জন্ম ১৮৬৮) স্থানও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মানবতার মহান মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এই রাশিয়ান লেখক সাহিত্য সাধনায় যেন টলষ্টয় ও চেকভের অসমাপ্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। চেকভের গল্পে অর্থনৈতিক বৈষম্যের গ্লানিতে পর্যুদস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে—কিন্তু গোর্কী নেমে এলেন সাধারণ শ্রমিক-কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রাণ-কেন্দ্রে। এই সমাজের জীবনসমস্যা, প্রেম, প্রতিহিংসা, রিরংসা এবং বাঁচবার জন্য সংগ্রামের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর গল্পে বাণীরূপ লাভ করেছে। তাঁর এই নতুন পদক্ষেপ সামগ্রিকভাবে সেদিনের সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণ মানুষকে যেমন তুলে ধরেছে, অন্যদিকে তেমনি স্তেপের নির্জন প্রান্তের মেহনতী জনতার জীবনচিত্র বারবার তার গল্পে প্রতিভাত

হয়েছে। শিল্পচাতুর্যের দিক থেকে তিনি শুধু ছোটগল্পের আঙ্গিক পরিশোধনের দিকেই দৃষ্টি রাখেন নি—ছোটগল্পকে তিনি গণজীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর ছোট গল্প গণচেতনার মুখর ভাষণে অভিষিক্ত।

প্রথম মহাযুদ্ধের অভিশাপ সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গেই মানবসভ্যতা অনেকগুলো তর্কাতীত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উঠলো। রাশিয়ান বিপ্লবের সাফল্য চিরকালীন অবমানিত মজদুর ও নিপীড়িত কৃষক শ্রেণীকে এক নতুন মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করলো। সমস্ত পৃথিবীতে সমাজের স্তরে স্তরে জগত ও জীবন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে এক বিপর্যয়ের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বিজ্ঞানের নতুনতর আবিষ্কার একদিকে যেমন সমরক্ষেত্রে মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হোল, অন্যদিকে তেমনি তার তত্ত্বগুলো মানবকল্যাণের বিভিন্নক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে থাকলো। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসের সাম্যবাদ ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনবাদ, ফ্রয়েডের যৌনতত্ত্ব প্রভৃতি মানবসভ্যতাকে এক অভিনব আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখে উপস্থাপিত করলো। স্রষ্টা, ধর্ম এবং প্রাকৃতিক শক্তির ওপর মানুষের আস্থা যেন দিন দিন শিথিল হয়ে উঠতে লাগল। কবিতার ক্ষেত্রে এই শৈথিল্যই যেন একটি নিদারুণ নৈরাশ্যে উদ্ভাসিত হোল কবি টি, এস, এলিয়টের উদ্দাম আবির্ভাবে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নেমেসিস যেন মানুষের চারপাশে এক অন্ধ, অশুভ নিয়ন্ত্রণশক্তি হিসেবে নতুন করে অনুভূত হয়ে উঠলো। এই সব চিন্তা এবং চেতনা, যা কিনা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশককে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি বহন করে সাহিত্যে নেমে এলেন, ডি, এইচ, লরেন্স, জেম্‌স জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, সমারসেট মম প্রমুখ ছোটগাল্পিক। এঁদের সাহিত্যে যে সব মানুষকে আমরা ভিড় করতে দেখলাম তাদের মনঃসমীক্ষণগত প্রকৃতি, নৈরাশ্যজনক আর্তনাদ এবং চিরন্তন মূল্যবোধে শিথিল বিশ্বাস সবই যেন বিচিত্র সাহিত্য-প্রকরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে উঠল। এ ছাড়া যন্ত্র, যুদ্ধ ও শ্রেণীস্বার্থ নিষ্পেষিত মানব মনকে এঁদের সাহিত্যে নতুন সংগ্রামের শপথ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতেও দেখা গেল—দেখা গেল মানবমনের ক্লেদাক্ত সর্পিলতার এক ভয়াবহ রূপায়ণ। অবচেতনের

গহন অরণ্য থেকে যে ভয়াবহ মানবদানবের জাগরণ ঘটল তার স্বরূপালোকে মানুষ নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে যেন নিজেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। এমনি পরিস্থিতির মধ্যেই বিশ্বে আবার শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা। আণবিক শক্তির আবিষ্কারে মানুষের চিন্তাজগতের সর্বশেষ আশ্রয় সবুজ দ্বীপ যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মানবসভ্যতার মূল্যবোধের আর একবার পালাবদল ঘটল। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তারই স্বাক্ষর নিয়ে দেখা দিলেন বরিস প্যাস্তারনাক, আলবেয়ার ক্যামু, আলবার্তো মোরাভিয়া, হেমিংওয়ে, সবোকভ, ফাক্‌নার, পল সাঁত্রে, পিরানদেল্লো, ষ্টাইনবেক প্রভৃতি মনীষী। লরেন্সের 'লেডী চ্যাটার্লীজ লাভার' অভিভূত করলো পাঠক সমাজকে, এ যুগের অভিনব মহাকাব্য রচিত হোল একটি দিনেরও কম সময়ের কাহিনী নিয়ে রচিত জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস,' গ্রন্থে, চির ক্রীতদাস মানুষের নিয়তি লাঞ্ছনার সকরুণ নির্মমতা প্রতিবিম্বিত হোল সমারসেট মমের 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ'-এ। পল সাঁত্রের বিশিষ্ট জীবনদর্শন আমাদের চিন্তার গণ্ডীকে প্রসারিত করলো। স্থিতিবাদ (Existentialism) তথা ক্ষণবাদ তাঁর সাহিত্যকে এক মহৎ ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করে তুলল। আমরা গভীর প্রত্যয়ে অনুভব করলাম, মানুষের পূর্বে অতীত এবং পরে ভবিষ্যত বলে কিছু নেই—যা আছে তা নিছক এবং ভয়ঙ্কর বর্তমান। আমরা আরো উপলব্ধি করলাম যে, সময় ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব চরিত্রের যে মুহুর্মুহু পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যেই মানবসত্তার অলংঘনীয় স্বরূপ এবং নিদারুণতম সার্থকতা নিহিত; সাঁত্রের 'ইনটিমেসি'তে এই তত্ত্ব সাহিত্য-শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ হয়ে জীবন-সত্যে উন্নীত হয়েছে। তাঁর সার্থক শিষ্য আলবেয়ার ক্যামু এই চেতনাকেই সফল রূপ দিলেন তাঁর কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে, ইতালীতে পিরানদেল্লো এই অনুভূতিকেই তাঁর 'সিক্স, ক্যারেক্টারস, ইন সার্চ' অব এ্যান অথার' নামক প্রখ্যাত নাটকের কাহিনীতে অনাবৃত করলেন—মানবকর্মের এমন সকরুণ অনিশ্চয়তা বিশ্বের অল্প নাটকেই রূপায়িত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শুধু পাশ্চাত্য ছোটগল্পেই নয়, বিশ্বের সবদেশের ছোটগল্পেই এই সব চিন্তা, চেতনা, প্রজ্ঞা, মননশীলতা এবং শিল্প-প্রকরণ,

যেগুলো এতক্ষণ বর্তমান আলোচনায় ইউরোপীয় সাহিত্যের কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবেই উল্লেখ করা হোল, তা কম বেশী প্রতিফলিত হয়েছে।

আলোচিত পটভূমিকা দীর্ঘ-কলেবর বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, ছোটগল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্পদ। সে কারণেই এই বিশেষ জাতীয় সাহিত্যের শিল্প-প্রকরণ ও সামগ্রিক স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতের যে সব মনীষীর অবদানে ছোটগল্পের সাহিত্যশাখা বিবর্তনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করেছে তাদের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় অপরিহার্য। পাশ্চাত্য ছোটগল্প সম্পর্কে আমার এই সুদীর্ঘ ভূমিকা ছোটগল্পের শুধুমাত্র বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা স্থষ্টির জন্যেই যে লিখিত হোল তা নয়, এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ছোটগল্প কি এবং তার মেজাজ ও চারিত্র্যই বা কিরূপ সে সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় আলোকপাত করা হয়েছে। এই আলোকের ভিত্তিতেই নিম্নে আমরা ছোটগল্পের শিল্প-প্রকরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানবার চেষ্টা করবো। তবে এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ না করলে আমাকে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। আমার এ-যাবৎ আলোচনা থেকে সূক্ষ্মদর্শী পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন, আমি বিশ্বের ছোটগল্প সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করিনি অথবা এই সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবর্তন দেখানোও আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু ছোটগল্প সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্যই আমি পাশ্চাত্য সাহিত্যের শরণাপন্ন হয়েছি—ধারাবাহিক ইতিহাস বা বিবর্তনের অখণ্ডচিত্র বর্ণনা বর্তমান আলোচনার গণ্ডী-বহির্ভূত।

শিল্প-প্রকরণ

ছোটগল্প মানবজীবনকে গল্পাকারে সাহিত্যে প্রতিফলিত করে—এই গল্প ছোট এবং সীমিত, জীবনের বিশেষ প্রাঙ্গণে এর জন্ম এবং সমাপ্তি। সাহিত্য জগতে ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট শিল্প। আঙ্গিকের মূল্য এখানে নাটকের মত মুখ্য এবং সনেটের মত সুনির্দিষ্ট। ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়ে অনেকেরই নিজস্ব অভিমত আছে। তবে এই সব অভিমতের উর্ধে যা সর্ববাদীসম্মত তা হোল এই যে, ছোটগল্প অবয়বে ছোট এবং স্বাদে গল্প—তা ন্যূনতম উপকরণে বৃহত্তম ফল প্রদান করে। জীবনের একটি ছোট অভিজ্ঞতা এর বিষয়বস্তু হতে পারে, কিন্তু তার প্রভাব সমগ্র জীবনে যে কত গভীর ও ব্যঞ্জনাময় তার সার্থক ও সংহত প্রকাশই ছোটগল্পের মূল লক্ষ্য। ছোটগল্পে উপন্যাসের মতই কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনার সন্নিবেশ থাকে, কিন্তু তা উপন্যাসের মত বিস্তৃত ও জীবনপ্রসারী নয়—উপন্যাসের শিথিলবদ্ধতাও ছোটগল্পে উপস্থিত থাকবার কথা নয়—বরং গীতিকবিতার মত সংহত এবং নাটকের মত সুবিন্যস্ত আঙ্গিকের কাঠিন্যে ছোটগল্প সুঠাম। স্বভাবে ও মেজাজে ছোটগল্পের সাদৃশ্য মেলে সবচেয়ে বেশী করে গীতিকবিতার সাথে। গীতিকবিতার মতই ছোটগল্প জীবনের একমুখী, লক্ষ্যভেদী এবং একটি বিশেষ ভাবের বৃন্তে পুষ্পিত। কেন্দ্রীয় চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে অনেকগুলো পার্শ্বচরিত্র ও শাখা-কাহিনী বিন্যাসের অবকাশ উপন্যাসে আছে—কিন্তু ছোটগল্পে এই অবকাশ অত্যন্ত সীমিত। ব্যঞ্জনায় মুখর সামান্য ঘটনাও ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে। ছোট গল্পে প্রতিটি শব্দ পরিমিত, সংলাপ সংহত এবং ঘটনা ও চরিত্র সুবিন্যস্ত হয়ে থাকে--এর সূচনা ও সমাপ্তিতে একটি আকস্মিকতাজাত চমক ও বেদনাসিক্ত অতৃপ্তি প্রায়ই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই সব লক্ষণ সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার তরী কাব্যের 'বর্ষা যাপন' কবিতায় ছোটগল্প পাঠকের অনুভূতিকে সুন্দর বৈদগ্ধ্যে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

"অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

সুতরাং একটি অনিঃশেষিত সম্ভাবনার হৃদয়স্পর্শী গুঞ্জরণ ছোটগল্পের সমাপ্তিকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করে। এ-ছাড়া ছোটগল্পে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে একাধারে যুগের ও জীবনের যন্ত্রণাবোধের অভিব্যক্তি। পাশ্চাত্য ছোটগল্প লেখকের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্পষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছে যে, ছোটগল্প বর্তমান কালের অভিনব ভাষ্য। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সার্বিক মূল্যবোধের যে পরিবর্তন সাধন হয়, বিশ্বের সব দেশের ছোটগল্পেই তার স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। পার্থিব জগতের বাস্তব গ্লানি, সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা এবং মানবজীবনের ব্যর্থতা সবই আধুনিক কালের ছোটগল্পে প্রতিভাত হয়েছে। মোঁপাসার মত কেউ কেউ যুগ ও জীবনের যন্ত্রণাকে মুমূর্ষের অভিশাপের মত নিরন্ধ্র নৈরাশ্যে সমাপ্ত করেছেন, আবার কেউ বা চেকভের মত সকল যন্ত্রণার নেপথ্যে একটি আনন্দঘন সম্ভাবনার সূর্যোদয়কে দুর্যোগ আকাশে পরিক্রমশীল বিহঙ্গের মত প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব কথা সামনে রেখেই ছোটগল্পের একটি সংজ্ঞা দান করা যেতে পারে, যদিও জানি ছোটগল্প সম্পর্কে সব অনুভূতির প্রকাশ একটি সংজ্ঞায় সম্ভব নয়। এ যেন এমনই একটি সাহিত্য যা অনুভূতি দিয়ে আয়ত্ত করা যায়, উপলব্ধির আলোকে লালন করা যায়, কিন্তু ভাষার বাঁধনে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। তবু আমি ছোটগল্পের স্বরূপ যে ভাবে উপলব্ধি করেছি তার আলোকে এখানে আমার নিজস্ব একটি সংজ্ঞা একবাক্যে দেবার চেষ্টা করবো ঃ

মানব জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিসর অথবা একটি বিশেষ প্রাঙ্গণ থেকে উদ্ভূত একটি ব্যঞ্জনাময় ঘটনা, একটি চরিত্রের বিশেষ শক্তি অথবা দুর্বলতার ব্যঞ্জনাময় বিবরণ, অথবা একটি বিশেষ ভাব বা মানসিকতা ইত্যাদিকে অবলম্বন করে একই প্রেরণার দ্যোতনায় যন্ত্রণাহত লেখকচিত্ত যখন স্বীয় অভিজ্ঞতাকে সুসংহত গদ্যে এবং সুবিন্যস্ত বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তাঁর সামগ্রিক বক্তব্য ও শিল্পপ্রকরণকে সূচনা ও সমাপ্তির আকস্মিকতায় পরিবেশন করেন, যার মাধ্যমে খণ্ড জীবন একটি চিরন্তন অখণ্ডতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তাহলে সাহিত্যরীতির যে বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত

হয়, তার নামই আমরা দিতে পারি ছোটগল্প। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' শীর্ষক গ্রন্থে একই বাক্যে ছোটগল্পের একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন ঃ

"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোন ঘটনা বা পরিবেশ বা কোন মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"

এবার ওপরের সংজ্ঞা দুটোকে সামনে রেখে ছোটগল্পের স্বরূপ লক্ষণগুলো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়াবে তা হোল এই ঃ

মানব জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড এক একটি ঘটনা বা অনুভূতি যা জীবনকে কোন এক আকস্মিক ও মহৎ ব্যঞ্জনায় বিমণ্ডিত করে তুলতে সমর্থ তারই সংক্ষিপ্ত, সংহত ও সুবিন্যস্ত রূপায়ণই গদ্যে প্রমূর্ত হয়ে ছোটগল্পের রূপ ধারণ করে। এই ঘটনা বা বিশেষ অনুভূতি, যা কিনা ছোট গাল্পিকের নিবিড় অভিজ্ঞতা ও গভীর মননশীলতার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, এমন একটি সামর্থে উজ্জীবিত হয়, যার ফলে ছোটগল্পে বিচিত্র ঘটনা বা অনুভূতির সাথে একাত্মতা লাভ করতে পারে পাঠক মন এবং একটি স্থায়ী দ্যোতনায় তার হৃদয় হয়ে উঠতে পারে দ্রবীভূত। শুধু যে জীবনের একটি টুকরো ঘটনা, বা বিশেষ অনুভূতিই ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে তা নয়—একটি বিশেষ চরিত্রের কোন মহৎ বা অমহৎ শক্তি অথবা শ্রীহীন দুর্বলতা, সমাজের কোন মহান ঔজ্জ্বল্য বা কদর্য গ্লানি, কোন যুগ-সভ্যতার একটি বিশেষ চাকচিক্য কিংবা সেই চাকচিক্যের অন্তরালবর্তী কুৎসিত কুশ্রীতা, জীবনের একটি বিশেষ প্রাঙ্গণ থেকে উৎসারিত কোন এক খণ্ড ব্যঞ্জনাময় প্রবাহ, কোন এক ব্যক্তি-মানসের বা সমাজের বীভৎসতা অথবা অন্তঃসারশূন্যতা—মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-প্রীতি, মিলন-বিরহ ইত্যাদি বিষয়বস্তু ছোটগল্পের সুন্দর শরীর বিন্যাস ও প্রাণশক্তি নির্মাণ করতে পারে। এই সঙ্গে, ছোট গল্পের সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ থাকবে, যদি না বলি যে ছোট গল্পে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে যার গুরুত্ব তিনি হলেন লেখক, অর্থাৎ কে সেই গল্পটি লিখছেন তিনি। আসলে ছোট গল্পের কাহিনী বলি, চরিত্র বলি, বাকবিন্যাস বলি, বিশেষ কোন অনুভূতির প্রকাশ বলি, অথবা

আর যা কিছু ছোট গল্পের বিষয়বস্তু হোক তার কথাই বলি, সব কিছুই একটি নিশ্চিত মহৎ ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারে, যদি লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ অকৃত্রিম অনুভূতি সেই বিষয়বস্তুর সাথে একাত্মতা লাভে সমর্থ হয়, যদি তাঁর সংবেদনশীল মননশীলতা একটি বিশেষ শিল্প-প্রকরণের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত বাকবিন্যাসের আশ্রয়ে সেই বিষয়বস্তুকে পাঠকচিত্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। সুতরাং গীতিকবিতায় যেমন, ছোটগল্পেও তেমনি বিষয় অপেক্ষা বিষয়ীর ওপরই তার সামগ্রিক সার্থকতা নির্ভর করে। ছোটগল্পের সূচনায় আকস্মিকতা সৃষ্টি ও সমাপ্তিতে একটি অতৃপ্তিকর তৃষ্ণার উদ্রেক করা, যা কিনা আমাদের মতে ছোট গল্পের অপরিহার্য অঙ্গভূষণ, নির্ভর করে লেখকের রসসিক্ত মননশীলতার ওপর। ছোট গল্পে জীবনের অবিকল রূপায়ণ অথবা তির্যক কটাক্ষে তার অন্তঃসারশূন্যতা কিংবা অপূর্ণতার প্রতিবিম্বন সবই প্রাণস্পর্শী সাহিত্যে উন্নীত হতে পারে, যদি তার রূপকার হন একজন অতৃপ্ত-তৃষ্ণায় অস্থির মানসিক যন্ত্রণা-বিক্ষত সুদক্ষ শিল্পী। 'মানসিক যন্ত্রণা-বিক্ষত', 'অতৃপ্ত-তৃষ্ণায় অস্থির' এই শব্দগুলো এখানে এইজন্য ব্যবহার করছি, কেননা এ-কথা কে না জানে যে, প্রত্যেক মহৎ সৃষ্টির পশ্চাতে থাকে বেদনাবিধুর যন্ত্রণা ও অতৃপ্ত তৃষ্ণা। অবশ্যি আমি অস্থির শব্দটিও ব্যবহার করেছি—ছোট গল্পাকারের নিকট থেকে সমালোচক মাত্রেই তাঁর অতৃপ্তি, যন্ত্রণা ও তৃষ্ণা কামনা করে থাকেন, তবে তাঁর অস্থিরতা সমালোচকের কাম্য হবে কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু একজন কবির বা সাহিত্য-শিল্পীর বিশেষ করে একজন সার্থক ছোটগল্প রচয়িতার অস্থিরতা একজন সাধারণ মানুষের অস্থিরতার সাথে একই মূল্যায়নে বিচার্য হতে পারে না—কবি, শিল্প বা ছোটগাল্পিকের এই অস্থিরতা এমনই একটি মানসিক সৌকর্য যা তাকে সৃষ্টির উদ্বেগে স্থিতিশীল করে তোলে—সৃষ্টির উন্মাদনায় যে অস্থিরতা জাগে তা স্রষ্টাকে গভীর প্রত্যয়ে ও আত্মস্বাতন্ত্র্যে স্থিতিশীলতাই দান করে। আষাঢ়ের এক খণ্ড কালো মেঘ যেমন অস্থির অথচ তার অস্থিরতার অন্তরালে থাকে বৃষ্টিরূপ সৃষ্টির এক মহৎ উন্মাদনা, যা বিশ্বে মুঠি মুঠি কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়—ছোটগাল্পিকের অস্থিরতাও ঠিক তেমনি। এই অস্থিরতা সাধারণ মানুষের স্বার্থচাঞ্চল্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

একথা বলা হয়েছে যে, ছোটগল্প বর্তমান সভ্যতার অবদান। বর্তমান সভ্যতায়, বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, সাহিত্যে হৃদয়াবেগের যেমন মূল্য আছে তেমনি গুরুত্ব আছে বুদ্ধিবৃত্তির। যান্ত্রিক উৎপাদন, বিজ্ঞানের বিবিধ আবিষ্কার, শিল্পায়ন, কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকাশ ইত্যাদির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়াবেগকে অতিক্রম করে বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এই বিবিধ রকমের অগ্রগতির ফলে মানব সমাজে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার দুর্ণিবারতা স্পর্শকাতর অনুভূতিপ্রবণ মানুষের চেতনাকে দিনে দিনে সাংঘাতিকভাবে আন্দোলিত করেছে। ছোটগল্প এই সব চেতনার ফসল। এমন কি যে সব দেশ এখনো অনুন্নত এবং যে সব দেশে এই সব নানাবিধ অগ্রগতি আজো বহুলাংশে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় সর্বাংশে অনায়ত্ত রয়েছে, সে সব দেশের সাহিত্যেও এই চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে তিরিশের বা তিরিশোত্তর কবিদের অথবা বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের অগ্রণী তরুণ প্রগতিবাদী কবি সমাজের ও ছোটগাল্পিকদের অবদানকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে। আধুনিক কবিতায় যেমন, সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্পেও তেমনি হৃদয়াবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় ঘটেছে এবং যুগের সমগ্র চেতনার আলোক প্রক্ষেপ, তা যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্তৃত এবং গভীর, ছোটগল্পের শরীরে ও প্রাণে প্রবেশ করে এই সাহিত্যকে এক অপূর্ব রূপে, রসে ও শক্তিতে ভরে তুলেছে। একথা যে শুধু পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছোটগল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য তা নয়, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-ছোটগল্প এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-পরবর্তী ছোটগল্প সম্পর্কেও একান্তভাবে সত্য। মানব জীবনের ও যুগবৈশিষ্ট্যের বিবিধ ও বিচিত্র উপকরণে গড়ে উঠেছে ছোটগল্পের কাঠামো, বিষয়বস্তু, চরিত্র, ভাব, মেজাজ এবং চারিত্র্য এক কথায় তার সামগ্রিক শিল্প-প্রকরণ। বর্তমান সাহিত্য জগতে ছোটগল্প মানবজীবনের নিকটতম সাহিত্যশিল্প।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা দরকার যে, ছোটগল্পে বিষয়বস্তুর মতোই গুরুত্বপূর্ণ তার শরীর-নির্মাণের কলাকৌশল। আঙ্গিকের গঠন-বৈচিত্র্যে যে ছোটগাল্পিক যত বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ছোটগল্পের সাহিত্য-

ক্ষেত্রে তিনি তত বেশী প্রথিতযশা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের এ্যালান পো, মোঁপাসা, চেকভ, ও হেনরী, দোঁদে, সমারসেট মম প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে এসব কথা বলা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও তিরিশোত্তর ছোটগল্পের ক্ষেত্রে লেখকদের দৃষ্টি যে এই বিশেষ রীতির দিকে সজাগ, তা প্রণিধানযোগ্য। সাম্প্রতিককালে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের ছোটগাল্পিকগণ এ-ব্যাপারে অধিক সচেতন। একদিকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্রীকরণে ও অন্যদিকে ছোটগল্পের শরীর ও আঙ্গিক-পারিপাট্য বিধানে তাঁদের তৎপরতা এবং পারদর্শীতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এদিক থেকে সাম্প্রতিককালে লিখিত বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ছোটগল্পের মধ্যে আমি রাজশেখর বসুর চিকিৎসা-সঙ্কট, বিভূতিভূষণের পুঁইমাচা, তারাশঙ্করের ইমারত, বনফুলের মানুষের মন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পুন্নাম, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদ্রের স্বাদ, সুবোধ ঘোষের ফসিল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উস্তাদ মেহেরা খাঁ, নরেন্দ্র মিত্রের রস, মুজতবা আলীর পাদটীকা, শওকত ওসমানের নতুন জন্ম, বিমলমিত্রের মিলনান্ত, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর দুই তীর, শাহেদ আলীর জিব্রাইলের ডানা, মযহারুল ইসলামের এপার ওপার, আবু ইসহাকের জোঁক, আলাউদ্দিন আল আজাদের কয়লাকুড়ানো দল, সৈয়দ শামসুল হকের কালা মাঝির চড়নদার, হাসান আজিজুল হকের শকুন প্রভৃতি গল্পের নাম করবো। বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিক শিল্পপ্রকরণে এবং লেখকের দরদভরা সহানুভূতিতে এই গল্পগুলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য অবদানে পরিণত হয়েছে।

যদিও পূর্বে একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে তবু আবার বলছি ছোটগল্পের সূচনা ধীর স্থির নয়, বরং আকস্মিক এবং দ্রুত, আর এ-কারণেই ছোটগল্পেরও চারিত্র্যে থাকে বাস্তব ও কল্পনার এক অপূর্ব সমন্বয়। এ যেন নিম্নমুখী স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া এক মুঠো ফুলের গুচ্ছ—কার আঁচল থেকে কবে তা ঝরে পড়েছিল, কোন্ বঞ্চনাবিধূর বেদনাকে তা বয়ে নিয়ে পথ অতিক্রম করে চলেছে, কার অর্চনায় তার প্রথম প্রয়োজন হয়েছিল এবং কোথায় গিয়েই বা তার যাত্রার সমাপ্তি ঘটবে, তা কেউ জানে না। কল্পনার জাল বিস্তার করে হয়তো চিন্তা করা যেতে পারে এই ভাসমান পুষ্পগুচ্ছের সাথে কোন অপরিচিতার হাতের স্পর্শ, কোন

উৎসব অবসানের অজানা ইঙ্গিত অথবা কোন স্মৃতিচিহ্নের অভিজ্ঞান, এবং এ-কথাও হয়তো ভাবা যেতে পারে যে, এর গতি হয়তো কোন বালুকা বেলায় চিরতরে বাধাপ্রাপ্ত হবে, আর ক্ষরতর রৌদ্রতাপে নিঃশেষিত হবে তার শরীরের সকল ঐশ্বর্য এবং হৃদয়ের সকল আঘ্রাণ, অথবা কোন এক বৃহত্তর মিলন মোহনায় বিশেষ একটি অভিব্যক্তির সার্থকতায় হয়তো তার যাত্রাপথের পরিণাম চিহ্নিত হবে; কিন্তু তবু মন এই ভাসমান পুষ্পগুচ্ছ দেখে যেন অব্যক্ত গুঞ্জনে 'জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।'

ছোটগল্প যেন টর্চলাইটের মত জীবনের বিচিত্র খণ্ড খণ্ড গুহালোকের গহ্বরে অকস্মাৎ আলোক প্রক্ষেপ করে। সেই তির্যক আলোকে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে আমাদেরই জীবনের অতি পরিচিত অথবা অপরিচিত একটি ক্ষুদ্র কোণ। এ-আলোক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জীবনের এমন একটি অঞ্চলে যা রহস্যে, রসে এবং রমণীয়তায় আমাদের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে। জীবন সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ অথচ চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতাকে ছোটগল্প আমাদের সম্মুখে মূর্তিমান করে তোলে। ছোটগল্প সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সন্তান। তাই যুগের প্রেক্ষিতে মানব অন্বেষার সার্থক উত্তর ছোটগল্পে বিম্বিত হয়। অবয়বের সংক্ষিপ্ততা, ঘটনার তির্যক উপস্থাপনা এবং চরিত্রের বিক্ষুব্ধ রূপকল্প ছোটগল্পে সার্থক রূপলাভ করে বলেই সাম্প্রতিক কালের জটিল যুগযন্ত্রণায় অস্থির মানুষের নিকট ছোটগল্প সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্য।

বাংলা ছোট গল্পের বিবর্তন

পাশ্চাত্য সাহিত্যজগতে ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে এবং ছোটগল্পের একটি বিশেষ শিল্পপ্রকরণ আছে—এসব বিষয় মোটামুটি ভাবে এতক্ষণ আমার আলোচনায় আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এবার এই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বক্তব্য আমি নিয়ে পেশ করছি। এই আলোচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টি মোটামুটি ভাবে বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব পূর্ববর্তী কালের হলেও বাংলা সাহিত্যে তার সূচনা ঘটেছিল ঊনবিংশ শতকে, ঊনবিংশ শতকে ছোটগল্পের জন্মলগ্নকে ত্বরান্বিত করেছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নবাগত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পরিচয় সাধন মানসে স্থাপিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ '১৮০১ খৃঃ'। ধর্ম প্রচার এবং নবগঠিত সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়করণের অভিপ্রায়ে এ-দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শাসকবৃন্দের যোগাযোগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালে এই কলেজেরই উদ্যোগে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোল। এই মুদ্রাযন্ত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে রচিত হোল গদ্য-গ্রন্থ। এই সব গদ্য গ্রন্থেই বাংলা ছোটগল্পের সূতিকাগারের উদ্বোধন ঘটেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরীর কথোপকথন '১৮০১' এ ভিস্তি, ধোবা, জেলে, বেহারা, পেয়াদা, রাইয়ত, দিনমজুর প্রভৃতি নিম্নবিত্ত মানুষের কথোপকথনের নমুনা সংগ্রহের অভিপ্রায়ে অনিবার্যভাবে ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্র উপস্থাপিত হোল। যদিও এসব চরিত্র ব্যক্তিত্বহীন তথা "Type" মাত্র, তথাপি ছোটগল্পে সংলাপনির্ভর চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা বাংলা ভাষায় এর মধ্যেই প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। রামায়ণ-মহাভারতের অহল্যার কাহিনী, কিংবা নলদময়ন্তীর উপাখ্যানের মত মূলকাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য পৃথক

খণ্ড জীবনকাহিনীর উন্মেষ এই সময়ের দিকেই দেখা গিয়েছিল। এ-ধরনের গল্পের অজস্রতা, পঞ্চতন্ত্র, জাতককাহিনী, হিতোপদেশ, বৃহৎকথা, কথামঞ্জুরী, কথা সরিৎ সাগর ইত্যাদি গ্রন্থ বাঙ্গালীর গল্পতৃষ্ণা নিবৃত্তি করে এসেছিল এতদিন। এদের মধ্যেই আধুনিক ছোটগল্পের রূপ ভ্রূণাকারে নিহিত ছিল। এগুলোকেই বলা যেতে পারে আখ্যানক।

কেরীর ইতিহাস মালা '১৮১২' গ্রন্থে ভারতবর্ষের নানাগল্প বাংলা গদ্যে মুদ্রিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের কবি হেয়াতমামুদ কবিতাকারে তার সর্বভেদবাণী কাব্যে প্রথম হিতোপদেশ অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বের লোককাহিনীর ক্ষেত্রে বিশিষ্টতম গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী প্রথম আমদানী করেন মধ্যযুগের কবি হেয়াতমামুদ। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন গোলকনাথ বসু এবং পুনরায় গ্রন্থটি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয় মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন, এবং হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষপরীক্ষা। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতির অনুবাদ আখ্যানক সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। বেতালপঞ্চবিংশতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে সুদৃঢ় অতীত জীবনের আনন্দ ও বেদনা প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর শিশু-পাঠ্য গ্রন্থগুলোতেও প্লট রচনা ও চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রণিধানযোগ্য।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' একটি শক্তিশালী গ্রন্থ। এতে রয়েছে অজস্র আখ্যানের সংগ্রহ। এর মধ্যে কালিদাস সম্পর্কে প্রচারিত আখ্যানগুলোই অধিকতর আকর্ষণীয়। যদিও যে অর্থে আজ আমরা ছোটগল্প সাহিত্য বুঝে থাকি তার সত্যিকার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে আরো দীর্ঘ বিলম্বিত হয়েছিল, তবু বাংলা ছোটগল্পের সূচনায় এসব গ্রন্থেরও যে একটি প্রাথমিক স্তরের কিছু কিছু ভূমিকা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

সংস্কৃত গল্পের ঐশ্বর্যে বাঙ্গালীর মুগ্ধতার পাশাপাশি ছিল আরব পারস্য প্রভৃতি মধ্য এশীয় জীবনের স্বপ্নালোকের প্রতি বাঙ্গালী মনের রোমান্টিক আকর্ষণ। আরব্য উপন্যাস এবং পারস্য উপন্যাস শুধুমাত্র

কিশোর পাঠ্য কাহিনীই নয়, এর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল মানব-জীবনেরই সেদিনের প্রতীক সহস্র রজনীর আলো, অন্ধকার। মানুষের অতৃপ্ত কামনা, অপূর্ব বাসনা এখানে মুক্তি পেয়েছিল কল্পনার নিরঙ্কুশ পাখায়, সম্ভবের দিগন্ত অতিক্রম করে অসম্ভবের অতিপ্রাকৃত আকাশে। বাঙ্গালীর গল্পরসিক মনকে পরিতৃপ্ত করেছিল আলাদীনের মায়াদীপ, আলনাসের স্বপ্নভঙ্গ, আবু হোসেনের স্বপ্নচারণা, আলিবাবার সৌভাগ্য, সিন্ধুবাদের দুঃসাহসিকতা। এছাড়া রোমান্টিক প্রেমকাহিনী, যেমন শিরি ফরহাদ, লায়লী মজনু, সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল ইত্যাদিও আমাদের পাঠকমনে এক বিশিষ্ট রমণীয়তা সৃষ্টি করেছিল।

এসব ফার্সী কাহিনীর পরিচয় বাঙ্গালী পেয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বেতনভোগী বাঙ্গালী অধ্যাপকদের লেখনীতেই। চণ্ডীচরণ মুন্সী অনূদিত তোতা ইতিহাস বাংলা গল্পজগতে এক আনন্দ সূত্রের আভাস আনয়ন করে। তোতা ইতিহাসের অনেক গল্পই জীবজন্তুর রূপকে কথিত এবং এর কোন কোন গল্পের সাক্ষাৎ হিতোপদেশ, শুকসপ্ততি, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির অনুবাদের মাধ্যমে পূর্বেই লাভ করা গিয়েছিল। বাংলা গদ্যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হরিমোহন সেন কর্তৃক অনূদিত আরব্যোপন্যাস প্রচারিত হয় এবং ১৮৫৪ সালে লায়লী মজনু ও চাহার দরবেশ দ্বারকানাথ কর্তৃক অনূদিত হয়। এছাড়া সে যুগে জনপ্রিয়তম গোলেবকাওয়ালির কাহিনী বাংলা গদ্যে অনূদিত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে তৃতীয় ধারায় অনুবাদ কর্ম হোল বাইবেলের কাহিনী। খৃষ্টধর্ম ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধর্ম, তাই তার কাহিনীগুলো এদেশীয় মনে তেমন রেখাপাত করতে সমর্থ হয় নি। ১৮০৩ সালে 'ঈশপের গল্প' ১৮৫১ সালে 'নিগ্রো সারভেণ্ট' এবং ১৮৫৫ সালে 'রবিনসন ক্রুসো' – এসব কাহিনী বাংলা গদ্যে অনুবাদ করে পাশ্চাত্য-জীবনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বাঙ্গালীকে ওয়াকিবহাল করা হয়, যদিও ঈশপের গল্পের কিছু কিছু কাহিনী হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রের গদ্যানুবাদে আমরা পূর্বেই লাভ করেছিলাম।

অবশ্যি নীতি প্রচারে গ্রন্থ অপেক্ষা বেশী সাহায্যকারী হয়েছিল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দিগদর্শন পত্রিকা এর

পথপ্রদর্শক, ১৮১৯ সালে খ্রীষ্টীয় মিশনারী পত্রিকার প্রকাশ এ-পথে আরেকটি সবল পদক্ষেপ। এছাড়া সংবাদ প্রভাকর (১৮৩০), বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫০), রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬৮) প্রভৃতিতে নীতিমূলক কাহিনীর উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, বাংলা দেশের নিজস্ব কিছু কিছু লোককাহিনীর লিখিত রূপান্তরণ আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের লেখনীতে পেয়েছিলাম। প্রবোধ চন্দ্রিকায়ও এ-ধরনের কাহিনীর যৎকিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে শুধু গল্পকথনের অনায়াস দক্ষতার পরিচয় নেই, উপরন্ত মানবচরিত্র-অনুসরণ, এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রক্ষেপণও এসব লেখায় ব্যাপক ভাবে বর্তমান।

আখ্যানক ছাড়া আরেকজাতীয় রচনায় ছোটগল্পের আগমনী সঙ্কেত আভাসে ইঙ্গিতে ধ্বনিত হয়েছিল। এ জাতীয় রচনাকে বলা যেতে পারে নক্সা। এর সূতিকাগার যদিও সংবাদপত্র, তবে এর উন্মেষ হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে কেরীর কথোপকথনে। কথোপকথনে যে সব চরিত্র 'Type' আকারে ছিল, সেগুলোকেই প্রতিনিধিস্থানীয় করে তুলেছিল সমাচার চন্দ্রিকা ও সমাচার দর্পণের মত সাময়িক পত্রিকা। বাস্তবজীবনের অসংগতির প্রতি তীক্ষ্ণ সমালোচনার মনোবৃত্তি এগুলোকে উপভোগ্যতা দান করেছিল। ভবানীচরণের কলিকাতা কমলালয় (১৮৩৭), নববাবু বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে সামসাময়িক জীবন ও স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে এ-জাতীয় নক্সা উপস্থাপন করবার অত্যন্ত সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' এ-জাতীয় রচনার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। প্রতিনিধিমূলক চরিত্র সৃষ্টিই হুতোমের নক্সার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পদ্মলোচন বাবু ও বংশলোচন বাবুর সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের মেজাজ ও চারিত্র্যের অভিমুখে একটি সফল অভিযান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হুতোম' পত্রিকায়ও এমন কিছু কিছু সার্থক নক্সার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

দীর্ঘ কাহিনী রচনার প্রবণতা পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই প্রথম লক্ষণীয় হয়। ১৮৭৪ সালে বঙ্গদর্শনে তাঁর বড় গল্প 'ইন্দিরা' প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্য পাঠকের মনে প্রথম ছোটগল্পের একটি চেতনা জেগে উঠেছিল এবং বাংলা ভাষাভাষী

পাঠক ছোটগল্পের অবয়ব ও প্রকৃত চারিত্র্য সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল, যদিও ইন্দিরা ঠিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যাবস্থার সৃষ্টি। বলা হয়ে থাকে, গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটগল্প রচনার প্রচেষ্টায় প্রথম ফলশ্রুতি। অবশ্যি বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবে ঔপন্যাসিক ছিলেন বলেই পরবর্তী সংস্করণে ইন্দিরাকে বর্ধিত আকারে যে রূপ দিলেন তার ফলে তা উপন্যাসেই পরিণত হোল, ছোটগল্পের সম্ভাবনাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করলো। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখলেন "মধুমতি"। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভ্রমর' পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্র 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' নামে দুটো গল্প লিখলেন। সুতরাং ইন্দিরা, মধুমতি, দামিনী, রামেশ্বরের অদৃষ্ট প্রভৃতির মাধ্যমে ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকেই বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক ছোটগল্প সাহিত্যের সার্থক সূচনা হোল। এই সূচনা যথার্থ ভাবে ছোটগল্পের আকারে ও চারিত্র্যে দানা বেঁধে উঠলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাতে। ছোটগল্পের যে শিল্প-প্রকরণ আমাদের নিকট প্রিয় ও একান্ত বাঞ্ছিত সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তার প্রকৃত স্রষ্টা ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ভিখারিণী গল্পে ছোটগাল্পিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সম্ভাবনার পরিচয় ধরা পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী থেকে রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী'তে ছোটগল্পের প্রকৃতি স্পষ্ট পার্থক্যে পাঠককে অভিভূত করে। বঙ্কিমের উল্লিখিত তিনটি কাহিনী ক্ষুদ্রাকারে লিখিত উপন্যাস মাত্র। সঞ্জীবচন্দ্রের দামিনী, রামেশ্বরের অদৃষ্ট প্রভৃতি গল্প আসলে কাহিনীকেন্দ্রিক Tale জাতীয় রচনা। রবীন্দ্রনাথের ভিখারিণীও অনেকটা সেই জাতীয় রচনা, তবে ছোটগল্পের গীতিধর্মী ভঙ্গী এ-গল্পে অনেকাংশে বিদ্যমান। অবশ্যি বলা চলে এই রচনাগুলো ছোটগল্পের অধিকতর নিকটবর্তী। পরবর্তী কালে দিনের পর দিন এই ধরনের Tale জাতীয় রচনাগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে এবং এমন গল্পরচনার প্রবণতা ক্রমশঃ সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ললিত ও সৌদামিনী এই জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে ছোটগল্পের নিকটবর্তী সাহিত্যশিল্পে উন্নীত হবার পথে আরেকটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ। গল্পটিতে ছোটগল্পের অনেকগুলো গুণই বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা ছোটগল্পে দু'জন শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা স্বর্ণকুমারী দেবী '১৮৫৫' এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত '১৮৬১'। যমুনা, আমার জীবন, গহনা, অমরগুচ্ছ প্রভৃতি গল্প স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিভার নিদর্শন। এগুলোর মধ্যে 'গহনা' গল্পটি পড়লে মনে হয় গল্পটি মোঁপাসার 'নেকলেস' গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত। প্রথমদিকে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্লট রচনায় দুর্বলতার লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীকালে তিনি এ দুর্বলতা অতিক্রম করে চরিত্র চিত্রণের পারদর্শিতা, স্বল্পভাষণের ইঙ্গিতময়তা এবং সমাপ্তির আকস্মিকতা প্রভৃতি ছোটগল্পের বিশিষ্ট গুণাগুণ আয়ত্ত করেছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের দান প্রণিধানযোগ্য। তাঁর 'দুইবার,' 'বধিরের বাসনা', 'ঘরের অলক্ষ্মী,' 'ভৈরবী', 'মেহেরজান,' 'ফাতেমা,' 'শ্যামার কাহিনী,' 'পূজার পোষাক,' 'লক্ষ্মীহারা' প্রভৃতি কাহিনীতে তিনি যে প্লট রচনার বৈচিত্র্য সাধন করেন, রোমান্সের তীব্রতা সৃষ্টি করেন এবং গীতিধর্মিতার প্রাবল্য রক্ষায় সমর্থ হন, বাংলা ছোটগল্পের মান উন্নয়নে তা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। প্রাথমিক কালের রচনায় যে সব দোষত্রুটি থাকা স্বাভাবিক সেগুলো থেকে তাঁর এই রচনাগুলো হয়তো মুক্ত নয়—কিন্তু তবু বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তাঁর এই অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্বীকৃত হবে।

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আজ আমরা বাংলা সাহিত্যের যে ছোটগল্প সাহিত্যের জন্য গর্ববোধ করি, তার সার্থক রূপায়ণ প্রথম রবীন্দ্রনাথের হাতেই ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটগল্পের জনকের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁরই লেখনীতে প্রথম ছোটগল্পের সমস্ত লক্ষণগুলো সুপরিস্ফুট হয়। তাঁর ভিখারিণী গল্পে '১৮৭৪ খ্রীঃ' যে লক্ষণগুলোর সূত্রপাত ঘটেছিল, তার একটি মোটামুটি সার্থক রূপায়ণ বিস্ময়কর ভাবে লক্ষণীয় হয়, ল্যাবরেটরিতে '১৯৪০ খ্রীঃ।' কিশোর বয়স থেকে শুরু করে পরিণত বার্ধক্য বয়স পর্যন্ত অনলস গতিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প রচনার প্রয়াস ও নিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যকে যুগপৎভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাঁরই কল্যাণে এই সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে উন্নীত হয়েছে। সারাজীবন তাঁর এই প্রয়াস

তাঁর অনলস পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল এবং তাঁর ক্রম পরিপক্কতা-প্রাপ্ত জীবনের অভিজ্ঞতা ও শক্তিধর কবি-হৃদয়ের অনুভূতি তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলোকে এক একটি বহু মূল্যবান হীরকখণ্ডের ন্যায় অমূল্য সম্পদে পরিণত করেছে। আর একথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই বাংলা ছোটগল্প বিশ্বের ছোটগল্প সাহিত্যের আসরে একটি সম্মানিত আসন লাভের অধিকারী হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের রচনা ঘাটের কথা, রাজপথের কথা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রাজপথের কথায় গল্পাংশ নেই, ঘাটের কথায় গল্প রচনার ক্ষমতার প্রথম নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ছয়খানি গল্পের মধ্যে পোষ্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, দেনাপাওনায় তাঁর ক্ষমতার বিস্ময়কর বিকাশ বাংলা সাহিত্যের পাঠককে অভিভূত করে। গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী ও গল্প-স্বল্পের মধ্যে সঙ্কলিত গল্পগুলোতে তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিহিত।

সমালোচকগণ মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোর যে সব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হোল ঃ

(ক) স্মিত হাস্যরস, (খ) গীতিধর্ম, (গ) প্রকৃতিময়তা, (ঘ) অনন্ত সৌন্দর্যের সম্মিলন, (ঙ) ক্লেদাক্ত কামনার মালিন্যশূন্যতা, (চ) মানব-হৃদয়ের নিঃসঙ্গতা, (ছ) প্রকৃতির দ্বৈত-ভূমিকা (আগ্রহ এবং ঔদাসীন্য) ইত্যাদি।

এছাড়া তাঁর গল্পগুলোতে বাঙ্গালী জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বড় সুন্দর ও বড় করুণ হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রতিনিধি-স্থানীয় যে গল্পগুলো আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো থেকেও আমরা রবীন্দ্রগল্পসমূহের এই সব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হব। রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগৎকে, সমাজ ও ব্যক্তিকে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে ও বুঝতে চেয়েছেন—তাঁর গল্পগুলোতে তার স্বাক্ষর বিশেষভাবে প্রমূর্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আরেকজন শক্তিশালী ছোটগল্পকারের নাম প্রসঙ্গত বলা দরকার—তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছোটগল্প সাহিত্যে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন, সে হোল ব্যঙ্গরচনা।

তাঁর রচনা উদ্দেশ্যমূলক—স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে তাঁর ব্যঙ্গ সমাজের অসঙ্গতির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। এ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব তাঁর মধ্যে নেই, বরং তিনি সুইফট, ভলটেয়ার, বার্নার্ড শ' প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকদের অধিকতর সগোত্র এবং পরশুরামের পূর্বসুরী। অবশ্যি ব্যঙ্গ সাহিত্যের সার্থক উদগাতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতার ক্ষেত্রে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপমূলক রচনায় বিশেষভাবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ সেই একই ব্রত সমাপন করতে চেয়েছিলেন ছোটগল্পে। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ ছিল মানুষের নির্দয়তা, অবমাননা, ভণ্ডামি এবং ধর্মের নামে হিংস্রতার বিরুদ্ধে। ভূতের রূপকের মাধ্যমে তিনি সমাজের বিচিত্র মানুষের অদ্ভুত আচরণকে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর খুলু, নয়নচাঁদের ব্যবসা (১৮৯৭ খৃঃ), মুক্তামালা (১৯০১), ডমুরু চরিত (১৯২৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সৃষ্টির নিদর্শন। তাঁর গল্পগুলো অনেকটা উপাখ্যান জাতীয় এবং আরব্য উপন্যাসের কাহিনীগুলোর মত শাখা-প্রশাখায় দূরবিস্তৃত। স্বভাবে তাঁর গল্পগুলোকে সত্যিকারভাবে আধুনিক ছোটগল্পের অনুসারী বলা চলে না, বরং তাঁর গল্পে প্রাচীন Tale জাতীয় উপাদান অনেক বেশী। তবে চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি মাঝে মাঝে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। ডমরুধর চরিত্রটিকে বাংলা সাহিত্যে একটি জীবন্ত চরিত্র হিসেবে বিচার করা যায়, যদিও চরিত্রটি মধ্যযুগের ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল ও আধুনিক যুগের 'ঠকচাচার' সগোত্র।

রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ পরবর্তী প্রভাত মুখোপাধ্যায়ও একজন শক্তিমান গল্পকার। এমন কি একদা জনপ্রিয়তায় তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করেছিলেন। কারণ তাঁর রচনা রবীন্দ্রনাথের মত সুক্ষ্ম ও মনস্তত্ত্বমূলক নয়, বরং তা রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-পরিপূর্ণ এবং বাংলার পল্লী-সমাজের অত্যন্ত স্থূল আনন্দ-বেদনার কাহিনীতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর "আদরিণী" আপন বৈশিষ্ট্যে শক্তিমান একটি গল্প। রবীন্দ্র যুগে আবির্ভূত হয়েও তিনি বিস্ময়কর ভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবে মুক্ত ছিলেন। তাঁর একমাত্র 'দেবী' গল্পের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ প্রেরণা লক্ষণীয় হইলেও অন্যান্য গল্পগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বহির্মুখী, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলোর মত সুক্ষ্মভাবে অন্তর্মুখী নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর লঘু রচনাগুলো বলবার ভঙ্গীতে উপভোগ্য ছোটগল্পের স্বাদ বহন করে এনেছে। তাঁর 'মন্ত্রশক্তি', 'যক্ষ', 'নীললোহিত' প্রভৃতি গল্পগুলো বাংলা ছোটগল্পের এক একটি স্থায়ী সম্পদ। এ ছাড়া ছোটগল্পে স্টাইলের যে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে তাঁর ছোটগল্পগুলো এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ভাস্বর।

রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ পরবর্তী শরৎচন্দ্র চারিত্র্যে ঔপন্যাসিক হলেও ছোটগল্পে তাঁর স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনা 'মন্দির' অনেকটা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত হলেও খাঁটি ছোটগল্প হয়ে ওঠে নি—তাঁর এই রচনাটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়। গল্পটিকে ছোটগল্প ও Tale জাতীয় রচনার মধ্যবর্তী সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করা চলে। অতঃপর তিনি রামের সুমতি, বড়দিদি, বিন্দুর ছেলে, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপন্যাসোপম বড় গল্প রচনায় প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর উপন্যাসের মতই জনপ্রিয় হয়, 'মহেশ' এবং 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি ছোটগল্প। এ-সব গল্পে সামাজিক নির্যাতন এবং জ্বালাময়ী বঞ্চনার চিত্র ইঙ্গিতময় ভাষাভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়ে শরৎচন্দ্রের গাল্পিক প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট বাঁক গ্রহণ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই—তখন রাশিয়ান বিপ্লবের রক্তাক্ত সাফল্যে বহুদিন অবমানিত মজদুর শ্রেণী জেগে উঠেছে, এ ছাড়া মহাযুদ্ধ নিয়ে এলো জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত মূল্যায়ন বিপর্যয়। বিজ্ঞানের নূতনতম আবিষ্কারগুলো যেমন মারণাস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয়েছে সমর ক্ষেত্রে, তেমনই তার নতুনতম তত্ত্বগুলো এবং সূক্ষ্মতম চেতনাগুলো মানবসভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন, সাহিত্য ক্ষেত্রেও তেমনি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে শুরু করলো। এছাড়া ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ, ফ্রয়েডের যৌনতত্ত্ব, মার্কস-এর বস্তুতন্ত্র এবং সাম্যবাদ যে বিশ শতকের মানুষকে এক অভিনব আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে তুললো একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে যখন চিন্তারাজ্যে এমন সব আলোড়নের সৃষ্টি হলো ঠিক এমনি সময়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষের প্রাণের ভাষা নিয়ে ইংরেজী

সাহিত্যে নেমে এলেন টি এস ইলিয়ট। ইবসেন ও বার্নাড' শ'য়ের রচনায় দেখা দিল মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণচেতনা এবং অন্যদিকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিচিত্র ও অভিনব জিজ্ঞাসা। মানুষ নিজেকে এমনিতেই জানে না, বোঝে না—সেই মানুষই যখন নিজের মধ্যে নানা মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে এক আশুরিক শক্তিকে অবলোকন করলো, তখন তার বিস্ময় ও আতঙ্কের আর অন্ত থাকলো না। এরপর আবার এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ব্যবহৃত মহাশক্তিশালী আণবিক বোমের বিস্ফোরণ মানুষের চিন্তারাজ্যকে আরেকবার নব নব জিজ্ঞাসার সীমান্তে নিয়ে এসে উপস্থিত করলো। বর্তমান সভ্যতার এক বিধ্বস্ত চেতনার বাণী নিয়ে সাহিত্যে এলেন পল সাঁত্রে, আলবেয়র ক্যামু, আলবার্তো মোরেভিয়া, হেমিংওয়ে, সবোকভ, ফকনার, বোরিস প্যাস্তারনক, পিরানদেল্লো, ষ্টেইনবেক এবং আরো অনেকে। এঁদের এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের আরো অনেকের রচনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিপর্যয়, নিয়তি, লাঞ্ছনা, পরিবর্তনশীল মানব ভাগ্যের বিমূঢ়তা এক বিস্ময়কর তথ্য নিয়ে উপস্থিত হলো। এঁরা সবাই মানবতাবাদী। মানব দুঃখের সমাধানকারী হিসেবে কোন অদৃশ্য বিশ্বস্রষ্টাকে এঁরা অন্বেষণ করেনি, ব্যালজাক, চেকভ কিংবা গোর্কীর মতই এঁরা সর্বমূল্য দান করেছেন মানব-কর্ম সম্ভাবনার বিপুলতাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে উদ্ভূত বিশ্বসাহিত্যের এই সমস্ত বিশিষ্ট প্রবাহের প্রাবল্য বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকেও ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ দিক থেকে এবং সামগ্রিকভাবে তৃতীয় দশকে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে। কবি নজরুলের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিক উন্মোচন করে তুললো প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই—মানুষের উন্নত মস্তকের নিকট হিমাদ্রির শিখর মস্তক অবনত করলো। কল্লোল গোষ্ঠীর অভ্যুদয় এই সব আলোড়নের ঐতিহাসিক প্রমাণ। এই সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখনীতে বাঙ্গালীর তথাকথিত চিরন্তন রূপ, গৃহ-নির্ভর প্রেম প্রীতি বাৎসল্য ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়ে আমাদের এতোদিনকার মূল্যবোধে এক বিরাট ভাঙ্গন নিয়ে এলো। ছোটগল্প সাহিত্যে এবং শরৎ পরবর্তী কথা সাহিত্যে

এক উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিভূতিভূষণ এলেন যেমন, কাব্য সাহিত্যে এলেন জীবনানন্দ দাশ। মানব জীবনের গভীরতম নিঃসঙ্গ চেতনা এবং বাংলার প্রকৃত রূপ জীবনানন্দের কবিতায় যেন নতুত করে ভাষা খুঁজে পেল, আর মানুষের সমস্ত বঞ্চনার নেপথ্যে বিভূতিভূষণের প্রসন্নমন যেন এক অপূর্ব সফলতার আলো পর্যবেক্ষণক রলো। গোর্কীর প্রজ্ঞা ও শক্তি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এই সময়েই এলেন তারাশঙ্কর। এক বিশিষ্ট অঞ্চলের মানুষ তাঁর লেখনীতে বিচিত্র কামনা বাসনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রমূর্ত হল। ছোট গল্পের এই দুইজন শিল্পীর মধ্যে মহাযুদ্ধোত্তর কালে বিশিষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশিত হলেও, নিঃসন্দেহে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীতে ছোটগল্প ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে অনবদ্য সংহতি লাভ করল। দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সমারসেট মম এবং ভার্জিনিয়া উলফের সহযাত্রী। ভাষার কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, ঘটনা সৃষ্টির নাটকীয় আকস্মিকতায়, নিয়তি লাঞ্ছনার বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনায় তাঁর ছোটগল্পগুলো প্রায়শঃই রবীন্দ্রোত্তর গল্প সাহিত্যের এক নতুন প্রাঙ্গণের দ্বার যেন উন্মুক্ত করেছিল।

অতঃপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি কারণে সমগ্র বৃটিশ ভারতের ন্যায় অখণ্ড বাংলা দেশও দুই অংশে বিভক্ত হলো—আমরা আযাদী লাভ করলাম। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলা, বাংলা সাহিত্যের লেখকগণ এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। গাঙ্গেয় ভূমি নিয়ে রয়ে গেল পশ্চিম বঙ্গ, আর মেঘনা ধলেশ্বরী পদ্মা সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠলো পূর্ব পাকিস্তান। কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিম বঙ্গ এতোকাল ধরে বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যে নেতৃত্ব দান করে এসেছিল বিভাগ পরবর্তীকালে তা অনিবার্যভাবে অসম্ভব হয়ে উঠলো, কেননা পূর্ব পাকিস্তান একটি পৃথক রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়লো। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ক্রমে ক্রমে এদেশের জীবনমুখী সাহিত্য হিসেবে রূপায়িত হবার সুযোগ লাভ করলো। অন্যদিকে কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিম বঙ্গে কল্লোল যুগীয় সাহিত্যিকরা ছাড়াও আরও অনেক শক্তিধর সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটলো। কল্লোল যুগের এবং পরবর্তী যুগের শক্তিমান লেখকদের মধ্যে বনফুল, মনোজ বসু, রাজশেখর বসু, মুজতবা আলী, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গাঙ্গুলী, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, নরেন্দ্র

মিত্র, গজেন্দ্র মিত্র, মন্মথ ঘোষ, সমরেশ বসু, প্রতিভা বসু, বাণী রায় ও শঙ্কর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের রীতিতে এঁরা অনেকেই কল্লোল যুগীয়, বিপ্লবের সমর্থক এবং ভাবে এরা বস্তুনিষ্ঠ, মনো-বিকলনবাদী, সাংবাদিক টেকনিক-নির্ভর এবং যৌনজীবন আশ্রয়ী। মানব-জীবনের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে যুগের আলোকে যেমন এই সব সাহিত্যিক তেমনি এঁদের সমসাময়িক বা পরবর্তী লেখকগণ সাম্প্রতিককালে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য রচনায় ব্রতী রয়েছেন।

বিভাগপরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে যাঁরা খ্যাতিমান সাহিত্যকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেন তাঁদের অনেকেই বিভাগপূর্বকালে সাহিত্য সাধনা শুরু করলেও অধিকাংশই এই আজাদ ভূমির ফসল। কথা সাহিত্যে আবুল ফজল, মাহবুব-উল আলম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ সাহিত্যিকদের অনুসরণ করে নতুন জীবন চেতনায় যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে শওকত ওসমান, ওয়ালীউল্লাহ, শাসসুদ্দিন আবুল কালাম, আবু জাফর শাসসুদ্দিন, শাহেদ আলী এবং আরো অনেকের নাম করতে হয়। কথা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে রয়েছেন আলাউদ্দিন আল আযাদ, সরদার জয়েন উদ্দিন, আবু ইসাহাক, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, জহির রায়হান, রশিদ করিম, শহীদুল্লাহ কায়সার, হাসান আজিজুল হক এবং আরো অনেকে। পূর্ব পাকিস্তানের কথাসাহিত্যিকগণ, বিশেষ করে যারা ছোটগল্প লিখে চলেছেন তাঁদের প্রায় সবাই পূর্ব পাকিস্তানের জীবন সম্পর্কে সচেতন। এ ছাড়া বর্তমান যুগের ভাল এবং মন্দ, আনন্দ এবং বেদনা, যন্ত্রণা, অবক্ষয়, হতাশা, গণচেতনা ইত্যাদির সঙ্গে এঁরা কম বেশী একাত্ম হতে সচেষ্ট রয়েছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছোটগল্প সাহিত্য এঁদের এবং আরো অনেকের সংবেদনশীল মননের কল্যাণে আজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। আমাদের ছোটগল্প সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্ভাবনাপূর্ণ এবং উজ্জ্বল।

সঙ্কলিত গল্পসমূহের বিশ্লেষণ ঃ

……

বর্তমান সঙ্কলনে যে সব ছোটগল্প স্থান পেয়েছে সেগুলোর রচনাকাল ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদ থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত। এই সময়কালের ব্যাপ্তি প্রায় আশি বছরের কালরেখায় গণ্ডীবদ্ধ। এই আশি বছরে যুগ ও জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ সব গল্পে তার সুস্পষ্ট ছাপ বিচিত্রভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

এ ছাড়া এ-গ্রন্থে সঙ্কলিত গল্পগুলো মোটামুটি এই গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত লেখকবৃন্দের এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের প্রতিনিধিস্থানীয়। দেশ, কাল ও গল্পের সারবত্তার মানদণ্ডে গল্পগুলো সঙ্কলিত। গল্পগুলোর নির্বাচনে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচয়িতা হিসেবে গাল্পিকের প্রতিষ্ঠা বিচার করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি গল্পগুলোর প্রত্যেকটির গল্প-প্রকরণ জনিত সার্থকতাও বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এ ছাড়া এই সঙ্কলনে গ্রথিত গল্পগুলোর নির্বাচনে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শ কোন দিক থেকে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়। আজাদী-পূর্ব লেখকদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশিষ্ট গল্প স্থান পেয়েছে—এ গল্পগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের তথা চিরন্তন মানবতার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা সার্থক শিল্পসৌন্দর্যে ধরা পড়েছে। অনুরূপভাবে প্রমথ চৌধুরী, বনফুল, বিভূতিভূষণ, রাজশেখর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের যে গল্পগুলো এই সঙ্কলনে নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলো আজাদী-পূর্ব কালে লিখিত এবং এঁদের নির্বাচিত প্রত্যেকটি গল্পের সাহিত্য-মূল্য প্রণিধানযোগ্য। শুধু ছোটগল্প হিসেবেই যে এ-গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতার দাবীদার তা নয়, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের নিগূঢ় তাৎপর্য এবং আনন্দ বেদনাও এইসব গল্পে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এ-সব গল্প শুধু

বিশেষ সম্প্রদায়ের নয় অথবা বিশেষ অঞ্চলের নয়, এগুলোর মধ্যে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষই যেন তাদের প্রাণের দাবীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আজাদীপূর্বকালে লিখিত এবং এই সঙ্কলনে সংযোজিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটো গল্পই বাংলার মুসলিম জীবনের দুই ভিন্নমুখী চরিত্র নিয়ে লিখিত। লেখকের গভীর সহানুভূতি ও মুসলিম জীবনের সঙ্গে একাত্মতা এই দুটো গল্পকে বাংলা সাহিত্যের মুসলিম জীবন-কেন্দ্রিক গল্পগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দান করেছে। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী, বিমল মিত্র, সুবোধ ঘোষ, এঁদের কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হয়েছে। এঁদের প্রথমোক্ত দুইজনের যে দুটো গল্প এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে তা মুসলিম জীবন নিয়ে লিখিত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটি দাঙ্গার পটভূমিকায় একজন মুসলিম সঙ্গীত-শিল্পীর জীবন নিয়ে এবং নরেন্দ্র মিত্রের রস গল্পটি পূর্ব পাকিস্তানের একটি মুসলিম পরিবারের জীবিকা ও প্রেম অবলম্বনে লিখিত। অপর তিনজনের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্পে আছে সিলেটের অন্তর্গত তাঁর শৈশবের একজন স্কুল পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত অথচ করুণাঘন জীবনালেখ্য, যা আজকের যে কোন স্কুল পণ্ডিতের বেদনার প্রতিধ্বনি হিসেবে বিচার্য হতে পারে। অন্যদিকে, বিমল মিত্রের মিলনান্ত এবং সুবোধ ঘোষের ফসিল গল্প দুটো সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গল্পগুলোর মধ্যেও বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে। গল্প সম্পর্কে যাঁদের সামান্য রসবোধ আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন কেন এই দুটো গল্প বর্তমান সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে।

প্রধানত দুটো উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই সঙ্কলনের গল্পগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। এক, যাতে করে আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সাথে পরিচিত হতে পারে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছোটগল্পে বর্তমানে যে জীবনবোধ ও সচেতনা দিন দিন প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে তার প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলনপূর্ণ আমাদের চারপাশের নিত্য পরিচিত মানুষকে জানতে ও বুঝতে পারে। সে কারণেই অশালীন কোন চিত্রায়ণে আমাদের

কোমলমতি ছাত্রছাত্রীর মন বিকৃতির স্পর্শে পীড়িত হতে পারে, এমন ঘটনাশ্রিত গল্প সঙ্কলনে স্থান দেয়া হয়নি। অবশ্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মানসিকতার মান বেশ কিছুটা উন্নত বলেই এ-গ্রন্থের অনেক গল্পে নরনারীর স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি, যা কিনা সাহিত্যের মূল অবলম্বন হিসেবে স্বীকৃত, চিত্রিত হয়েছে এবং আশা করা যায়, এ-থেকে ছাত্রছাত্রী তাদের মানসিক গঠনে প্রেরণা ও আলোকপ্রাপ্ত হবে। দুই, শুধু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীই নয়, দেশের অসংখ্য ছোটগল্প রসিক পাঠকবর্গও যাতে একটি সঙ্কলনের মাধ্যমে এমন কতকগুলো গল্পের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, যে গল্পগুলো সাধারণ ভাবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জীবনালেখ্যে ভাস্বর এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জীবনবৈভবে সমৃদ্ধ। এই পাঠকবর্গের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিচিত্র উপকরণে, বিভিন্ন উপাদানে, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে এবং শিল্প-প্রকরণে যে-সব গল্প উৎকর্ষতর গল্প হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দাবীদার, শুধুমাত্র সেইসব গল্পই এই সঙ্কলনে সংযোজিত হয়েছে। অবশ্যি এই সঙ্কলনে মুদ্রিত গল্পগুলো ছাড়াও যে বাংলা সাহিত্যে আর উৎকৃষ্ট গল্প নেই তা বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই—তবে একটি গ্রন্থের কলেবরে আমাদের সাধ্যসীমার মধ্যে যেটুকু সম্ভব, গল্পগুলো নির্বাচনের বেলায় সে দায়িত্ব যথাযথরূপেই পালন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ছোটগল্প সম্পর্কিত দীর্ঘ ভূমিকাটি অবশ্যি শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্যই লিখিত নয়, আমাদের অধ্যাপক, সমালোচক ও গল্পরসিক পণ্ডিতগণও এই ভূমিকা থেকে উপকৃত হতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। ছোটগল্প সম্পর্কে এমন বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব পাকিস্তানে আর কোথাও বিশেষ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ভাবের দিক থেকে এই গ্রন্থের গল্পগুলোকে মোটামুটি নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

(১) সমাজ সমস্যামূলক ঃ

(ক) বঞ্চনা-জনিত, তীব্র যন্ত্রণাবোধ ঃ—মহেশ, পুন্নাম, সমুদ্রের স্বাদ, ফসিল, পাদটীকা, উস্তাদ মেহেরা খাঁ, রস, শাড়ী-বাড়ী-গাড়ী, দুই তীর।

(খ) বঞ্চনা সত্ত্বেও ক্ষমার প্রশান্তি এবং এক বিশেষ ধরনের আদর্শজাত সহিষ্ণুতা ঃ—একরাত্রি, পুঁইমাচা, আবহাওয়া, ইমারত, পদ্মগোখরা, নতুন জন্ম, মিলনান্ত, জিব্রাইলের ডানা, এপার ওপার, লালমেঘ।

(গ) বঞ্চনার সফল প্রত্যুত্তর ঃ—দুর্বুদ্ধি, মন্ত্রশক্তি, জোঁক, কয়লা-কুড়ানো দল।

২। মনস্তত্ত্বমূলক রচনা ঃ—সমাপ্তি, অতিথি, মানুষের মন।

৩। হাস্যরসাত্মক রচনা ঃ—ফেল, চিকিৎসা-সঙ্কট।

৪। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশনা ও জীবনচিত্র ঃ—কালা মাঝির চড়নদার, নতুন জন্ম।

অবশ্যি একথা ঠিক, এই শ্রেণীবিভাগ চূড়ান্ত বলে গণ্য হতে পারে না—আলোচ্য গল্পের প্রায় সবগুলোর মধ্যেই এই লক্ষণগুলোর বহুলাংশ কম বেশী বিগ্যমান। আসলে ছোটগল্প জীবনের বিশেষ প্রাঙ্গণ থেকে উদ্ভূত বলেই এর সঠিক শ্রেণীকরণ একটি দুরূহ কর্ম।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বাংলা গল্প-সাহিত্যের জনক এবং এ-যাবৎ অনতিক্রান্ত প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এই গল্পের সূচনা এবং এ-গ্রন্থে তাঁর রচনার সংখ্যাধিক্য যুক্তির দিক দিয়ে অখণ্ডনীয়। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা তথা বিশ্ব-সাহিত্যে শুধু একজন অপর শ্রেষ্ঠ কবিই ছিলেন না, শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবেও তাঁর স্থান বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় এবং বিশ্বসাহিত্যেও অত্যন্ত বিশিষ্ট। ছোটগল্পের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলো তাঁর গল্পে বিশেষ-ভাবে স্ফূর্তি লাভ করেছে।

বর্তমান সঙ্কলনের "একরাত্রি" একটি গতিধর্মী ছোটগল্প। গল্পটি এক অকৃত্রিম ভাবাবেগের সংহত মাধুর্যে গীতি কবিতার সৌন্দর্য লাভ করেছে। স্বল্পপরিসর ঘটনার মাধ্যমে গল্পটির সামগ্রিক প্রবাহে যে অনুভূতির গভীরতা এবং আবেগের তীব্রতা সঞ্চারিত হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়াবহ। চরিত্র সৃষ্টিতেও গাল্পিক যেন কয়েকটি মাত্র রেখার বাঁধনে মানবজীবনের একটি বিশেষ দিকের চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন। গল্পটির মধ্যে নায়কের উচ্চশিক্ষার জন্যে গৃহত্যাগ, দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন রচনা, শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ, বাল্যপ্রণয়িনীর অন্য পাত্রে বিবাহদান ইত্যাদি অংশে বাস্তবতার যে ক্ষীণ প্রবাহ আভাসিত হয়েছে তার সবকিছুকে অতিক্রম করে যেন

একটি বিশিষ্ট মুহূর্তের বেদনামুখর সুরের ব্যঞ্জনাই পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে—এ যেন একটি বিশেষ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরের আলাপন, যে সুর তার প্রারম্ভিক মৃদুমধুর স্বরগ্রাম থেকে রাগরাগিণী ও তালমান লয়ের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছেছে। উকিল রামলোচন বাবুর বাড়ীর পাশে গ্রাম্য স্কুলের ধারেই পাঁচ ছয় হাত উঁচু জমিতে এক বন্যা বিদীর্ণ রাত্রিতে নায়ক স্কুল মাস্টারের জীবনে সেই দুর্লভ মুহূর্তের আবির্ভাব, যার সাথে তুলনা চলতে পারে শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শেষাবস্থার। চেনা পৃথিবীতে সে এক অচেনা উদ্ভাস, অভ্যস্ত পঙ্কিলতায় সে এক অপরিচিত অনুভূতির দীপ্তি। গল্পের মধ্যে যে চকিত প্রোজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষাৎ লাভ করা গিয়েছে তা জীবনে অনন্ত আনন্দের ও ঐশ্বর্যের অবলম্বন এই জন্যেই, যেহেতু তা অস্থায়ী। দুটো কেন্দ্রভ্রষ্ট কক্ষচ্যুত জীবনকে এক বিশেষ মুহূর্তে এক বিশেষ অবস্থায় খুব কাছাকাছি এনেছিল, কিন্তু কাছে এসেও তারা পূর্বের সেই জীবনে আর ফিরে আসতে পারে নি—নৈকট্য যেন তাদের দূরত্বকে আরো প্রগাঢ় করেছে। কিন্তু তবু এর মূল্য জীবনে যে কত অপরিসীম তার ব্যঞ্জনা-মুখর সুরেই এ গল্পের সমাপ্তি। তারা জানে বৃষ্টি থেমে যাবে, পানি সরে যাবে এবং তারা আবার ফিরে যাবে পরিচিত পৃথিবীর নিত্যনৈমিত্তিক আবর্তে, কিন্তু সেই এক রাত্রির বিশেষ ঘটনা যে অনুভূতির সম্পদ স্কুল পণ্ডিতের জীবনে দান করে গেল, তাই হয়ে থাকবে তার জন্যে এক সুরভিত অবিনশ্বর অভিজ্ঞতা।

'সমাপ্তি' গল্পের প্লট আবিষ্কৃত হয়েছিল একদা পদ্মাতীরে। সেদিন 'ছিন্নপত্র' ডায়েরীর আকারে যে ঘটনা স্থান পেয়েছিল তাতে ছিল অবিমিশ্র বেদনার অভিঘাত। বাংলা দেশের বাল্য-বিবাহ ব্যবস্থা যে কারুণ্যের সৃষ্টি করতে পারে, কবিগুরুর তা অজানা ছিল না। কিন্তু পদ্মাতীরের সেই ঘটনাটিই তাঁর মনে যে স্থায়ী রেখাপাত করেছিল, সমাপ্তি গল্পটি আসলে তারই ফসল। তবে গল্পাকারে যখন তাঁর সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা-প্রসূত কাহিনী 'গল্পগুচ্ছে' উপহৃত হোল, তখন তার বিস্ময়কর সুযমিত রূপায়ণ এবং অভাবিতপূর্ব সুসংহত বিন্যাস পাঠক সমাজকে বিমুগ্ধ করেছিল। সেদিনের ছিন্নপত্রের ডায়েরীতে একটি চপলা

বালিকার পতিগৃহে যাত্রার বিদায়-ঘন মুহূর্তের যে অবরুদ্ধ বেদনা কবির হৃদয় স্পর্শ করেছিল, এই গল্পে সেই ঘটনার অবিকল বর্ণনা স্থান পায় নি, তবে তার পরিবর্তে, ঘটনাটির একটি শিল্পসম্মত অথচ কারুণ্যে মহিমান্বিত স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। বস্তুত গল্পটির সমগ্র শরীরে লেখক এমন একটি প্রশান্তিময় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন যা এই গল্পকে শুধু বাংলা সাহিত্যে একটি অনাস্বাদিতপূর্ব গল্পেই উন্নীত করে নি —এর সামগ্রিক পরিবেশ ও সংহত আবেদন পাঠক মনে এক অনির্বচনীয় দ্যোতনাকেও ভাস্বর করে তুলতে সমর্থ। মৃন্ময়ীর সুচপলা বয়ঃসন্ধির অস্থিরতা এই গল্পের প্রাথমিক আকর্ষণকে উদ্বোধিত করেছে। তার চাঞ্চল্যের চিত্রকল্প আমাদের বিদ্যাপতির রাধিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদ্যাপতির রাধিকায় আমরা যৌবন সমাগমের এমনি একটি অশান্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসময় উদ্দামতা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সেই উদ্দামতা যে একদিন একটি স্থির ও প্রশান্ত প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে একটি নারী চরিত্রকে পরম রমণীয় হৃদয় ও দেহ-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সমাপ্তি গল্পে তার অভিব্যক্তি যেমন রস-মাধুর্য সৃষ্টি করেছে, বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও যেন এমন দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মিলে না। এই নারীর কমনীয় স্নিগ্ধতা, যা কিনা নিকষ প্রেমেরই স্পর্শে সঞ্জীবিত, শুধু নায়ক অপূর্বের জীবনকেই পূর্ণতার ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ করে তোলেনি, পাঠককেও নারী হৃদয়ের উষ্ণতার স্পর্শে যেন উদ্দীপিত করে তুলেছে। বিদ্যাপতির রাধিকাও অবশ্যি বয়ঃসন্ধিকালের অতিক্রমণে এমন একটি মহিমাময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে প্রেমের ও বিরহের স্পর্শে প্রগাঢ় অনুভূতির কেন্দ্র-বিন্দুতে উপনীত হয়েছিল এবং "মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী, ফাটি যাও তো ছাতিয়া" বলে অনাবৃত প্রেমের বিরহবিধুর আর্তনাদকেই বাণীরূপ দান করেছিল। কিন্তু বিদ্যাপতি রাধিকার হাহাকার প্রমূর্ত হয়েছে বিরহে আর সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ীর প্রশান্তিমা স্থির গৌরবে লাবণ্যমণ্ডিতা হয়েছে মিলনের মধুগন্ধ আনন্দের পরিতৃপ্ত আস্বাদনে। এছাড়া, বলাই বাহুল্য, সমাপ্তি গল্পে যুগের তরঙ্গাভিঘাত মুখরতা লাভ করেছে মানব-প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত সুমধুর অথচ জটিল জীবন চিত্রে।

'অতিথি' গল্পের তারাপদ এসেছে প্রকৃতির প্রতীক হয়ে। তার চারিত্রিক প্রকৃতি নির্মোহ এবং নিরাসক্ত। তাই জমিদার পরিবারের স্নেহ-প্রীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে তারাপদ অবশেষে চলে গেছে নতুনতর স্থানে। মায়ের স্নেহ-বাঁধন তাকে যেন কোনদিন অঞ্চল-আশ্রিত করতে পারেনি, জমিদারী বিলাসিতাও তাকে দান করতে পারেনি অহঙ্কার স্ফীতির স্পর্শ, এমন কি যে প্রেম মানুষকে একটি মহান গণ্ডীতে আবদ্ধ করে এবং যার স্পর্শ সঞ্জীবিত করে তোলে একজন মানুষকে সত্যিকার মনুষ্যত্বের মহিমায়, তাও এই প্রকৃতি-পরায়ণ কিশোরকে কোন বাঁধনেই আবদ্ধ করতে পারেনি। প্রকৃতির প্রতি এই চরিত্রের এক বিস্ময়কর আকর্ষণ—এ আকর্ষণ তার হৃদয়--গভীর থেকে আশৈশব উৎসারিত প্রকৃতির সাথে তার যেন কোন জন্মজন্মান্তরের রক্তের সম্পর্ক—প্রকৃতি থেকে তাই তার অস্তিত্বকে যেন বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। সব মানুষের সঙ্গেই প্রকৃতির কম বেশী সম্পর্ক ও নৈকট্য আছে তবে এ-গল্পের নায়ক তারাপদ চরিত্র এমন একটি উপাদান যেন লেখক উজ্জীবিত করেছেন যার ফলে মনে হয় প্রকৃতির নানা চাঞ্চল্যের সাথে সে যেন একাত্ম হয়েই গড়ে উঠেছে। এমন একটি চরিত্র শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল। গল্পটির সমগ্র কাঠামো গড়ে উঠেছে শুধু ঘটনা-বিন্যাসে নয়—এই একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের রূপায়ণকে কেন্দ্র করেই গল্পটির সবকিছু দানা বেঁধে উঠেছে। এ গল্পটি পড়তে গেলে বারবার সোনার তরী ও ক্ষণিকার কবিকেই মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকবির পক্ষেই বোধ করি এমন একটি বিস্ময়কর গল্প রচনা সম্ভব হয়েছে। মানব প্রকৃতির সাথে বিশ্বপ্রকৃতির এমন নিবিড় সংযোগ একটি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত প্রাঙ্গণে যেভাবে বিধান করা হয়েছে তা পাঠক হৃদয়কে শুধু এক অনাস্বাদিতপূর্ব গল্পরসেই অভিষিক্ত করে না—এক নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতির দ্যোতনায়ও বিমুগ্ধ করে। তারাপদ প্রকৃতির শিশু—প্রকৃতিপালিত স্নেহের দুলাল, তাই বিশেষ স্থানে, বিশেষ পাত্রে বা বিশেষ কোন বন্ধনে তার আসক্তি নেই--তার নিরঙ্কুশ গতি বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র। তার বাঁশী প্রকৃতির অনবচ্ছিন্ন আহ্বানের প্রতীক, গৃহবদ্ধজীবনে এই বাঁশীই তার মুক্তজীবনের সেতুবন্ধ। সেই বাঁশীর স্বর

যখন স্তিমিত তখন মায়ামমতা, প্রেমপ্রীতির সমগ্র বন্ধন তার নিকট অর্থহীন মনে হয়েছে—তার সামনে বিধ্বস্ত হয়েছে জীবনের সকল সম্মোহনের সেতুবন্ধ। তাই উন্মুক্ত দিগন্ত ও নীলাকাশ ঘেরা বিশ্ব-সৌন্দর্যের আহ্বানে প্রকৃতির সুবিস্তীর্ণ অঙ্গনে সেই চির-অতিথি যুবক আবার পলাতক হয়েছে আর গভীর প্রশান্তিতে যেন উচ্চারণ করেছে—

"আমি ঘরে বাঁধা ছিনু
সহসা আমারে আকাশে রাখিলে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
সব বাঁধা খুলে মুক্তি বাধনে
বাঁধিলে আমারে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া।"

দুর্বুদ্ধি গল্পটির সাদৃশ্য রয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই আরেকটি গল্প 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতার' সঙ্গে। এ গল্পের নায়কও রামকানাইয়ের মতোই সততার এবং মানবতার পরিচয় দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। অবশ্যি দুর্বুদ্ধি গল্পের মূল উপাদান ভিন্নতর এবং এই গল্পে গাল্পিক একটি ভিন্নমুখী আলোকেও সততার ও মানবতার সমস্যাটিকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। এ গল্পে আমরা দেখতে পাই, যে পর্যন্ত নায়ক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে দারোগার সঙ্গে যোগসাজস করে চলেছে সে পর্যন্ত তার নিরঙ্কুশ বৈষয়িক উন্নতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি—বরং দারোগার সহায়তা ও সহানুভূতিতে তার উন্নতি দ্রুততরই হয়েছে। কিন্তু সাধারণ একজন কৃষকের চূড়ান্ত বিপদের দিনে দারোগার অমানুষিক আচরণ তার বিবেককে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে—সর্পদংশে মৃত তার একমাত্র কন্যার ব্যাপার নিয়ে কৃষকটির ওপর থানার দারোগা যে অমানুষিক অত্যাচার করেছে তা দেখে নায়কের মধ্যে একদিকে মানবতার এবং অন্যদিকে সুপ্ত পিতৃত্বের উত্তাষণ ঘটেছে। সে দারোগার আচরণে বাধা দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অপর দিকে রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতার গল্পে, রামকানাই স্বভাবসূত্রে একজন সভ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি—কিন্তু দুর্বুদ্ধি গল্পের নায়ক সহসা উদ্ভূত একটি পরিস্থিতির সম্মুখে তার নিত্যদিনের কুৎসিৎ মুখোশে আবৃত এক সত্যসুন্দর সহানুভূতিপ্রবণ মানুষের বলিষ্ঠ বিবেককে

নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এবং মৃতকন্যার শোকে অভিভূত ও দারোগার পৈশাচিক আচরণে জর্জরিত কৃষকটির জন্য সত্যভাষণে অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং দুর্বুদ্ধি গল্পের নায়ক আপাতদৃষ্টিতে প্রথমাবধি দারোগার যোগসাজসে একজন স্বার্থনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে চিত্রিত হলেও তার মধ্যে যে একটি বিবেকসম্পন্ন মনুষ্যত্ব জীবিত ছিল সেই পরিচয়টিই পরিণামে চরিত্রটিকে মহৎ ব্যঞ্জনা দিয়েছে। অবশ্যি রামকানাই গল্পের প্রথম থেকেই একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বলেই তার শোচনীয় পরিণাম আমাদের যতটা সহানুভূতিতে উদ্বেল করে তোলে, দুর্বুদ্ধি গল্পের নায়কের বাস্তত্যাগের ব্যাপারটি আমাদের মনে তেমন তীব্র সহানুভূতির উদ্রেক হয়তো করে না—কিন্তু তবু দুর্বুদ্ধি গল্পের সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং সুসংহত শরীর নির্মাণে কবিগুরু এমন একটি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন যা বাংলা সাহিত্যে একান্তই বিরল। আর এ-কারণেই গল্পটি অনবদ্য একটি ছোটগল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। এছাড়া তৎকালীন বৃটিশ প্রশাসনিক অবস্থার ফলস্বরূপ এ-দেশের সর্বত্র পুলিশী জুলুমের কদর্যতা ও হীনমন্যতা যে কি নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, আইনের দোহাই দিয়ে ন্যায়বিচারের নামে নিরপরাধ মানুষের ওপর এই সব অর্থলিপ্সু কর্মচারী যে কি-রকম অমানুষিক অত্যাচার চালাতো, দুর্বুদ্ধি গল্পে তারই একটি বাস্তব চিত্র এমন নিখুঁত ভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যা পাঠকমনকে সত্যি অভিভূত করে। শুধু ব্রিটিশ আমলের কথাই বা বলি কেন, দুর্বুদ্ধি গল্পে চিত্রিত পুলিশী এবং বৃহত্তর অর্থে আমলাতান্ত্রিক নির্যাতনের বাস্তব চিত্রটি আজো আমাদের দেশে সত্য-গ্রামে বন্দরে নিরপরাধ মানুষেরা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও পুলিশের অত্যাচার ও দুর্নীতির প্রতাপে এমনি করেই নির্যাতন সহ্য করে চলেছে। এদিক থেকেও দুর্বুদ্ধি গল্পটির অবদান আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবহ।

'ফেল' গল্পের বিষয়বস্তুতে আমরা দুইজন জমিদার নন্দনকে জীবনের তুলনামূলক মানদণ্ডে দেখতে পাই। জমিদারের এক শরীকের উত্তরাধিকারী নলিনী লেখাপড়ায় মেধাবী এবং অগ্রণী অন্যপক্ষে আর এক শরীকের উত্তরাধিকারী নন্দ তুলনামূলক ভাবে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী, মেধার দিক থেকেও নিম্নস্তরের—কিন্তু সে আবার বৈষয়িক দিক থেকে করিৎকর্মা।

পরীক্ষায় বারংবার ফেল করিলেও নন্দ জীবনের অন্যবিধ ক্ষেত্রে নলিনীকে পরাজিত করতে চেয়েছে। নন্দের এই যে সচেতন প্রয়াস, ফেল গল্পের সামগ্রিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণে তার প্রভাব সর্বাধিক। এই সচেতন প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত জীবনের একটি বৃহত্তর ঘটনা বিবাহে এবং সর্বোত্তম পাওয়া দাম্পত্য জীবনের সার্থকতার স্তরে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। প্রতিযোগিতার সচেতন প্রয়াসে চঞ্চল ও হাস্যকরভাবে মুখর নন্দ বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি নীরব সাধক মিতভাষী নলিনীর নিকট পরাজিত হয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে নলিনীকে পরাজিত করতে গিয়ে নলিনী-নির্বাচিত মেয়েটিকেই সে বহু টাকার বিনিময়ে বিবাহ করেছে। অন্যপক্ষে এর প্রতিদানে নন্দ-প্রত্যাখ্যাত পাত্রীকেই শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচে নলিনী বিবাহ করেছে। বিয়ের পরে দেখা গেল নলিনীই সবদিক থেকে জিতেছে—সে একটি মধুর দাম্পত্য জীবনের স্পর্শ লাভ করে জীবনকে আরো সুন্দর ও মহৎ করে গড়ে তুলতে প্রেরণা পেয়েছে। গল্পটির মধ্যে হাস্যরস আছে, কৌতুক প্রবণতা আছে—কিন্তু এই তারল্যের মধ্য দিয়ে সুদক্ষ ও মহৎ শিল্পী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটি সহজ অথচ সুন্দর সত্যকেই প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। শুধু বাহ্যিক আয়োজন ও মুখর সমারোহের মধ্যে দিয়েই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্যে সফলতার পথে এগোতে পারে না—এজন্য চাই নিষ্ঠা, এজন্য চাই সাধনা। এ-গল্পে বিজয়ী নলিনীর সেই সাধনা ও নিষ্ঠা ছিল, নন্দের মধ্যে ছিল তার উল্টোটি। তাই সে বিদ্যালয়ে যেমন, জীবনের সার্থকতার ক্ষেত্রেও তেমনি শুধুমাত্র ফেল করেছে। এ ছাড়া এই গল্পে একটি সহজ সরল পরিবেশের মধ্য দিয়ে লেখক নিয়তির সুনির্দিষ্ট লিখনকেই যেন পরোক্ষভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন। সকল আয়োজন ও প্রয়াস সত্ত্বেও মানবজীবনে পরাজয় কিভাবে আসতে পারে, সেকথা এই গল্পের শরীরে যেন ছায়ার মতই বিরাজমান। শুধু সমস্ত সচেতন প্রয়াসেই যে অপ্রতিরোধ্য মানব জীবনের ট্র্যাজেডীকে অস্বীকার করা যায় না, এ গল্পে তার একটি পরোক্ষ দুর্নিবার্যতা লক্ষণীয়। কবিগুরু তরল হাস্যে বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে যেন জীবনের সেই করুণাঘন সত্যকেই এ-গল্পে নিরীক্ষণ করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর 'মন্ত্রশক্তি' গল্প একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সার্বজনীন আস্বাদন, যা উপসংহারে একটি তাত্ত্বিক নিগূঢ়তা ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। ঈশ্বর পাটনী পেশাগত ভাবে মাঝি হলেও তার নৌচালনার বিষয় নিয়ে এ-গল্পের মূল কাহিনী গড়ে ওঠে নি, বরং তার অননুশীলিত লাঠি চালনার চমকপ্রদ নৈপুণ্যই এ-গল্পের মৌলিক উপাদান নির্মাণ করেছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে সে অতীতের নৈপুণ্যকে অকস্মাৎ ফিরে পেয়েছে এবং দীর্ঘকাল অনুশীলনের অভাব সত্ত্বেও সে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ লাঠিওয়ালাদের একক এবং সমবেত প্রচেষ্টাকে একদিন দর্শকদের সম্মুখে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কেননা গল্পের নাম থেকেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মানুষের সামর্থ-শক্তির বাইরেও মন্ত্রশক্তি বলে কিছু আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন্ত্রশক্তির প্রতি এই বিশ্বাসকে লেখক এমন শিল্পচাতুর্যে রূপদান করেছেন, যার ফলে মনে হবে, যে বা যারা বিশ্বাস করে তাদের সেই বিশ্বাস বাস্তব—এ-গল্পে সেই বাস্তবতার রূপায়ণ আছে, অন্যদিকে লেখকের গল্প-বর্ণনার পশ্চাতে একথাও প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, একটি বিশেষ মানুষ মুহূর্তে একটি বিশেষ প্রেরণায় এমন অদম্য ও আশ্চর্য শক্তির অধিকারী হতে পারে, যা বিস্ময়কর। এই শক্তি সাধারণ বিশ্বাসে মন্ত্রশক্তি, বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তির আলোকে এর নাম মানুষের অন্তর্নিহিত প্রেরণা-শক্তি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ

'তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছো যে ভরে
কেই বা সে জানে।'

সুতরাং মন্ত্রতন্ত্রের ওপর সাধারণ মানুষের সংস্কারজাত বিশ্বাস এ-গল্পের কাঠামো—কিন্তু গল্পের নিজস্ব শক্তি সেই বিশ্বাসকে অতিক্রম করে গল্পটিকে একটি আধুনিক চারিত্র্য দান করেছে। গল্পলেখক হিসেবে শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যে গদ্যের বিবর্তনে প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাথেই তুলিত হতে পারে। এই গল্পের বর্ণনাকৌশলে এবং শিল্পপ্রকরণে প্রমথ চৌধুরী সেই শক্তির পরিচয় যথার্থভাবেই দিয়েছেন। কাহিনী নয়, বরঞ্চ কাহিনীর বর্ণনাভঙ্গী, পরিবেশন এবং সামগ্রিক উপস্থাপন কৌশল এই গল্পের অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়। বিষয়কে অতিক্রম করে বিষয়ী যে সাহিত্যে একটি পরম রমণীয় আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠকচিত্তকে

স্পর্শ করে, প্রমথ চৌধুরী তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধগুলোতে যেমন, এ গল্পেও তেমনি তার প্রমাণ দিয়েছেন।

'মহেশ' গল্পটি শরৎ চন্দ্রের অপর শ্রেষ্ঠ গল্প। এ-গল্পটিতে একটি গৃহপালিত পশু 'মহেশে'র সঙ্গে মানবসম্পর্ক যেন এক অকুণ্ঠ হৃদয়াবেদন সৃষ্টি করেছে। বিরাট কলেবর ও বিচিত্র ধর্মী শরৎ—সাহিত্যের অজস্র চরিত্রের মধ্যে মুসলমান চরিত্র সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। কিন্তু তবু যে কয়েকটি মুসলিম চরিত্র তিনি তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে শ্রীকান্তের গহর, পল্লীসমাজের আকবর, দেনাপাওনার ফকির বাবাজী এবং মহেশ গল্পের গফুর বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য চরিত্র। লেখকের সহানুভূতিতে এবং দরদমাখা দৃষ্টির স্পর্শে এই চরিত্রগুলো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। ইসলামের সাম্যবাদী নীতি, মানবীয় আবেদন এবং মুসলিম সমাজের সহনশীলতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে তাঁর একটি গভীর শ্রদ্ধাবোধ বিভিন্ন উক্তিতে ধরা পড়েছে। মুসলিম চরিত্র অঙ্কনের বেলায়ও তিনি যেন সেই শ্রদ্ধাকেই জাগ্রত রেখেছেন। মহেশ গল্পের গফুর এবং তদীয় কন্যা আমিনা এমনি চরিত্র।

এ ছাড়া এই গল্পের মধ্য দিয়ে একটি পারিবারিক ঘটনা সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে এবং চিরন্তন নিঃস্ব নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদে গল্পটি এক করুণ অভিব্যক্তিতে জমাট বেঁধেছে। আধুনিক কালের অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণী সংগ্রামের সুতীব্র দহন এই গল্পের মর্মস্থলে বিরাজমান। গফুর শ্রেণী-সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ মানুষের প্রতীক—শোষিত ও শোষকের সংগ্রাম সে প্রলেতারিয়েত গোষ্ঠীর আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয় নি অথবা তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুলবার শক্তিও তার নেই। সে ক্ষয়িষ্ণু ও নিঃশেষিত-প্রায় শোষিত মানুষের সকল হাহাকার বুকে নিয়ে ভিটে মাটি ও গ্রাম ত্যাগ করেছে। অন্তরে তার প্রতিরোধ স্পৃহা ছিল, কিন্তু সেই স্পৃহার বাস্তবায়ন তার পক্ষে অসম্ভব, তাই শেষ পর্যন্ত সে পরোক্ষভাবেই জন্মগ্রাম পরিত্যাগ করে শহরবাসের প্রেরণাকেই সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই কাহিনীর মাধ্যমে আরেকটি সত্যও যেন প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে—সে হোল, কিভাবে যে শিল্পসভ্যতা কৃষিসভ্যতার ওপর ধীরে ধীরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, যার ফলে কৃষক পরিণত হয়েছে

সর্বহারা মজুর শ্রেণীতে, আর গড়ে উঠেছে মেরুদণ্ডহীন পর-নির্ভর একটি বিরাট গণসমাজ। শরৎ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য একদিকে এই সমাজের বেদনাক্রান্ত আর্তনাতে মুখর, অন্যদিকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের চেতনায় সবাক। অসম ভূমি ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শোষণ মানুষের চিরন্তন স্বাধীনতাকে যেন ক্রমশই হরণ করে চলেছে। তার অবসান আমাদের সমাজে সম্ভব না হোক, সাহিত্যে একান্ত কাম্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে— সাহিত্যে একটি শোষণমুক্ত সমাজের সংগ্রাম বারবার ঘোষিত হয়েছে। মহেশ গল্পে সেই প্রেরণা যে বিদ্যমান তা অস্বীকার করা যায় না। এই গল্পে একদিকে যেমন শোষিত মানুষের নিঃস্বতার ক্রন্দন হাহাকারের মধ্যে বাণীরূপ লাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে উদ্ভূত বর্তমান যুগের যে যন্ত্রণা আমরা দিন দিন বিভিন্ন সমাজে প্রকটিত হতে দেখি, তারই একটি সার্থক প্রাতফলনও যেন এই গল্পের মৌলিক কাঠামোতে বিদ্যমান। এই গল্পের যন্ত্রণাহত বিক্ষুব্ধ চিত্ত গফুরের শোষণ-ক্লিষ্ট কাহিনী ওয়াডম্যানের "মাই ফাদার ছিট্‌স, ইন দি ডার্ক" গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহেশ গল্পের আরো একটি দিক আছে। আঙ্গিক গঠনবিন্যাসে এ-গল্প বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে।

বর্ণনাভঙ্গীর ব্যঞ্জনাগর্ভ বলিষ্ঠতা এবং গীতিকবিতা-সুলভ সংহতি 'মহেশ' গল্পটিকে যে শিল্প-সাফল্য দান করেছে তার নজীর একান্ত বিরল। গল্পটির প্রারম্ভে একটি ঔপন্যাসিক পট-বিস্তৃতি এবং উপসংহারে একটি মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের অনুভূতি এ-গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ্য। কাশীপুর গ্রামের ছোট জমিদারীর লোমহর্ষক বিবরণ, নিদারুণ বিভীষিকা-ময় গ্রাম্য গ্রীষ্মের বর্ণনা, গ্রাম্য সমাজের মারাত্মক হৃদয়হীনতা, যার উপাদান যৌথভাবে যুগিয়ে আসছে দিনের পর দিন নিষ্ঠুর শাসক ধর্মের বাহ্যিক অনুশাসনে অন্ধ স্বার্থান্বেষী ধর্মপ্রচারক এবং অর্থ-কৌলিণ্য-গর্বে স্ফীত মুষ্টিমেয় মানুষ, ইত্যাদির বাস্তব রূপায়ণ এই গল্পের আবেগে, অনুভূতিতে, মাহাত্ম্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। মোটের ওপর বক্তব্যে, প্রকাশভঙ্গীতে, বলা যেতে পারে, 'মহেশ' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ।

[৩,]

'চিকিৎসা-সঙ্কট' রাজশেখর বসুর একটি খ্যাতনামা গল্প। রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম নামেই বিখ্যাত। তাঁর বিশিষ্ট স্টাইল এই গল্পে উপস্থিত। অত্যন্ত লঘু ভঙ্গীতে ধনী ব্যক্তির বিচিত্র খেয়ালের খেলা এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসকদের সেবার নামে সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির সুন্দর পরিচয় গল্পটিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। ঘটনাটি অত্যন্ত সামান্য। একদা বিত্তবান নন্দবাবু ট্রাম থেকে পড়ে কিঞ্চিৎ ব্যথা পেলে তার ধারণা হোল শরীরের কোন অংশে হয়তো মারাত্মক ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছে। তার এই ধারণাকে উৎসাহিত করেছে তার মোসাহেব সঙ্গীদের দল। অবশেষে মোসাহেব বন্ধুদের অদম্য উৎসাহ ও সহানুভূতির প্রেরণায় নন্দবাবুকে এক ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তারের চেম্বারে, কবিরাজ থেকে হেকিমের দরজায় দ্রুত যাতায়াত শুরু করে দিতে দেখা গেল। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী, হেকিমী কেউ বাদ গেল না। যথারীতি অর্থব্যয় হোল, বন্ধু মোসাহেবদের পাল্লায় পড়ে সে নিঃস্ব হবার প্রান্তে এসে দাঁড়াল, কিন্তু তার রোগের কোনরূপ উপশম দেখা গেল না। এমনি সঙ্কটের শেষ দৃশ্যে পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূতা হয়েছে একজন মহিলা চিকিৎসক, নন্দের আসল ব্যাধির উৎস সন্ধান করে নন্দের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে সে। নন্দবাবু এবার নিশ্চিন্ত হয়েছে, কেননা গৃহিণীর আগমনে শোষণকারী মোসাহেব বন্ধুদের নন্দের গৃহে আর ভিড় করতে দেখা গেল না। গল্পটিতে একদিকে কৃত্রিম বন্ধুত্বের মুখোস উন্মোচিত হয়েছে, অন্যদিকে প্রতারণা, আত্মম্ভরিতা, ধনিক সন্তানের অদ্ভুত খেয়াল, তার সামান্য অসুখে অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও অর্থের প্রতি মমত্বহীনতা ইত্যাদি একটি অপূর্ব ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া চিকিৎসকের কঠিন ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি, হৃদয়হীনতা এবং নিজ নিজ পেশা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যের অন্তঃসারশূন্যতা এই গল্পে তির্যকভাবে চিত্রিত হয়েছে। সর্বোপরি গল্পটির হাস্যরস এ-গল্পকে একটি চমৎকার রসাল গল্পে পরিণত করেছে। গল্পটি পড়লে মনে হয়, এ-গল্পটিতে স্যাটায়ারের জ্বালা নেই, হিউমারের বেদনাও নেই, বরং রয়েছে উইটের নির্দোষ একটি আনন্দ-সরস অভিব্যক্তি। এ জন্যই বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্পভাণ্ডারে এ-গল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বিভূতি ভূষণের একটি স্মরণীয় গল্প 'পুঁইমাচা'। একটি সাধারণ পুঁইমাচা এ-গল্পে অবিনস্বর জীবনের স্মারক রূপে উপস্থাপিত। গল্পের নায়িকা ক্ষেন্তি উদরপরায়ণা এবং সদাচঞ্চলা একটি বালিকা। ঘরে তার মন বসে না, বনে বাদাড়ে ফলফলসি গাছপালায় তার আকর্ষণ। তার পেটুকতা ও চাঞ্চল্য প্রশ্রয় পেয়েছে তার উদরপরায়ণ পিতার নিকট থেকে। মেয়েটির খাদ্য লোলুপতা এবং পিতার অস্বাভাবিক পেটুকতা সংসারের গৃহিণী অর্থাৎ ক্ষেন্তির মা মোটেই সুনজরে দেখতে পারে না। জননীর একটি গোপন অথচ বেদনাবিধুর উদ্বেগ এবং তৎসহ মৃদু ভর্ৎসনা গল্পটিতে এক মনোরম পারিবারিক অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। এরপর ক্ষেন্তির বিয়ে হয়েছে এবং কিছুদিন পর তার অকাল মৃত্যুতে গল্পের পরিণতি যে গভীর বেদনায় অভিষিক্ত হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেই করুণ পরিবেশের নিবিড় উদ্বোধন ও সংহত অবসান ঘটেছে একটি তির্যক উপস্থাপনায়, আর সেকারণেই গল্পটির উপসংহার মানবজীবনের একটি মর্মন্তুদ দৃশ্যপট উন্মোচন করে তুলেছে। প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে ফেলে দেওয়া পুঁই-এর ডালগুলো কুড়িয়ে আনবার জন্য একদিন ক্ষেন্তি মায়ের বকুনি খেয়েছিল, অথচ সেই পুঁই গাছের একটি কচি চারা থেকে উদ্ভূত ক্ষেন্তির স্বহস্তরোপিত পুঁই গাছ যখন মাচার অবলম্বনে শাখা বিস্তার করে শ্যামল রূপ ধারণ করেছিল তখন বেদনাধৃত মায়ের মনে বারবার যেন এ-কথাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল যে, এই গাছগুলি রয়েছে কিন্তু তার ক্ষেন্তি কোথায়? ক্ষেন্তি নেই, আর তার জন্যে এই পৃথিবীতে যেন কারো কোন ক্ষতি হয়নি। অথচ মা জানে আর জানে তার আপাত-উদ্বেগবিহীন পিতা যে তাদের উভয়ের হৃদয়কে কি এক সীমাহীন শূন্যতায় প্লাবিত করে দিয়েছে ক্ষেন্তির আকস্মিক মৃত্যু। এই বেদনা হয়তো এতো গভীর হতো না যদি না ক্ষেন্তির বিবাহ ও মৃত্যুর পশ্চাতে থাকতো একটি শোষণপুষ্ট সমাজ আর তাদের আর্থিক দুর্গতি। পেটুক মেয়েটির আহারের সামান্য দাবীও যে তার শৈশবে ও কৈশোরে জননী মেটাতে পারেনি এ-বেদনা যেন ক্ষেন্তির মৃত্যুর পর মায়ের মনে আরো তীব্রতর হয়ে বেজে উঠেছে। সুতরাং গল্পটির সমগ্র শরীরে এদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক দুর্গতি, স্নেহের প্রাবল্য, অন্ধ ধর্মভিত্তিক ও স্বার্থ-

কেন্দ্রিক সমাজের হৃদয়হীন অনুশাসন প্রভৃতি এমন নিখুঁত শিল্পরূপ ধারণ করেছে যার মূল্য অনবদ্য। আর এ-সবের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের করুণতম ট্র্যাজেডীই যেন উজ্জ্বল স্বাক্ষরে গল্পটির উপসংহারে আর্তনাদ করে উঠেছে। এ গল্প পড়বার সময় আমরা যেন ভুলতে পারি না যে, গল্পের লেখক "পথের পাঁচালীর সুদক্ষ শিল্পী। বিভূতি ভূষণের চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতা, বাকবিন্যাসের পারদর্শিতা এবং সমাজের অন্তঃসার-শূন্যতার মাধ্যমে মানবজীবনের গভীর ট্র্যাজেডীর উদ্ভাষণ-ক্ষমতা তাঁর অন্যান্য লেখায় যেমন, এ গল্পেও তেমনি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে সমাজ উপেক্ষিতা মেয়ে ক্ষেন্তি এবং তার জননীর প্রতি লেখকের যে নীরব অথচ দরদমাখা সহানুভূতি স্ফূর্তিলাভ করেছে তা বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার চেকভের 'এ ডেইন দি কানট্রি' গল্পের অভিজ্ঞতাকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। দুই গল্পেরই মর্মান্তিক উপসংহার মানবজীবনের বাস্তব কারুণ্য থেকে উৎসারিত।

মাহবুব উল-আলমের আবহাওয়া গল্পটি বঞ্চিত পিতৃ-হৃদয়ের আশ্রয় অবলম্বনের করুণ কাহিনী। অবশ্যি গল্পটি গভীরতায় ও শিল্পোৎকর্ষে সমজাতীয় গল্প রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালার সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। মিনির প্রতি কাবুলীওয়ালা গল্পের মধ্যএশীয় নায়কের রক্ত-সম্পর্ক-শূন্য বাৎসল্যকে কবিগুরু একটি সুগভীর দ্যোতনায় চিরন্তন পিতৃ-হৃদয়ের দুর্বলতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। আবহাওয়া গল্পের রাজমিস্ত্রী কমলের সর্ববস্তুর প্রতি অভিযোগের মনোবৃত্তি অবশেষে সহিষ্ণুতায় পরিণত হয়েছে গৃহমালিকের শিশুপুত্রের প্রতি অকস্মাৎজাগ্রত আপত্য স্নেহের অবলম্বনে। কমলের কর্মে উদাসীনতা দূরীভূত হয়েছে এই শিশুপুত্রের সারল্যমাখা একটি মহৎ সান্নিধ্যে। আমরা জানি, কাবুলীওয়ালা গল্পে কাবুলীওয়ালার কাঠখোট্টা এবং কৃপণ স্বভাব দূরীকৃত হয়েছিল মিনির সুস্নিগ্ধ সান্নিধ্যে। সুতরাং উভয় গল্পে রক্ত-সম্পর্কশূন্য বাৎসল্য বয়স্ক ব্যক্তির স্বভাবের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। শিশুর সরল সান্নিধ্য বয়স্ক ব্যক্তির মেজাজ ও চারিত্র্যে প্রভাব বিস্তার করেছে এই দুই গল্পেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালায় এই বাৎসল্যের উন্মেষ শুধু রক্ত-সম্পর্ক-শূন্যতার মধ্যেই সীমিত নেই, অন্য জাতি, অন্য ধর্ম, অন্য ভাষা এবং সর্বোপরি ব্যাপক ভৌগোলিক দূরত্বের

প্রাচীর লঙ্ঘন করে তা উন্মুক্ত মানবিকতার আকাশতলে প্রতিবিম্বিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং কাবুলীওয়ালার বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আবেদন আবহাওয়া গল্পে অনুপস্থিত। উপরন্তু টেকনিকের দিক দিয়েও কাবুলীওয়ালার শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যঞ্জনা আবহাওয়া গল্পে নেই। আবহাওয়া গল্পের শিল্পপ্রকরণ দুর্বল, কেননা সমগ্র কাহিনীর অখণ্ডতা একটি সার্থক জমাটবাঁধা রূপে প্রতিভাত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একটি বঞ্চিত পিতৃহৃদয়, অর্থাৎ নবীন-এর হৃদয়ানুভূতির সামগ্রিক দিকটি এ-গল্পে অনুদ্ঘাটিতই থেকে গেছে। গল্পে তার আচরণে এমন কিছু সার্থক ভাবে প্রকাশ পায়নি যার ফলে তার ব্যঞ্জনাজনিত মর্মজ্বালা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতে সমর্থ। অবশ্যি গল্পের উপসংহারে লেখকের জবানীতে এ প্রসঙ্গের উপস্থাপনা দেখা যায়—কিন্তু তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে মনে হয় লেখক যেন উপসংহারে এমন একটি সংবাদ পরিবেশন করেছে মাত্র। এই সংবাদটি বড় জোর অতি নাটকীয় একটি চমক সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে কিন্তু গল্পটির উপসংহারে তা যেন কোন সার্থক দ্যোতনা ও অতৃপ্তি সৃজনে ব্যর্থ হয়েছে। এই ত্রুটি সত্ত্বেও, গল্পটি যে সুখপাঠ্য সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এ-ছাড়া মাহবুব-উল আলমের সৃষ্টিধর্মী একটি আবেগ ও শিল্পধর্মী একটি দরদী অনুভূতি, যা তাঁর কথাসাহিত্যের ব্যাপক পরিসরে প্রমূর্ত হতে দেখা গিয়েছে, এই গল্পেও বিদ্যমান। এদিক থেকে গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে যে সব কথা-শিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছেন, তারাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম। তাঁর ইমারত গল্পটি মানবজীবনের ব্যঞ্জনাজনিত তীব্র বেদনার অভিব্যক্তিতে মাহাত্ম্য লাভ করেছে। এই গল্পের নায়ক রাজমিস্ত্রী জনাবালি পরের জন্যে সারাজীবন কেবল ইমারতই গড়ে তুলেছে, অথচ তার নিজের জন্যে ইমারত দূরে থাক, সামান্য একটি বাসগৃহের সংস্থানও সে করতে পারে নি, যেখানে সে খুঁজে পেতে পারতো তার মাথা রাখবার এতোটুকু ঠাঁই। সারাজীবনের কর্মব্যস্ত অনাবিল সাধনায় না হোল তার ঘর, না হোল ঘরণী। প্রেম তার এই কর্মব্যস্ত এবং আর্থিক সঙ্কটে নিষ্পিষ্ট জীবনে প্রবেশের পথ খুঁজে পায়নি। তবু যে দু'একজন নারীকে সে

হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিল তারা ধরা দেয়নি—হয়তো ধরবার ছলাকলা কৌশল এই নিষ্ঠাবান মিস্ত্রীর জানা ছিল না। তার একমাত্র অনুরাগ ও আনন্দ ছিল নতুন ছাঁচে ইমারত গড়ে তোলায়। তাই নারীর দেহের আনন্দ অনেকবার নিবিড়ভাবে উপভোগ করলেও প্রেম সে লাভ করতে পারে নি। এই ব্যর্থতার জন্য তার নিরঙ্কুশ মিস্ত্রী-স্বভাব, অথবা অকৃত্রিম কর্মনিষ্ঠা যেখানে ফাঁকির সামান্যতম স্পর্শ নেই, যে কেবল দায়ী তা নয়, এর পশ্চাতে রয়েছে পটভূমিকা হিসেবে আমাদের হৃদয়হীন সমাজ, সমাজের আর্থিক বৈষম্য। অপরের ইমারত তৈরীর এই আনন্দ ও নিষ্ঠা জনাবালিকে জীবন সায়াহ্নে কি দিয়েছে? যা সে পেয়েছে সে শুধু জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা, সে শুধু স্তূপীকৃত বঞ্চনা। তবু গল্পের শেষে এই কর্মনিষ্ঠ মানুষটি এক অদ্ভুত আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেছে এবং বেদনার্ত মুহূর্তেও যেন প্রত্যয়ের শেষ রশ্মিটুকু তার প্রাণমনকে আলোক আভায় অস্তগামী সূর্যের ন্যায় সামান্য রেখায় রাঙ্গিয়ে দিয়েছে, যখন অন্তিম মুহূর্তে সে দেখেছে যে তারই স্বহস্ত গড়া মসজিদের মিনার আকাশ ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শেষ আশ্রয়স্থল বটতলায় শায়িত ও মৃত্যুপথযাত্রী এই মিস্ত্রীর অন্তিম আঁখিকে তার স্বহস্তগড়া মসজিদের মিনারের দৃশ্য সজল করে তুলেছে, হয়তো সামান্যতম আনন্দের আভায়, হয়তো করুণতম বেদনার স্পর্শে, আর তার মৃত্যু ঘটেছে সেই বটগাছের নীচে। কেননা এইতো খোদার হাতে গড়া আসল ইমারত,—বাংলা দেশের প্রাণ শক্তির প্রতীক এই বটগাছ। এই গাছ বাংলা দেশের বহু প্রবঞ্চিত ও নিপীড়িত নিঃসহায় মানুষের শেষ শয্যায় ছায়া বিস্তার করে, যেমন করেছে আজীবন ইমারত প্রস্তুতকারী জনাবালীর মৃত্যুর মুহূর্তে। আজীবন বঞ্চিত জনাবালীর শেষ শয্যা রচনায় শুধু নয়, চরিত্রটির উপাদান নির্মাণে এবং সমগ্র গল্পের কাঠামো রচনায় লেখক যে শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তার নজীর একান্তই বিরল। এ-গল্পের রাজমিস্ত্রি আমাদের আবহাওয়া গল্পের রাজমিস্ত্রির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু জনাবালী আবহাওয়া গল্পের রাজমিস্ত্রি কমল ও নবীনের চেয়ে অনেক বেশী পেশাগত ক্ষেত্রে বাস্তব। আর এ কারণেই

বলতে হয়, ইমারত গঠনের দীর্ঘ বিলম্বিত পর্যায়গুলো এ গল্পে আবহাওয়া গল্পের তুলনায় বলিষ্ঠতম মনস্তত্ত্বে উদঘাটিত।

'পদ্মগোখরো' নজরুলের একটি প্রখ্যাত গল্প। গল্পকার হিসেবে নজরুল কবি ও গীতিকার নজরুলের যত শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হন নি, তথাপি মুষ্টিমেয় যে কয়টি গল্প তিনি রচনা করেছেন তার মধ্যে 'পদ্মগোখরো' আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। 'পদ্মগোখরো' গল্প সর্পশিশু এবং নারীর বাৎসল্য অনুপম শৈল্পিক মাধুর্য লাভ করেছে। জন্তুর সাথে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যতগুলো ছোটগল্প লিখিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' এবং তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' ও 'নারী ও নাগিনী' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-গুলোর মধ্যে 'মহেশ' সামাজিক, 'আদরিণী' অর্ধ সামাজিক ও অর্ধ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, 'কালাপাহাড়' পারিবারিক আর 'পদ্ম'-গোখরো' গল্পটি একান্তভাবেই ব্যক্তিক। এই ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' ও ব্যালজাকের 'প্যাশ্যান ইন দি ডেজার্ট' গল্পের সঙ্গে। নারী ও নাগিনী গল্পে হিংস্র নাগিনীর সঙ্গে খোঁড়াশেখের প্রেম তার পত্নী জুলেখার প্রেমে ভাটা এনেছিল, আর নজরুলের গল্পে ঠিক তার উল্টোটিই ঘটেছে। নায়িকা জোহরার সর্প-বাৎসল্য তার স্বামী আরিফের দাম্পত্য সম্পর্কে রন্ধ্র রচনা করেছে, যদিও এ-গল্পে জোহরার বঞ্চিত মাতৃত্বই একজোড়া সর্প-শিশুকে বাৎসল্যের স্নেহে আকর্ষণ করেছিল, সর্পের প্রতি তার প্রেমের লেশমাত্র ছিল না। এই সর্প শিশুদ্বয়ের মাধ্যমে সে ফিরে পেয়েছিল তার মৃত যমজ শিশুর প্রতি অবরুদ্ধ বাৎসল্য। গল্পটির উপসংহারে সর্পহত্যার পর জোহরার যমজ সর্প প্রসবে মৃত্যুর দৃশ্যটি যেন বেশ কিছুটা অতিপ্রাকৃত ঘটনার ন্যায় প্রতিভাত হয়। এমন অতিপ্রাকৃত ঘটনার সন্নিবেশ এ গল্পে বারংবার ঘটেছে। অথচ নারী ও নাগিনীতে রোমহর্ষক ঘটনা থাকলেও তা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গাম্ভীর্য লাভ করেছে। নজরুল ইসলামের কাব্যিক আবেগ এ-গল্পে অনেক স্থলে অসংযত হয়ে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে বলে মনে হয়। ব্যালজাকের 'প্যাশ্যান ইন দি ডেজার্ট' গল্পে মরুভূমিতে পলাতক নায়কের সঙ্গে সিংহীর যে প্রণয় তা

একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে বীভৎস রসের মাধ্যম যে সৌন্দর্যের স্থষ্টি করেছে তা সত্যি গল্পটিকে এক অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা দান করেছে। এমন রসঘন পরিবেশ বাংলা সাহিত্যে বিরল। অন্যপক্ষে 'পদ্মগোখরো' গল্পে দুটো সর্পশিশুর সান্নিধ্যে জোহরার অপরিতৃপ্ত মাতৃত্বের উদ্ঘাটন একটি ভয়ঙ্কর রম্যতার স্থষ্টি করেছে। এ কারণেই বলতে হয়, সবকিছু মিলে গল্পটি প্লটের অলৌকিকতায়, তথা বীভৎস রসের উপস্থাপনায় অপূর্ব নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং বাংলা গল্প সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনাংশকে অতিক্রম করে এ গল্পের মৌলিকতা মানব মনের একটি বাস্তব চেতনাকেই যেন প্রকটিত করেছে। মানুষের মন এমন সব বিচিত্র অনুভূতি ও আবেগের উপাদানে পরিপূর্ণ যার সন্ধান পাওয়া দুরূহ। কবি নজরুল যেন তাঁর পদ্মগোখরো গল্প তারই একটি অনাবৃত অঞ্চলকে উন্মোচন করেছেন। গল্পে অতিপ্রাকৃততা আছে, অবাস্তবতার স্পর্শও বিদ্যমান, কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও মৃত শিশুর শোকে একটি বঞ্চিতা মাতৃহৃদয় যে কিভাবে কোন্ ফাঁকে এক জোড়া সর্পশিশুর নিকট বাৎসল্য স্নেহে ধরা দিয়েছে তার বাস্তবতাকে তো কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না—কেননা মানুষের মন, আগেই বলেছি, বিচিত্র উপাদানে তৈরী এবং এর এমন দিক রয়েছে যার ওপর মানুষ নিজেই যেন আধিপত্য বিস্তারে অক্ষম। মানবজীবনের সেই অক্ষমতা ও দুর্বলতাজনিত ট্র্যাজেডীই এ-গল্পে বাস্তব আলোকে সমুজ্জ্বল। এবং এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটির বিচার করলে বাংলা সাহিত্যে এ গল্পের বিশিষ্ট স্থানকে অস্বীকার করা যায় না। গল্পটি অভিনব বিষয়বস্তু ও শিল্প প্রকরণে সমৃদ্ধ।

'মানুষের মন' গল্প একটি মনস্তাত্ত্বিক রচনা। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের ছোটগল্পসমূহের একটি বিশেষ শিল্পগত বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর গল্পগুলো আকৃতিতে ছোট, বিষয়বস্তুতে বিচিত্র, এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। ছোটগল্প রচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে বনফুল একজন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। সীমিত ভাষণে মানব চরিত্রের যে সব অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলোকে তিনি আমাদের সম্মুখে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে তুলে ধরেছেন, তার মূল্য অপরিসীম। মানুষের মন গল্পটি তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে

একটি অনবদ্য গল্প। গল্পটির আয়তন যেমন ক্ষুদ্র, প্রকৃতিতে তেমনই নাটকীয় এবং বাকবিন্যাসে তেমনি ঘনীভূত একখণ্ড শ্রাবণের মেঘের মত। গল্পটিতে পরস্পর বিরোধী মতবাদের বিশ্বাসী দুই ভাই তাদের ব্যক্তিগত মতদ্বৈধতা ভুলে গিয়েছে একটি বিশেষ ও আকস্মিক ঘটনায়। তাদের উভয়েরই পুত্র-প্রতিম পল্টুর প্রাণরক্ষার উদ্বেগে তারা দুই ভাই শেষ পর্যন্ত তার চিকিৎসার ব্যাপারে পরস্পরের মত ও সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। গভীর স্নেহমমতা যে কীভাবে অপেক্ষাকৃত অগভীর ব্যক্তিগত রুচি বৈষম্যকে সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দিতে পারে এবং মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে তারই চিত্রগ্রাহী রূপে গল্পটি অপরূপ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মানুষের মনের ওপর ব্যক্তি চরিত্রের যে বিশেষ হাত নেই, বনফুল অত্যন্ত মনস্তত্ত্ব-নিষ্ঠ শিল্পীর ন্যায় তার একটি সার্থক রূপ এই গল্পে দান করেছেন। প্রেম, প্রীতি ও স্নেহ-মমতার নিকট মানুষ যে কত দুর্বল এ গল্পে মানব চরিত্রের সেই অনুদ্ঘাটিত একটি সত্যকেই যেন বনফুল অপূর্ব দক্ষতায় অনাবৃত করেছেন। এই দুর্বলতার পথ ধরেই মানুষ তার আজন্মলালিত বিশ্বাসকে বর্জন করতে পারে, সমাজ, সংসার, আত্মীয়, স্বজন সবকিছুকেই সে অনায়াসে উপেক্ষা করে জীবন পথে এগিয়ে যেতে পারে। সুতরাং বনফুলের মানুষের মন গল্পে মানুষের মনের তেমনি একটি বিশেষ দুর্বলতার বলিষ্ঠ উদ্ভাষণ ঘটেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' অপর একটি মনস্তত্ত্বমূলক রচনা। রুগ্ন পুত্রের প্রতি শুভেচ্ছায়, সেবাময়ী মাতার ক্লেশ ভোগ, পিতার কৃচ্ছ্রতা সাধন এ-সবের সার্থকতা যে কী সে সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রশ্ন লেখক পাঠকের সম্মুখে এই গল্পের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন। যদি শাস্ত্রসম্মত পুন্নাম নামক নরক থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্যে পিতামাতার এই নিত্যনৈমিত্তিক যন্ত্রণা ভোগ অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে, তা হলে তার চেয়ে ভয়াবহ নরক বাসের অভিজ্ঞতা পিতামাতার সঞ্চিত হয় একটি অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর পুত্রের প্রতিপালনে। সেকারণেই গল্পের উপসংহারে বিষণ্ন পিতা স্বীয় রুগ্ন অসৎ পুত্রের আরোগ্য লাভে বিশেষ আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেন নি এবং অপরের ব্যাধিগ্রস্ত একটি সৎপুত্রের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলেও মানবমনের একটি বিশেষ অনুভূতির

রাজ্য থেকেই এর চকিত ও আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছে। 'ভগবান কেন প্রতিবেশীর সুন্দর ও মহৎ ছেলেটিকে কেড়ে নিয়ে তাদের অসুন্দর ও হীন ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখলেন?' এই প্রশ্নটি স্নেহপরায়ণ একজন পিতার মনে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়েছে এবং অপরের সেই সুন্দর শিশুটির মৃত্যুতে সে সাময়িক শোকও অনুভব করেছে, কিন্তু তবু নিজের মেজাজী পুত্রটির প্রতি তার যে পিতৃকর্তব্য, তার কোন হেরফের হয় নি। বিশ্বস্রষ্টার খেয়ালখুশীর মতই মানুষের মনেরও মতিগতির কোন স্থিরতা নেই। মানুষের মনে যে বিচিত্র অনুভূতির ও চিন্তাভাবনার গ্রন্থিগুলো রয়েছে এ গল্পে তারই একটির সার্থক মোচন হয়েছে। অপরের সুকুমার শিশুটির মৃত্যুতে এবং নিজের রুক্ষ-স্বভাব শিশুর আরোগ্য পিতার মনে যে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি নৈরাশ্য ও হতাশা দেখা দিয়েছে তা এক আশাময় ব্যঞ্জনায় রূপ লাভ করেছে, যখন শোক-স্তব্ধ নিশীথে সে আকাশের নক্ষত্ররাজির নীচে চির-সহিষ্ণু ধরণীর প্রতীক্ষাকে অনুভব করেছে এবং হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়েছে এই ভেবে যে, অনেক সন্তানের হীনতা ও অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও এই জননী-ধরণীর প্রত্যাশা ও শুভেচ্ছা অনন্তকাল ধরে চিরঅম্লান রয়েছে। এই সুন্দর ও ব্যঞ্জনাময় সমাপ্তিই গল্পটিকে একটি অবাস্তবতা ও নিদারুণ ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করেছে। অন্যথা, একজন পিতার পক্ষে অপরের সৎ পুত্রের মৃত্যুতে শোকের ব্যাপারটি বাস্তব হলেও স্বীয় পুত্রের আরোগ্য নৈরাশ্যবোধ এমন একটি অবাস্তব হেঁয়ালী ও কুহেলিকার সৃষ্টি করতো যার অপরিহার্য ফলশ্রুতি ব্যর্থতা থেকে গল্পটিকে রক্ষা করা যেত না। শক্তিশালী গল্পকার বলেই প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বীয় পরিকল্পনায় গল্পটিকে সমাপ্তির ব্যঞ্জনায় এমন ভাবে আবৃত করতে পেরেছেন যার স্পর্শে গল্পটি সার্থকতায় উন্নীত হয়েছে। এ-গল্পে স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি স্বামীর উদ্বেগকে একটি গভীর পারিবারিক মাধুর্য দান করেছে। পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ স্বাভাবিক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের আলোচ্য গল্পের পিতৃচরিত্রের সেই স্বাভাবিক স্নেহকে বাঁচিয়ে রেখেও একটি যুক্তিবাদী মনের প্রসারতা যেন সবকিছুকে অতিক্রম করেছে। আধুনিক কালের একটি যুক্তিবাদী মানুষের অনুভূতিপ্রবণ মনের সুরভি এগল্পের উপসংহারে পাঠকের মনকে স্থায়ী দ্যোতনায় ও গভীর বিস্ময়ে উদ্ভাসিত করে।

'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পে জীবনব্যাপী বঞ্চনা একটি নারী-হৃদয়ে প্রবল তিক্ততার সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রণাবোধ এই গল্পে অত্যন্ত ভয়াবহ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, মানব যন্ত্রণাকে কোন অতিরঞ্জিত আদর্শের অনুলেপনে তিনি কমনীয় করে তোলেন না, বরং জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে উদঘাটন করে তার তীক্ষ্ণ প্রকাশকে বিদ্যুৎ দাহনের মতই সত্য করে তুলে ধরে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে তিনি সিদ্ধহস্ত শিল্পী। তাঁর সমুদ্রের স্বাদ গল্পে তিনি সেই ক্ষমতার পরিচয় যথার্থভাবেই দিয়েছেন। শৈশবে নীলার সমুদ্র দেখার স্বাদ ছিল। সে প্রত্যাশা ক্ষুদে চাকুরীজীবী পিতার দারিদ্র্যের জন্য বারংবার ব্যর্থ হয়েছে, তথাপি কল্পনায় যেন সে বহুবার সমুদ্র দর্শন করেছে। ছাদ থেকে দেখা কলকাতার অসংখ্য বাড়ীর অসমতল ঢেউগুলো তাকে এক অদ্ভুত সমুদ্রের আস্বাদন এনে দিয়েছে। পরবর্তীকালে এক রুগ্ন দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহে তার অবচেতন মনের অসন্তুষ্টির প্রবল কান্নায় যখন তখন ভেঙ্গে পড়তে দেখা গিয়েছে। স্বভাবে নীলা আশৈশব কাঁদুনে, সুতরাং বিয়ের পরেও কান্নাই হোল তার সহযাত্রী, মানসিক দুঃখে কান্না, দৈহিক যন্ত্রণায় কান্না এমনকি সুখেও কান্না। এসব কান্না তার অন্তর্নিহিত অতৃপ্তির বিস্ফোরণ। আসলে সমুদ্র দেখার আনন্দ সে জীবনে লাভ করতে পারেনি—তাই সেই অতৃপ্তির নিরসন করেছে এই অক্ষমা নারী চোখের পানির আস্বাদ গ্রহণ করে—চোখের পানিতে সামুদ্রিক পানির লবণ আছে। তাই সে অহরহ কেঁদেছে এবং চোখের জলের লবণে সে তার বিচ্ছিন্ন পিতামাতা ভ্রাতার শোক, পুরী দর্শনের সাধ ইত্যাদি অনেক অসমাপ্ত বাসনার কাল্পনিক নিরসন করেছে এবং মানসিক শান্তিও অনুভব করেছে। কান্না তার শোকভারাক্রান্ত বঞ্চিত হৃদয়কেই শুধু প্রকাশিত করে নি, তাকে এক পরোক্ষ সান্ত্বনার আস্বাদও দান করেছে। সত্যি এ এক অপূর্ব আস্বাদন। অবজ্ঞাত ও বঞ্চিত মানুষের এই যে কান্না এর মধ্যে মানিক বন্দোপাধ্যায় বৃহত্তর সমুদ্রের স্বাদ সঞ্চারিত করে মানবজীবনের অশ্রুকে শাশ্বত শিল্পমূল্য দান করেছেন যেন। আমাদের ছোটগল্পে কত বিচিত্র অনুভূতির কথা, কত বিচিত্র জীবনধারা, কত বিভিন্ন চরিত্রের মিছিল আমরা পেয়েছি এ সব

গল্প যেন তারই দৃষ্টান্ত বহন করে। গল্পটির প্লট পরিকল্পনা অভিনব এবং সে দিক দিয়েই বাংলা সাহিত্যে এর একটি নিজস্ব মূল্য আছে।

'ফসিল' সুবোধ ঘোষের প্রখ্যাত রচনা। গল্পটির শিল্পকৌশল অনবদ্য শ্রেণী সংগ্রাম এবং তার অশ্রুসজল পরিণতি এই গল্পে নিখাদ বাস্তবতায় উপস্থাপিত হয়েছে। সাঁওতাল পরগণার একটি বিশেষ অঞ্চল কোলেয়ারী এই গল্পের কাহিনীতে পটভূমিকা হিসেবে বিরাজমান। আঞ্চলিক কাহিনী-কেন্দ্রিক গল্প হলেও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই গল্পে বিশেষ অঞ্চলের জীবন ও জীবিকাকে চিরন্তন শিল্পমূল্য দান করেছে। গল্পটির ফসিল নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ। আজকে যে সব হারিয়ে যাওয়া জীবের ফসিল আমাদের কৌতূহলী গবেষণার উপাদান বিগত দিনে তাদের অবলুপ্তির নিশ্চয়ই কোন ইতিহাস ছিল। নিশ্চয় কোন নিপীড়ন, নিশ্চয়ই কোন শ্রেণী সংগ্রাম তার ইতিবৃত্ত। বৈজ্ঞানিকের কাজ যেমন নিষ্ঠাভরে ফসিল অধ্যয়ন করে সেই হৃতসূত্র আবিষ্কার করা গল্পলেখকের কর্তব্য তেমনি অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে মানুষের সেই সব ফসিল যাদের বেমালুম কবরস্থ করা হয়েছিল অথবা একটি বৃহৎ অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তাদের সেই নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার কাহিনীকে সাহিত্যে মুক্তিদান করা। একজন সুদক্ষ মানবদরদী শিল্পীর ন্যায় সুবোধ ঘোষ সেই দায়িত্বই তাঁর ফসিল গল্পে পালন করেছেন। এক বৃহৎ নিষ্পেষিত শ্রেণীর অবলোপের ইতিহাসটি লেখক সার্থকতার সঙ্গে অননুকরণীয় ভাষায় এবং অতুলনীয় আঙ্গিকে আলোচ্য গল্পে উদ্ধার করেছেন। এদিক থেকে গল্পটি সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মূল্যে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

'মুজতবা আলীর' পাদটিকা একটি অপূর্ব কাহিনী। যে কাহিনী লোকচক্ষুর নেপথ্যে থেকে যায় অথচ চির অশ্রুময় বঞ্চনার ক্ষোভে জ্বালাময়ী সেই সব ইতিবৃত্ত আমাদের জীবনেরই ইতিহাস। স্কুলের হেডপণ্ডিতকে নিয়ে রচনা, যার আচরণের অগ্রগতিমূলকতা এবং অত্যধিক বৈয়াকরণ কঠোরতা ছাত্রদের কাছে আতঙ্ক এবং রসিকতার উপাদান হলেও, তাঁর অন্তরঙ্গ শুভেচ্ছার জন্যে তিনি ছাত্রদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার পাত্র। স্কুল পরিদর্শকের আবির্ভাবে দীর্ঘদিনের অনাবৃত বপু পণ্ডিত অগত্যা একটি সদ্য ক্রীত গেন্জি পরিধান করে এলেন এবং এ বস্ত্র ঊর্ধাঙ্গে ধারণ করার

মত আয়াসসাধ্য ব্যাপার তাঁর জীবনে এই প্রথম ঘটেছে। যে ব্যক্তি গায়ে কোন আবরণে অভ্যস্ত নয় তার পক্ষে কাজটি কঠিন—বরঞ্চ পাদটীকা গল্পে একটি অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে লেখক এ-কাজটিকে কঠিনতম করে তুলেছেন। পণ্ডিত মশায়কে এই কঠিনতম অনুশীলনে ব্রতী হতে হয়েছে অবশ্যি তাঁর জীবিকার একমাত্র অবলম্বন চাকুরীটি রক্ষার খাতিরে। ব্যাপারটি রঙ্গরসে ও কৌতুকহাস্যে উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু গল্পের প্রথমাবধি সূচিত কৌতুকরসের অন্তরালে সমাজজীবনের যে কি এক গভীর হাহাকার লুকিয়ে আছে তার পরিচয় এই পণ্ডিত মশাইয়েরই সহজ অঙ্কের হিসেবের মাধ্যমে ছাত্রদের নিকট, তথা পাঠকের নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। গল্পের উপসংহারে সেই বঞ্চনা-জনিত বেদনার প্রকাশ, যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মূলে বৃটিশ আমলে যেমন, বর্তমান কালেও প্রায় তেমনি সাংঘাতিক ও মর্মান্তিক ভাবে ক্রিয়াশীল। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এদেশের অসংখ্য স্কুল শিক্ষকের ন্যায় এই পণ্ডিত মশাইও বেতন পেতেন মাত্র মাসিক পঁচিশ টাকা। অথচ স্কুল পরিদর্শক সাহেবের এক পা খোঁড়া কুকুরের তিনটি পায়ের জন্য মাসিক খরচ পঁচাত্তর টাকা—অর্থাৎ সেদিনের সেই সাহেবের কুকুরের প্রতি পায়ের জন্য যা ব্যয় হোত, পণ্ডিত মশায়ের সারা মাসের বেতন তার সমান। আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে একজন স্কুল শিক্ষকের মূল্য যে স্কুল পরিদর্শকের কুকুরের একটি পায়ের মূল্যের সমান এই নিদারুণ মর্মঘাতী অথচ বাস্তব তথ্যকে উন্মোচন করার জন্যই যেন গল্পের সামগ্রিক আয়োজন। একজন প্রবীণ শিক্ষক সারা জীবনের সাধনায় দেশকে সেবা করে চলেছেন—কিন্তু বিনিময়ে সমাজ তাকে যা দিয়েছে তার মূল্য সেই সমাজেরই আরেক ব্যক্তির একটি কুকুরের এক পায়ের পরিচর্যায় ব্যয়িত অর্থের সমান—সমাজের আর্থিক বৈষম্যের সেই নগ্ন তথ্যপটকেই যেন গল্পের উপসংহারে উন্মোচন করা হয়েছে। গল্পের উপসংহারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সরকারের তথা সমাজের উদ্বেগহীন উদাসীনতাকেই লেখক সযত্ন শিল্প প্রয়াসে অনাবৃত করেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নিদারুণ অর্থনৈতিক অসঙ্গতি এই গল্পের পাদটীকা, অন্যপক্ষে কুকুরের পায়ের পরিচর্যায় ব্যয়িত অর্থের একটি তুলনামূলক বিচার ও সেই বিচারের

অন্তরালে নীরব বিক্ষোভ এই গল্পে বিগুমান বলে গল্পের পাদটীকা নামটি অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। গল্পটি মুজতবা আলীর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রচনা। সাধারণতঃ কৌতুক ও বিদ্রূপাত্মক রচনায় তিনি অভ্যস্ত। আলোচ্য গল্পে তার সেই দক্ষতা সম্পূর্ণ বিগুমান। এ-গল্পের প্রধান আকর্ষণ এখানে যে, গল্পটির শুরু হয়েছিল লেখকের স্বভাব-সুলভ কৌতুকাবহ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থাৎ প্রথম থেকে পাঠকের মনে এই ধারণাই যেন বদ্ধমূল হতে উৎসাহ পেয়েছিল যে, গল্পটির সূচনা যেমন লঘুহাস্যে, পরিণতি-পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত গল্পটির কাঠামো যেমন তরল রসে সিঞ্চিত, গল্পটির সমাপ্তিও হয়তো তেমনি একটি হাস্য-চপল ভঙ্গীর মাধ্যমে রূপলাভ করবে। কিন্তু মুজতবা আলী এমন একটি অসাধারণ কৌশলে পাদটীকার ন্যায় এ-গল্পের ছেদ টেনেছেন যা পড়লে সবিস্ময়ে মনে হয় লেখক যেন এই হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়ে একটি মহান অথচ বেদনাঘন সত্যকেই নগ্ন করে তুলে ধরবার জন্য সমগ্র আয়োজন করেছেন। সেকারণেই বোধ করি পণ্ডিত মশায়ের ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে এই শিক্ষকের বেদনার উত্তাপ উপলব্ধি করে নিতে পারে এবং গল্পের তীব্র কশাঘাতও হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতা-উত্তর কালের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরেও শিক্ষাব্যবস্থায় যে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটেছে একথা বলতে পারি না। হয়তো একজন স্কুল পরিদর্শকের পক্ষে এখন আর একটি কুকুরের জন্য অমন অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য অর্জন করা সম্ভব নয়, কিন্তু শিক্ষাবিভাগে এমন উচ্চতর প্রশাসনিক কর্মচারী এখনো আছেন, হোন তারা সংখ্যায় অল্প, যাঁদের পরিবারে অনুরূপ অর্থস্ফীতির নিদর্শন আমাদের অজানা নয়। আর লাট সাহেবের কথা নাই বা বললাম—তিনি এ-কালে এ-দেশে একজন ক্ষুদে সম্রাট—বিশেষ করে একনায়কত্বের রাজত্বের আয়ুকালে। সে-কারণেই ব্রিটিশ আমলের সামাজিক পটভূমিকায় লিখিত হলেও, মুজতবা আলীর পাদটীকা গল্পের আবেদন আমাদের সমাজে আজো অক্ষুণ্ন। ব্যঙ্গ কৌতুকে, আবেগে, বিদ্রূপে ও শাণিত কশাঘাতে গল্পটি বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' একটি শক্তিশালী রচনা। এই গল্পে একটি মুসলিম সংগীত-সাধকের জীবন-সাধনা রূপায়িত হয়েছে। হিন্দু জমিদার গৃহে এ-সাধকের পরিচর্যা। গৃহকর্তার এই উস্তাদের প্রতি ঐতিহ্যগত শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁর বুনিয়াদী সুরজালের অনাধুনিকতায় তার বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ ফলিত হয়ে উঠছিল। এই বিতৃষ্ণার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছিল নবীন বাদক, আধুনিক গানের মিশ্র সুর-সম্পাতে সে হরণ করেছিল গৃহকর্তা শঙ্করের মন। এখানে নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্বে উজ্জ্বলতায় ও মুখরতায় নবীনের অগ্রগামিতা এবং প্রবীণের নীরব পশ্চাদপসরণ যেমন পরিস্ফুট তেমনি প্রমূর্ত। অন্যদিকে প্রবীণের প্রতি নবীনের চিরকালীন অন্তরঙ্গ আকর্ষণও এ-গল্পের শরীরে বিদ্যমান। তাই জমিদার-পত্নী রত্নার উস্তাদ মেহেরা খাঁর সুরজালের প্রতি গোপন নিষ্ঠা যেন এক রমণীয় গীতিকার আস্বাদন এনেছে। অতঃপর এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায়। হিন্দু মুসলমানের এক ধর্মভিত্তিক রক্তপাতে শঙ্করের মনে মুসলমান ওস্তাদজীর সততার প্রতি জেগেছে সন্দেহ। এতদিন ধরে তার গৃহে যে উস্তাদ ধর্মের বহিরাবরণকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন শিল্পীর উদাসীনতা ও নির্মল স্বার্থহীনতায় জীবনের অন্তিমপর্বে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে এবং বিতাড়িত করা হয়েছে তাঁর অনেক স্বপ্নের সাধন-পীঠ শঙ্করের গৃহকোণ থেকে। এই নিষ্ঠুর আঘাত বুকে নিয়ে বৃদ্ধ উস্তাদ বেরিয়ে গেছেন কলকাতার রক্ত-কলঙ্কিত পথে অথচ আত্মরক্ষার কথা তাঁর চিন্তায় আসেনি, বরং সত্যিকার সুরশিল্পী হিসেবে তাঁর মনে তখন জেগে উঠেছে শিষ্যা রত্নার অসমাপ্ত সঙ্গীত শিক্ষার আকস্মিক অবসানের জন্য এক গভীর উদ্বেগ। তাই তিনি পুনরায় শঙ্করের গৃহে ফিরে আসতে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন—তাঁর সেই ফেলে যাওয়া সাধন-পীঠে। কিন্তু আর সেখানে তাঁকে ফিরতে দেয়নি কলকাতার জিঘাংসা কলঙ্কিত প্রহর। পথিমধ্যে নিহত এ-শিল্পীর দৃষ্টান্তে লেখক রূপায়িত করেছেন শিল্প-জীবনের বঞ্চনা, অবক্ষয়, অতৃপ্তি এবং অবমাননার একটি বাস্তব চিত্র। শিল্প জীবনের মহৎ ঔদার্যের ও অকুণ্ঠ নিষ্ঠার পাশে আমরা এই গল্পে চিত্রিত হতে দেখি যুগের উৎকর্ষ কৃত্রিমতা-বিলাস, ধনিকের অহমিকা

এবং ধর্মের স্থূল অমানুষিক উন্নাসিকতা। ধর্মের ও সম্প্রদায়ের ওষ্ঠে মানুষের চির অমলিন পরিচয় এ-গল্পে রক্তাক্ত হয়েছে বলে কাহিনীটি মর্মস্পর্শী। গল্পটির কারুণ্য তীব্রতর হয়েছে এই কারণে যে, যিনি এই জিঘাংসার শিকার তিনি একজন মহান শিল্পী, তিনি একজন আশৈশব নীরব সাধনায় উদ্দীপিত বৃদ্ধ। সাম্প্রদায়িকতার একটি কুৎসিৎ ও পৈশাচিক রূপ এই গল্পে যেন বাস্তব ও প্রামাণিক দৃশ্যপট উন্মোচন করেছে। গল্পটি আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

"রস" নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এবং বাংলা সাহিত্যেরও একটি অনন্যসাধারণ গল্প। বাংলার গ্রামজীবন, বিশেষতঃ মুসলিম জীবনের চিরন্তন ট্রাজেডির বেদনা এখানে অনিবার্যভাবে উপস্থিত। মুসলিম সম্প্রদায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ধর্ম অনুমোদিত। কিন্তু সাময়িক মনোমালিন্যে বিচ্ছিন্নদম্পতির গভীর প্রেম প্রায়শঃই যে মর্মস্পর্শী অসহায়তার স্বৃষ্টি করে এবং তা যে মুসলিম জীবনে একটি অনুল্লেখিত বেদনার দীর্ঘশ্বাস রূপে অনেক সময় বিরাজমান থাকে, বর্তমান গল্পে তারই একটি সুন্দর চিত্র ধরা পড়েছে। গল্পের নায়ক মোতালেফ সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির জন্যে স্ত্রী মাজু খাতুনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল একত্র অবস্থানের জন্যে উভয়ের মধ্যে লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে যে অনিবার্য একটি হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তারই এক অনুভূতি সে উপলব্ধি করেছিল মাজু খাতুনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার পরে যখন সে পরবর্তী বিবাহিত স্ত্রীর মধ্যে ঠিক মাজু খাতুনকে আর খুঁজে পায় নি এবং মাজু খাতুনের গুড় তৈরীর পারদর্শিতাও তার কাজে প্রকাশিত হয়নি। বলা যেতে পারে, মোতালেফের বেদনাকে গভীরতর ও ত্বরান্বিত করেছে তার পরবর্তী স্ত্রীর পেশাগত অসাফল্য, অর্থাৎ গুড় তৈরীর সেই নিখুঁত ক্ষমতার অনুপস্থিতি যা মাজু খাতুন আয়ত্ত করেছিল। তার প্রথমা স্ত্রী মাজু খাতুন যেভাবে খেজুর রস জ্বাল দিয়ে সুগন্ধিযুক্ত গুড় তৈরী করতে জানত, নতুন স্ত্রী ফুলবানুর তা অনায়ত্ত ছিল। ফুলবানুর রূপের জৌলুসে সাময়িকভাবে মোতালেফ মুগ্ধ হয়েছে—কিন্তু জীবিকার প্রশ্নে যে জর্জরিত তার তো শুধু রূপজ মোহে আবিষ্ট হলে চলে না—এই মোহ প্রেমে রূপান্তরিত হতে হলে গরীবের ঘরের গৃহিণীকে স্বামীর জীবিকারও একজন

দোসর হতে হয়। এদিক থেকে ফুলবানু তুলনামূলকভাবে মোতালেফের জীবনে মাজু খাতুনের চেয়ে অসার্থক। সুতরাং মাজু খাতুনের মত ফুলবানুর সঙ্গে তার মনের রজ্জু দৃঢ় বাঁধনে সংযুক্ত হতে পারেনি। চপলা ফুলবানুর প্রতি তার অসন্তোষ দিনে দিনে বর্ধিত করেছে তার ব্যবসায়িক অসাফল্য, বাজারে তার গুড় সমাদর লাভ করেনি। সুতরাং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা এবং বিগত সফলতার বৈপরীত্য মাজু খাতুনের প্রতি মোতালেফের প্রচ্ছন্ন প্রেমকে পুনরায় উম্মোচিত করেছে। কিন্তু তখন বিলম্ব হয়ে গেছে প্রচুর, আর ঘটনার স্রোতও অন্য বাঁকে মোড় নিয়েছে। মাজু খাতুন তখন অন্যের পত্নী। তবুও দূর গাঁয়ের মোতালেফ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এবং হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন আকর্ষণে চলে গেছে মাজু খাতুনের দ্বিতীয় স্বামীর বাড়ীতে—চোখে মুখে তার আবেদন, মাজু খাতুন যেন একটিবার অন্তত জানিয়ে দেয় তার সেই বিরল-নিপুণ গুড় জ্বালানোর পদ্ধতি। যেটুকু রস সে সঙ্গে এনেছে তা মাজু খাতুনকে উপহার দেবার জন্যে নয়, সেটুকু বুদ্ধি তার আছে, সে চায় এই রসটুকু থেকে মাজু খাতুনের নিজের হাতে জ্বাল দেয়া কিছু গুড়। অবশ্যি মাজু খাতুনের প্রত্যাখ্যান মোতালেফের সব আশা-ভরসাকে বিধ্বস্ত করেছে, কিন্তু বেড়ার ফাঁকে মুহূর্তে দেখা মাজু খাতুনের চোখে যে সজল ভাবালুতা ও মুখে যে অসহায় যন্ত্রণাবোধ মোতালেফ লক্ষ্য করেছে, তাই হয়ে রইল তার জীবনে একটি মহানতম অবলম্বনের প্রেরণা। গল্পের পরিণামে চরম যন্ত্রণাবোধের মধ্যেও মোতালেফের জন্য একটু স্নিগ্ধতা যেন লেখক সঞ্চারিত করেছেন—এ স্নিগ্ধতা মনকে আশায় উদ্দীপিত করেনা, বরং অনাস্বাদিত অতৃপ্তির ব্যঞ্জনায় মূহ্যমান করে তোলে।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে গল্পটিকে নিম্নবিত্ত সমাজের পেশানির্ভর প্রেমের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন মেহনতী মানুষের প্রেম এবং রূপতৃষ্ণা নিয়ন্ত্রিত করে তাদের জীবনের বিশেষ ধরনের জীবিকা। তাঁর মতে মেহনতী মানুষের জীবনে পেশানিরপেক্ষ প্রেম অসম্ভব। অবশ্যি এই বিশ্লেষণের বিশেষ মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না—তবে মনে হয় গল্পটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টির আলোকে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে চেষ্টা

করেছেন, এতে গল্পের প্লট ও চরিত্রগুলোর সামগ্রিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। গল্প সম্পর্কে আমাদের অপর বক্তব্য আছে। সে হচ্ছে এই যে, প্রেম মানুষের জীবনে কোন কারণে একদা আসে, সাময়িক রূপমুগ্ধতা হয়তো সে প্রেমকে আপাততঃ ম্লান করতে পারে, কিন্তু পরিণামে মানুষের জীবনে সে মৃত্যুঞ্জয় হয়েই বিরাজ করে। তাই মোতালেফের মাজু খাতুনের প্রতি গভীর আসক্তি, ফুলবানুর প্রতি সাময়িক রূপমুগ্ধতার ওপর পরিণামে জয়ী হয়েছে। অবশ্যি তার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন প্রেমকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে বিশেষ পেশার সফলতা অথবা বিফলতা, কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণই চূড়ান্ত নয়। হৃদয়ের অবচেতনায় লুক্কায়িত প্রাক্তন প্রেমেরও সেখানে কিছুটা ভূমিকা আছে।

গল্পটির নাম রস। যে রস শুধু মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর জীবিকার অবলম্বন হয়—যে রস জীবন-রস। যার অভাবে জীবন নীরস মরুভূমির উষ্ণশ্বাসে ম্লান হয়ে উঠতে পারে। এ-রস যখন ঘনীভূত হয়ে সুগন্ধিযুক্ত গুড়ের আস্বাদন আনে তখনই অর্থাৎ প্রেমের সেই প্রৌঢ়তাই জীবনের অনির্বাণ সাফল্য। আর সেই রসই যখন তরলাকারে বিগলিত হয় তখন তা ভোক্তার উন্মাদনার পানীয় হলেও তাতে প্রশান্তি থাকে না। তাই তরল রসের মত ফুলবানু সাময়িকভাবে মোতালেফের চিত্তহরণ করলেও, সুগন্ধিযুক্ত গুড়ের মত মাজু খাতুন তার চিত্তের অবচেতনলোকে অধিষ্ঠাত্রী। এখানে রসের বেসাত করে যে মোতালেফ, সে যেন মানবজীবনের চিরন্তন প্রেমতৃষ্ণার প্রতীক। অবশ্যি এখানে এই প্রতীক পেশাগত বাস্তবতাকে অনুসরণ করার জন্যে বাস্তব বেদনা নিয়ে উপস্থিত। আর মোতালেফের পরবর্তী বিবাহজনিত যে অতৃপ্তি তা পাঠকের বাস্তব সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়েছে এই কারণে যে, তা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক জীবনকে যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে। গল্পটি স্বাদে এবং গভীরতায় চেকভের 'দি লেডি উইথ দা ডগ' গল্পের করুণ অথচ অসহায় পারস্পরিক আকর্ষণের স্মৃতিকে উন্মোচিত করেছে যেন। সব দিক বিবেচনায় গল্পটি সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের জগতে অতুলনীয় সম্পদ।

শওকত ওসমানের 'নতুন জন্ম' একটি বিচিত্র রসে সমৃদ্ধ ছোটগল্প। এ-গল্পে ধ্বংসময়ী গোমতীর বুকে নাবিকের জীবনস্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে।

নদীর করাল নেত্রকে গল্পের নায়ক ভয় করে না, যদিও সে জানে এ-নদী তার পূর্বপুরুষের মত তার জন্যেও একদিন মৃত্যুর তুহিন শয্যা রচনা করবে। তাই গল্পের নায়ক ফারাজ আলী আকস্মিক প্লাবনে গৃহহারা হলেও নির্ভীক চিত্তে পুত্র আব্বাসকে নিয়ে ভেসে চলে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। বাঁধের উঁচু ভূমির নিরাপত্তায় যখন তারা অবতরণ করে তখন সন্তানের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নতুন স্বপ্ন। শহরে তারা ঘর বাঁধবে, গোমতীর এই সর্বনাশা তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে জীবনের ও জীবিকার নতুন আনন্দে তারা উৎসুক হয়ে উঠবে। এতদিন সন্তান আব্বাসের এই পরিকল্পনা অসমর্থিত হয়েছে তারই পিতার অপরাজেয় মনোভঙ্গীর নিকট। তার পিতা ফারাজ আলী জানে যে, পূর্বপুরুষের পেশা পরিত্যাগ করে শহরে বাস করা প্রকৃতপক্ষে জীবনে পরাজয়েরই নামান্তর। এই পলায়নপরতা তার কাছে ভীরুতার অবলম্বন বলেই মনে হয়েছে। তাই তার সংগ্রামী চেতনা পূর্বে শুধু আহত হয়েছে পুত্রের উচ্চাভিলাসী প্রস্তাবে। কিন্তু করাল নিয়তির মত একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায় তার সেই মনোভঙ্গীর পরিবর্তন এসেছে—সে পুত্রের প্রস্তাবে স্বীকৃতি জানিয়েছে, যদিও মনে মনে চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছাড়বার প্রচ্ছন্ন বেদনাকে সে অস্বীকার করতে পারে নি। এমনি করেই নতুন পেশা ও স্থানের আশ্রয়ে তার নতুন জন্ম হয়েছে। এ-জন্মকে অবশ্যই ত্বরান্বিত করেছে বন্যা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সর্বহারা ও মানসিক যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত পিতার বুকে নিরাপত্তার বাণী এনেছে তারই রক্তজাত স্নেহের পুত্র। এই নতুন জন্মে পিতা হয়ে গেল পুত্র—নির্ভরতায় এবং জীবন-স্মৃতিতে, আর পুত্র রূপান্তরিত হোল পিতায়—আশ্বাসে এবং জীবন স্বপ্নে। তাই বিবস্ত্র পিতার নগ্নতার জন্যে পুত্র লজ্জা অনুভব করে না, কারণ শক্তিমান পুত্রের পিতৃত্বের ছায়াতরু-তলে এখন পিতা পরিবর্তিত হয়েছে শিশুতে। গল্পটি পরিকল্পনার অভিনবত্বে সত্যই মৌলিক। হেমিংওয়ের “ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দি সি’ গল্পের মতই জীবন সংগ্রামের তীব্রতায় শওকত ওসমানের ‘নতুন জন্ম’ গল্পটি অনন্য। তবে এ গল্পে হেমিংওয়ের উক্ত বিখ্যাত গল্পটির ন্যায় নিয়তি-চক্রান্তে বিধ্বস্ত মানুষের অপরাজের মহিমা “নতুন জন্মে” নেই, বরং রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে অন্যতম জীবিকার প্রতি পরাজয়ের

গ্লানিমলিন মানুষের আশ্রয়-সন্ধান। গল্পটির আবেদন অন্যত্র—উপযুক্ত পুত্রের স্বপ্নকে যথাসময়ে যথাযথরূপে গুরুত্বদান করা প্রকৃত পিতার যে কর্তব্য এই সত্যকেই যেন এ-গল্প উদ্ঘাটন করেছে। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নিয়ে রচিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' গল্পের সঙ্গে এ গল্পের তুলনা চলতে পারে, তবে গল্প দুটো সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন চরিত্রের। শুধু একটি সাদৃশ্য এই যে, দুটো গল্পেই পিতা ও পুত্র বিদ্যমান। 'পুন্নাম' গল্পে পুত্র শিশু এবং পিতা সেই রুক্ষ মেজাজের শিশুকে প্রতিপালন করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন। আর 'নতুন জন্ম' গল্পে পুত্র বয়স্ক এবং পরবর্তীকালে পিতাই শিশুর ভূমিকায় পুত্রের সতর্ক স্নেহদৃষ্টির ছায়ায় বিরাজমান। তাই 'পুন্নাম' গল্পে পুত্র পালনের ব্যর্থতা জনিত বিষণ্ণতা পিতার উপলব্ধি এবং "নতুন জন্ম"-এ পুত্র পালনের সার্থকতার আনন্দ পিতার সঞ্চয়।

বিমল মিত্রের 'মিলনান্ত' বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় বিরল-সার্থক গল্প আছে তাদের অন্যতম। গল্পটির খণ্ডিত প্রারম্ভ এবং অসম্পূর্ণ সমাপ্তি তাৎপর্যময়। গল্পের সূচনায় গল্পকথক থিয়েটারের কর্মীবৃন্দ কর্তৃক অভিনয় করবার জন্যে অনুরুদ্ধ হলে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেই তাদেরকে বিদায় দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যাভাষণের জন্য তাঁকে অনুতপ্ত করেছে তাঁর স্মৃতিপথের ফ্লাসব্যাকে আবির্ভূত তাঁরই জীবনের একটি মঞ্চহীন বাস্তব দৃশ্য-কাব্যের প্রস্তুতিহীন অভিনয়ে পীড়াদায়ক কাহিনী, যার নাম দেওয়া হয়েছে মিলনান্ত—মিলনের নামে প্রগাঢ় বঞ্চনার বেদনায় যে কাহিনী অশ্রু-সজল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বহুদিন ধরে যে ছেলেটির জন্যে প্রতীক্ষা করেছেন, যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে, চাকরী দিয়ে, বিদেশে পাঠিয়েছেন,—প্রত্যাশা এই যে, ফিরে এলে তাকে তিনি কন্যা-জামাতা রূপে বরণ করবেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁর সেই প্রতীক্ষা প্রকৃত-পক্ষে নিদারুণ প্রতারণায় মসীলিপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী বা আত্মীয়-স্বজন কেউ তাঁকে জানায়নি যে, সে ছেলে বিদেশে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। গল্পের নিদারুণ নৈরাশ্য ও বঞ্চনার জ্বালাকে সমাপ্তিতে অন্যতর এক প্রতারণা দিয়ে সহনীয় করবার প্রয়াস রয়েছে, সে হচ্ছে অন্ধ বৃদ্ধের সম্মুখে কন্যার কল্পিত বিবাহের সমাচার-নিবেদন। ঢাক-ঢোল সানাইয়ে বহু প্রতীক্ষিত এ বিবাহের অভিন্ন স্বর্গীয় প্রশা-

স্তিতে ভরিয়ে তুলেছে বৃদ্ধের মন, যার দীর্ঘ চাকরী এবং অবসরপ্রাপ্ত জীবন মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছিল একটি কবোষ্ণ স্বপ্নে—সে হচ্ছে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণের অনাবিল সন্তুষ্টি। এই অদ্ভুত মিলনান্ত উপসংহারের বঞ্চনা অনুভব করেছে তারই হতভাগিনী কন্যার নীরব হৃদয়, আর মৌন দীর্ঘশ্বাসে এই ঘটনার শেষ অভিনয় করতে হয়েছে গল্পকথককে। গল্পটিতে বাঙ্গালী কেরানী জীবনের বেদনার্ত ইতিহাস, মধ্যবিত্ত কেরানী কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতার অসহায়তা, কন্যাকে ঘিরে তার শুভেচ্ছার অন্তরঙ্গ প্রস্তুতি, এবং বঞ্চিত মানব-জীবনে একটি শুভদিনের জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষার গুরুত্ব, এই সব আনন্দ বেদনার করুণ আলেখ্য, যা আমাদের সমাজের চার-পাশে ছড়িয়ে রয়েছে, একটি প্রামাণিক চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। গল্পটিকে বিস্ময়কর সাফল্য দান করেছে এ-গল্পে উপস্থাপিত বিষয়ের অভিনবত্ব এবং বিষয়ীর বাকবিন্যাস শক্তি যা সংহত আবেগে, সীমিত ভাষণে এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায় সুসমৃদ্ধ।

'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' আবু রুশদের একটি প্রখ্যাত ছোটগল্প। গল্পটিতে অভিজাত এক দম্পতির বাহ্যিক প্রাচুর্যসর্বস্ব দাম্পত্যজীবনের শূন্যতার বেদনা উচ্চারিত হয়েছে। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল পরস্পরকে ভালোবেসেই। সংসারজীবনে দিনে দিনে তারা অনেক কিছুই পেয়েছে —শাড়ী, বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি। কিন্তু শাড়ী, বাড়ী, গাড়ীর ঔজ্জ্বল্যে তারা তাদের মনের রিক্ততা আবৃত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তাইত পুরুষটি বন্ধু-জায়ার রূপে লাবণ্যে মুহূর্তে আবিষ্ট হয়েছে, আর মেয়েটি স্বামীর এই অন্যথা আচরণে অসহায় ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। এ-গল্পের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে তখন, যখন দাম্পত্য-জীবনের তীব্র বঞ্চনা দেখা যাওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতিবাদ করবার উপায় নেই, বরং সুখী জীবনের অভিনয় করে যেতে হবে এবং খাওয়ার টেবিল যখন প্রস্তুত তখন সময় নষ্ট না করে মেকী আতিথেয়তায় কৃত্রিম পরি-তৃপ্তির হাসি হাসতে হবে—বঞ্চনার এই নীরব আত্মদহনের জন্যে কাহিনীটি পরিণামে অসামান্যতা লাভ করেছে। এ-গল্পে পাশাপাশি দুই বন্ধুর দাম্পত্য জীবনকে দাঁড় করানো হয়েছে—একজন দারিদ্র্যের মধ্যেও সবকিছু উপেক্ষা করে সহজ সরল জীবনাচরণের মাধ্যমে সুখ ও শান্তির স্পর্শে

প্রশান্ত, আরেকজন প্রাচুর্যের গর্বে স্ফীত ও বাহ্যিক জৌলুসে উজ্জ্বল জীবনাচরণের অন্তরালে বঞ্চনার আস্বাদনে যন্ত্রণাগ্রস্ত। জীবনে সত্যিকার শান্তি যে নির্ভর করে মানুষের মানসিক প্রশান্তিতে, আলোচ্য গল্পে তারই একটি সুন্দর চিত্র রূপায়িত হয়েছে। গল্পটিতে জীবনযুদ্ধে জয়ী মুনিমের দাম্পত্যক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যর্থতাবোধ আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'ফেল' গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছোটগল্প সাহিত্যে এই গল্পের মূল্য অনবদ্য।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর 'দুই তীর' দাম্পত্যজীবনের বঞ্চনা ও বেদনাবোধের আরেকটি করুণ কাহিনী। তবে এখানে ব্যঞ্জনার জন্যে মূলতঃ দায়ী বধূ এবং শ্বাশুড়ি। অভিজাত পরিবারের আদুরে কন্যা কীভাবে তার স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে এবং এই নিষ্ঠুরতাকে কী ভাবে শাণিত করে তুলেছে তার হৃদয়হীন জননী, তারই মর্মস্পর্শী কাহিনীতে 'দুই তীর' গল্পটি প্রোজ্জ্বল। নায়কের উদাসীন সহিষ্ণুতা গল্পটিকে অভিনব মহিমা দান করেছে। নায়কের প্রত্যাশা এক নিদারুণ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে গল্পের উপসংহারে, যখন সে ভেবেছে তার পরিণীতা হাছিনা শেষ মুহূর্তে ট্রেন থেকে হয়তো নেমেই আসবে আর থাকবে তার কাছে। কিন্তু সেই প্রত্যাশাঘন মুহূর্তে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, পিতৃগৃহ গমনোদ্যত হাছিনা ফিরে আসবার কোন উদ্যোগই করেনি। সব স্বপ্নের ভয়াল সমাধি রচনা করে এই যে উপসংহার তা যেমন করুণ তেমনই শূন্যতাময়। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' গল্পের সমস্যা অনেকটা অনুরূপ, সেখানেও দাম্পত্য-জীবন পরিণামে নিদারুণ বিচ্ছেদে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানে বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করেছে দেবরের আবির্ভাব, আর দুই তীর গল্পে ধনীকন্যার আশৈশব অর্জিত এবং মাতৃ-উৎসাহিত উৎকট আভিজাত্য-অহঙ্কার। এ-গল্পের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাতপাকে বাঁধা উপন্যাসটির কাহিনীগত সাদৃশ্য কিছুটা আছে। গল্পটিতে দাম্পত্যজীবনে দুই তীরবাসী দম্পতির বঞ্চনার কথা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে। নামকরণের দিক থেকে গল্পটির সাদৃশ্য আছে মযহারুল ইসলামের 'এপার ওপার' গল্পের সঙ্গে। তবে দুই তীরের সমস্যা ও বঞ্চনা প্রেমঘটিত, আর 'এপার ওপারে' তা বাৎসল্যজনিত। দুই তীরে দাম্পত্য-

জীবনের বঞ্চনা মারাত্মক শূন্যতার যন্ত্রণায় জ্বালাময়, আর 'এপার ওপার' বঞ্চিত বাৎসল্য ক্ষমার প্রশান্তিতে স্নিগ্ধ এবং কমনীয়। আসলে দুটো গল্পেই আমাদের সামাজিক সমস্যার দুটো দিক উন্মোচিত হয়েছে। আঙ্গিক গঠনের দিক থেকে দুই তীর গল্পটি শিল্প-প্রকরণে এক সংহত রূপ লাভ করেছে বলেই ছোট গল্প হিসেবে সার্থক এবং আমাদের সাহিত্যে এ-গল্পের বিশিষ্ট স্থান অনস্বীকার্য।

শাহেদ আলীর 'জিব্রাইলের ডানা' একটি কৈশোর-স্বপ্নের কাহিনী। সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যকে একটি কিশোরের দৃষ্টি দিয়ে এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে। গল্পটির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে শরৎচন্দ্রের 'অভাগার স্বর্গ' গল্পের। তবে 'অভাগার স্বর্গে'র বাংগালী সামাজিক বৈষম্যের নিষ্পেষণে চরম নৈরাশ্যে উপনীত হয়েছে, আর এ গল্পের নায়ক নবী পরম আশাবাদিতায় উন্মুখ স্বপ্ন দেখেছে। তাইত তার বিশ্বাসী মন খোদার দরবারে পৌঁছে দিতে চেয়েছে তার অভিযোগ। ঘুড়ির সূতো ক্রয় করার জন্যে সে ষ্টেশনে কুলিগিরি করেছে এবং শ্রমলব্ধ অর্থে ক্রীত দীর্ঘ সূতোর সাহায্যে সে আকাশে তুলেছে তার ঘুড়ি। একদিন যখন চিলের চরণাঘাতে এই ঘুড়ির সূতো ছিন্ন হয়েছে তখন সে স্বপ্ন দেখেছে যে, ওই চিল, যার পায়ে আবদ্ধ হয়েছে ঘুড়র সূতো, সে উর্ধ্বগামী হয়ে উড়ে চলেছে খোদার দরবারে সে আর কেউ নয়—স্বয়ং জিব্রাইল, যিনি খোদার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদ বহন করে নিয়ে যান। সে বিশ্বাস করে, এখন নিশ্চয়ই খোদার আসন টলে উঠবে তাদের ন্যায় মানুষদের ব্যথাবিক্ষুব্ধ বেদনায়। সে আরো স্বপ্ন দেখেছে, এবার খোদার কৃপায় নিশ্চয় তাদের দারিদ্র্য দূর হবে। আরেকটি বাস্তব স্বপ্নের শেষে গল্পটির তাৎপর্যময় উপসংহার। সে হোল এই যে, জিব্রাইলের ডানায় আগুন লেগেছে, সূর্যের আগুন। সেই আগুনের তাপে নবীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। হয়তো গল্পের শেষে লেখক বলতে চাইলেন, অভাব অনটনক্লিষ্ট বাস্তব জীবনের যে আগুন তাদের অহরহ দগ্ধ করেছে, তার উত্তাপে স্বপ্নবিলাসী কিশোরের দুচোখ ঝলসে গিয়েছে—কবির ভাষায়ঃ

ভেঙ্গে যায় আকাশের সাকো
শূন্যে উড়ার স্বপ্ন আর থাকে নাকো।

গল্পটির কাহিনী কল্পনায় যেমন মৌলিকতা আছে, বাকবিন্যাসে তেমনি আছে এক দক্ষ শিল্পীর শক্তি।

মযহারুল ইসলাম মূলতঃ কবিতা ও গবেষণা সাহিত্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অধিক পরিচিত। কিন্তু তাঁর 'তালতমাল' গল্পগ্রন্থ থেকে এই সংকলনে নির্বাচিত 'এপার ওপার' গল্পটি আমাদের সামাজিক পটভূমিকার মানদণ্ডে বিশিষ্ট একটি গল্প হিসেবে স্বীকৃত ; এ গল্প বাৎসল্য সম্পর্কের একটি মনোজ্ঞ কাহিনী। একটি গ্রাম্য রমণীর স্বপ্ন কাহিনী যা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু যার পরিণতি বিশেষ পীড়াদায়ক ও বেদনাবিধুর, তারই একটি করুণ দৃশ্য এ-গল্পে চিত্রিত হয়েছে। বৃদ্ধ দাদী অনেক কষ্টে ডিম বিক্রি করে জমানো টাকায় নাতি মোমেনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, তারপর মেধার দাবীতে সে বিলেতে গিয়েছে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ পৌত্রটি বিলেতে গমনের পূর্বেই এক ধনী কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং বিলেত থেকে ফিরে সেই স্ত্রীকে নিয়ে ইসলামাবাদে মোটা মাইনের চাকরিতে প্রবেশ করেছে। বিদেশ থেকে ফিরে সে আর একটিবার ইসলামাবাদ থেকে তার গ্রামের পর্ণকুটিরে বৃদ্ধা দাদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবার প্রয়োজনবোধ করে নি। অথচ গল্পের নায়ক মোমেন একদিন এই বৃদ্ধা দাদীর স্নেহে লালিত হয়েছিল এবং তারই ডিম বেচা অর্থে উচ্চশিক্ষা লাভ করে সে জীবনে উন্নতির উচ্চপর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছিল। নদীর ওপারেই রেল ষ্টেশনে প্রতিদিন কত লোক আসে, যায়, বৃদ্ধা দাদী তার নাতির জন্যে প্রতীক্ষা করে প্রতিদিন, কারণ সে কথা দিয়েছিল বিদেশ থেকে ফিরে দাদীকে দেখতে আসবেই, আর দাদী অকপট সারল্যে ও স্নেহের প্রাবল্যে বিশ্বাস করেছে তার সেই প্রতিশ্রুতি। কিন্তু মোমেন এলোনা, সে আসবেও না কোনদিন। তথাপি মোমেনের অকৃতজ্ঞতা ও হৃদয়হীনতার জন্য কোন অভিযোগ নেই দাদীর বরং সে সুখে থাকুক এই শুভেচ্ছায় সে তার বৃদ্ধ বয়সের জরাগ্রস্ত যন্ত্রণাকে ভুলে যায়। এ-গল্পে বঞ্চনাজনিত যন্ত্রণাবোধ অন্তর্নিহিত এবং জীবনের অনেক গভীরে সঞ্চারিত। শরৎচন্দ্রের মহেশের মত প্রবল অভিযোগে সেই যন্ত্রণা বিস্ফোরিত নয়। বিমলমিত্রের মিলনান্তের মত এক কাল্পনিক মিলনের প্রতীক্ষাতে বরং তা তন্ময় ও পারিপার্শ্বিকতা-বোধ বর্জিত। বিভূতিভূষণের আহ্বান গল্পের বৃদ্ধার মত এখানে এ-প্রতীক্ষা বাৎসল্যে এবং

নির্ভরতায় ঐশ্বরিক। প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণের দৃষ্টির মত বর্তমান লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ, বিরল-জীবনরসিকতায় করুণ অথচ ক্ষমাস্নিগ্ধ। এ গল্পের মাধ্যমে একদিক দিয়ে যেমন আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি যে মাতৃস্নেহ পুত্র ও পৌত্রের সমস্ত অন্যায় আচরণকে ক্ষমা করে আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত, তারই একটি উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব গল্পটিকে গৌরবমণ্ডিত করেছে। গল্পটিতে যেন গল্পকার এক মহৎ জীবন শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। তবে গল্পের শিল্পপ্রকরণে সংহত বিন্যাসের অভাব আছে—মনে হয় লেখক যেন কথক-কবির ন্যায় শুধু কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন, শিল্পচাতুর্য স্থষ্টির দিকে তেমন প্রখর দৃষ্টি দিতে সমর্থ হন নি।

আবু ইসহাকের 'জেঁাক' বঞ্চিত সমাজের নির্যাতন ও তার প্রতিরোধের একটি সফল চিত্র। গল্পের সূচনায় রক্ত শোষক জেঁাককে গল্পে নিম্নবিত্ত নায়ক ওসমান কাস্তে দিয়ে কেটে ফেলেছে। ঘটনাটি সাধারণ এবং সামান্য—কিন্তু এর একটি মহৎ ব্যঞ্জনা গল্পের সমগ্র শরীরে, বিশেষ করে পরিণতিতে অপূর্ব দ্যোতনার স্থষ্টি করেছে। সমাজের রক্ত শোষক জেঁাক-জমিদারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের প্রতিরোধ সংগ্রাম এই সামান্য ঘটনার সঙ্কেতেই বাস্তবায়িত হয়ে গল্পটিকে সার্থকতা দান করেছে। যখন সমাপ্তিতে ওসমানের সঙ্গে অন্যান্য অত্যাচারিত কৃষক একত্র হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম রচনা করবার প্রতিশ্রুতিতে অগ্রসর হয়েছে অত্যাচারী জমিদার বাড়ীর দিকে, তখনই উচ্চারিত হয়েছে গল্পটির মহৎ সম্ভাবনা। উপরন্তু গল্পটিতে কৃষক পত্নীর দাম্পত্য নিষ্ঠা ও সেবা প্রিয়তার এক নিরাভরণ সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়েছে। পত্নী মাজু বিবি স্বামীর গায়ে তেল মালিশ করে, ভাতের ফেন সংগ্রহ করে পুত্রের মাধ্যমে নিয়মিত মাঠে কর্মরত স্বামীকে পাঠায়, কারণ তার জোরে স্বামী কাজ করবার শক্তি পাবে —এ সব ঘটনা কৃষক পরিবারের একটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি তুলে ধরেছে। গল্পটি পূর্ব পাকিস্তানের ছোটগল্পে একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

আলাউদ্দীন আল আজাদ-এর 'কয়লা কুড়ানো দল' প্রবঞ্চিত সমাজের সঙ্ঘবদ্ধতার অপর মনোজ্ঞ কাহিনী। কয়লা কুড়িয়ে যে দরিদ্র শ্রেণীর বালক বালিকাদের পরিবার চলে, সেই দলের কোন

অত্যাচারী কিশোর তার দলের প্রয়োজনেই সবার সাথে আপোষ করে। তাদের যে পাহারাওয়ালা পুলিশ সে শুধু জীবিকার নির্দেশেই এদের কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করলেও শেষতঃ তাদের চুরিকে সহায়তা করে, কারণ তার সহানুভূতি অনিবার্যভাবে নিক্ষিপ্ত এই দলটির প্রতি, কেননা জীবিকার মানদণ্ডে সেও যে নীচের তলার মানুষ, সেও অত্যাচারিত। তাই সে পরামর্শ দেয়, তার আগমনের পূর্বেই দলটি যেন কয়লা কুড়ানো সমাপ্ত করে, যাতে ষ্টেশন মাষ্টারের সতর্ক চোখ এড়িয়ে তারও চাকরি বাঁচে এবং দলটিরও জীবিকার সংস্থান হয়। এ-গল্পের মূল বক্তব্যে যে সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা হোল এই যে, দুনিয়ার মজলুম মানুষ জীবিকার অনিবার্য প্রয়োজনেই এক হতে বাধ্য। এ-ছাড়া গল্পটিতে নিম্নবিত্ত সমাজের কৈশোর প্রণয়ের চিত্র যা মনু ও রূপভানের মাধ্যমে প্রকাশিত, তা এই জীবিকার নিষ্ঠুর সংগ্রামের মরুভূমির মধ্যেও যেন একটি সজল মরুদ্যানের মতই আকর্ষণীয়।

সৈয়দ শামসুল হক-এর 'কালা মাঝির চড়নদার' আঙ্গিকে এবং বক্তব্যে একটি সংহত এবং শক্তিশালী ছোটগল্প। গল্পে যে পুত্র মুমূর্ষ পিতাকে শেষ দেখার জন্যে দারুণ দুর্যোগকে উপেক্ষা করে নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়েছে এবং দরিদ্র মাঝিদেরকে নিজের আভিজাত্য বিস্মৃত হয়ে নদী পার করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে তা কৃতজ্ঞতায়, স্মৃতিতে এবং পিতৃভক্তিতে একটি মধুর সঙ্গীতের ন্যায় রমণীয় হয়ে উঠেছে। এখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের স্বর্গীয়তা এক সুন্দর সুষমার সৃষ্টি করেছে। দুর্যোগঘন আকাশের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুত্রের স্মৃতি মন্থনের মাধ্যমে তার শৈশবের দিনগুলোর এক বিশ্বস্ত উন্মোচন ঘটেছে এবং পিতার ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক মহান নিদর্শন ফুটে উঠেছে— সমগ্র পরিবেশের সাথে মিলিয়ে এই ঘটনাটি অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে বলেই মনে হয়। উপরন্তু নদীর যে নিদারুণ তাণ্ডবের চিত্র এ-গল্পে বর্ণিত হয়েছে চিত্রগুণে তা যেন শওকত ওসমানের 'নতুন জন্ম' গল্পের পরিবেশকেও অতিক্রম করেছে।

গল্পটির অন্যতম চমক রয়েছে নিয়তি লাঞ্ছনায় এবং মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় পরিবর্তনে। কালামাঝি প্রথমে নদী পাড়ি দিতে অস্বীকার করেছে

কিন্তু আবার অকস্মাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সেই দুর্যোগে জীবন বিপন্ন করেও হৃদয়বান পুত্রকে সে পিতার সমীপে পৌঁছে দেবে। কালামাঝির দায়িত্ববোধকে ত্বরান্বিত করেছে তার সততা এবং ধার্মিকতা। এক বিচিত্র ধর্ম বিশ্বাসে সে যেন নতুন কল্পনাজাল সৃষ্টি করেছে—যেখানে সে নিষ্ঠুর আজরাইলের চরিত্রেও আরোপ করেছে করুণা ও সহানুভূতি, সন্তান কাঁদলে আজরাইল জান কবচ করতে পারে না এই বিশ্বাস তার বিশিষ্ট পেশানির্ভর ধার্মিকতা-প্রসূত বলেই এমন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সতত পরিবর্তনশীল মানব মনের যে বিচিত্র নিরীক্ষা আছে তা দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে আধুনিক এবং গল্পটি এদিক থেকে ও হেনরীর 'দি পপ অ্যাণ্ড দি অ্যানথেম' গল্পের সগোত্র।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'লালমেঘ' একটি রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী। গল্পটিকে আধুনিক বৈভব দান করেছে পেশার আধুনিকতা। গল্পের টাইপিষ্ট নায়কের দারিদ্র্য এবং বঞ্চনার যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিয়েছে একটি চকিত উজ্জ্বল প্রেমের পরশমণি। সহকর্মিনী টাইপিষ্ট মহিলার সঙ্গে তার মনের সংযোগ ঘটে গিয়েছে অবিলম্বে, মেয়েটির কর্মে নৈপুণ্যের অভাবই এই যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করেছিল। গল্পের বিদেশী নায়ক শিক্ষণের সম্ভ্রান্ত পথ ধরে ধীরে ধীরে উপনীত হয়েছিল প্রেমের আলোকোজ্জ্বল তীর্থে। অকস্মাৎ একদা সে সেই অভাবিতপূর্ব অনুভূতির তীর্থে দাঁড়িয়েই কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তার প্রেমিকার সাহচর্য গভীর তৃপ্তিতে অনুভব করেছে—যে সান্নিধ্য তার হৃদয়ে এনে দিয়েছে প্রেমের মেদুর স্পর্শ। এই স্পর্শই যেন তার দারিদ্র্য এবং অনাত্মীয় প্রবাসজীবনকে করেছিল সঙ্গীতের মত লঘুপক্ষ এবং মৃত্তিকা-মালিন্য শূন্য। কিন্তু এ-প্রেম ছিল এক পক্ষের হৃদয়জাত, অন্যপক্ষের কুৎসিত স্বার্থ-উৎসারিত। তাই তা সার্থক মিলনের পথে এগোতে পারেনি। মেয়েটির কুটিল স্বার্থপরতায় নায়ক ভামজীর চাকরী চলে গেছে, আর সেই ইস্তাফা দেবার নোটিশ টাইপ করেছে তারই প্রেমিকা রোজিনা। উপসংহারে ভামজীর একমাত্র আত্মতৃপ্তি, তার চাকরী থেকে বিদায়ের চিঠি তারই টাইপ-ছাত্রী রোজিনা নির্ভুলভাবে টাইপ করেছে। এই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার অন্তর—সার্থক শিক্ষণের যদিও প্রেম এবং জীবিকা উভয়

ক্ষেত্রেই তার জীবনে বঞ্চনার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল এই সহ-কর্মিনী রোজিনা। এমনই এক পরিতৃপ্তি পারিপার্শ্বিকতাবোধশূন্য গাম্ভীর্যে উন্মোচিত হয়েছে 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পে—তবে সেখানে তা শিল্পী-জীবনে প্রযুক্ত বলে অধিকতর বাস্তব বলে মনে হতে পারে। অপরপক্ষে লালমেঘ গল্পেও নায়কের এই বোধ, এই সার্থক শিক্ষণের আনন্দ, যা তার হয়তো শেষ অবলম্বন মাত্র; তার গুরুত্বও কম নয়। যদিও তা এখানে একটি টাইপিষ্টের জীবনে আরোপিত, কিন্তু তবু প্রেমের পরশ-মণিতে এই টাইপিষ্টও যেন শিল্পীর মহত্তম মহিমা পেয়েছে—তাই মনে হয় এখন আর "আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানীর কোন ভেদ নেই"।

অবশ্যি গল্পটিতে নায়িকার যে অকৃতজ্ঞতা, হৃদয়হীনতা এবং সুযোগ শিকারের হীন মনোবৃত্তি বিধৃত, তা অতিশয়তায় অবাস্তব মনে হতে পারে—মনে হতে পারে অন্ততঃ আমাদের সমাজের পটভূমিতে। উপরন্তু, গল্পটির শিথিল-বন্ধন বিন্যাস মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক মনে হয়। বিশেষ করে পঁচাত্তর টাকা বেতনের নায়কের পঁচিশ টাকা ভাড়ার বাসায় বসবাস এবং দীর্ঘদিন শিক্ষানবিসী চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গল্পের নায়িকার এ হেন প্রবঞ্চনা, সতর্ক কর্মকর্তার অজ্ঞাতে প্রেমের লীলাখেলার অভিব্যক্তি, এ-সবই মনে হয় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। এ-সব সত্ত্বেও গল্পটি 'পাতলা নীলাভ স্ক্রীনের' অন্তরালে রহস্যময়ী কন্যা রোজিনার মতই এক অনাস্বাদিত অনুভূতির স্পর্শে রমণীয়।

সঙ্কলিত গল্পগুলো সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবার পর এ-কথা বলা দরকার মনে করি যে, এই আলোচনা শুধুমাত্র গল্পগুলো সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তুলবার জন্যই লিখিত হোল – গল্পগুলোর বিস্তারিত সমালোচনার অবকাশ এখানে সীমিত। গল্পগুলো সম্পর্কে আমার এই আলোচনা বা মন্তব্য যে অভ্রান্ত একথা বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই—তবে আমি সমালোচনার দৃষ্টিকে সজাগ রেখেই প্রত্যেকটি গল্প সম্পর্কে আলোকপাত করেছি এবং আমার মনে হয়, গল্পগুলোর মেজাজ ও চারিত্র্য অনুধাবনে তা বিশেষ সহায়ক হবে। এ-ছাড়া সুদীর্ঘ ভূমিকায় পাশ্চাত্য ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিবর্তন, ছোটগল্পের শিল্প-প্রকরণ, বাংলা ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইত্যাদি

বিষয়ও আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে আমার এই ভূমিকা যদি ছোটগল্প সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকের এবং বিশেষ করে সাহিত্যে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর উপকার সাধনে সমর্থ হয়, আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

আমার এই গ্রন্থ সম্পাদনায় আমার তরুণ সহকর্মী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান, আবদুল হাফিজ, শেখ আতাউর রহমান এবং আবু সাঈদ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এদের সবার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক অত্যন্ত স্নেহের—সুতরাং শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের আন্তরিকতার মূল্য দেয়া সম্ভব নয়। ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ-এর পক্ষ থেকে মিঃ ওহিদউল্লাহ এই গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন—আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত গল্পগুলো সংকলনের জন্য লেখক ও প্রকাশকগণ তাঁদের সহৃদয় অনুমতি প্রদান করে তাঁদের স্বভাবসুলভ মহান হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন—আমি প্রত্যেক লেখক ও প্রকাশকের নিকট আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। গ্রন্থটি তাঁদের এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদের সমবেত সহায়তায় সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে একটি সুন্দর ও বিশিষ্ট গল্প-সংকলন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলে আমি কৃতার্থ বোধ করবো।

মযহারুল ইসলাম

বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯/৯ই ফাল্গুন, ১৩৭৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একরাত্রি

সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।"

ছোটো ছিলাম, কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবী ছিল, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না—আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু, আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমার জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল—কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব, ইহা আমি মনে-মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন—নানা উপলক্ষে মাছটা-তরকারিটা টাকাটা-সিকেটা লইয়া যে

তাঁহাদের পূজার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল ; এইজন্য আদালতের ছোটো কর্মচারী এমন-কি পেয়াদাগুলোকে পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা ; তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশী ; সুতরাং পূর্বে গণেশের যাহা-কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধা-যোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না। কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনে ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, কলিকাতার ইঁচড়ে-পাকা ছেলেদের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই ; সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো-টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। সহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাটসীনি গারিবাল্ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হইলেন।

আমি পনেরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পলাইয়া আসি, তখন সুরবালার বয়স আট ; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার

বিবাহের বয়েস ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, এ দিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব—বাপকে বলিলাম, বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এন্‌ট্রেন্স পাস করিয়াছি, ফার্স্ট আর্টস্‌ দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই ; মাতা এবং দুটি ভগিনী আছেন। সুতরাং কলেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট সহরে এন্‌ট্রেন্স স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোন কথা বলিলে হেড্‌মাষ্টার রাগ করে। মাস-দুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙ্গল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে লেজ-মলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটি-ভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় এক পেট জাব্‌না খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে ; লম্ফে ঝম্পে আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাষ্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মানুষ, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বুড়ো আটচালার সংলগ্ন একটি চালায় আমি বাস করিতাম।

স্কুল ঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে একটি বড়ো পুষ্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ এবং স্কুলগৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিম গাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারী উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অনতিদূরে। এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী—আমার বাল্যসখী সুরবালা—ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল তাহা রামলোচনবাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সঙ্গত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা যে কোনো কালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনোরূপে জড়িত ছিল, সে কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাবুর বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনর্গল শখের দুঃখ করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল—বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে ঢল ঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি, যাহা করি, কিছুতেই মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্-না, সুরবালা আমার কে।

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত—সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয় চিন্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত, কেবল গোটা-দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর-সকলের নিকট হইতে এক মুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল!

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসঙ্গত। রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসঙ্গত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুরবেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন্ গুন্ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিম গাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত—কী ইচ্ছা করিত জানি না—এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ভারতবর্ষের এই সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিঁকিত না, অথচ কোনো ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত।

সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি-নারিকেলের অর্থহীন মর্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

তোমার মতো লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিতে; তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবাল্‌ডি, এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার! আর, রামলোচন রায় উকিল; তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোনো জরুরি আবশ্যক ছিল না; বিবাহের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশংকরীও তেমন, সেই কিনা কিছুমাত্র না ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া, সরকারি উকিল হইয়া দিব্য পাঁচ টাকা রোজগার করিতেছে – যেদিন দুধে ধোঁওয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা চাপকান-পরা, কোনো অসন্তোষ নাই; পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না। রামলোচন একটা বড়ো মোকদ্দমায় কিছুকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুল-ঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সেদিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে, সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেড্‌মাষ্টার সকাল-সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়িল, এই দুর্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুল-ঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুল-ঘরে ডাকিয়া আনিয়া

আমি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল—সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের পুষ্করিণীর পাড়—সে পর্যন্ত যাইতে না যাইতে আমার হাঁটুজল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর-একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমাদের পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে। পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠলাম বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে, কেবল হাত পাঁচ-ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে—তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না–কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন্-এক জন্মান্তর, কোন্-এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর, আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া

ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে—এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে, বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্র গৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল—ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল—সুরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্‌ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

……

সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ বি, এ পাশ করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম, সেখানেও এই যুবকের মানসনদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বল্‌জ্বল্‌ এবং বাতাসে ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বর আগমন সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না, সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ-সমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশ্বত্থ গাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশিকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যাবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল, তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃণ্ময়ী। দূরে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশত্যাগ করিয়া বছর দু-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশু-রাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃণ্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না; অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃণ্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত, ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণ-পূর্বক মৃণ্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুস্থ, সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যে দিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখর ভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনহীন বালিকাটিকে দুই চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমনকি অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে, কিন্তু এক-একটি মুখ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর একটি কী গুণ

আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্য-প্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না ; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয় সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারী প্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে ; সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলাবাহুল্য মৃন্ময়ীর কৌতুক হাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক দুর্ভাগা অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিম মুখে দ্রুতবেগে গৃহ-অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স ; অবশ্য ইঁটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়াছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইষ্টক শিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া-প্রেতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধূয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়াছিল যে, বি, এ পাস না করিয়া বিবাহ করিব না।' এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, অতএব এখন আর কোন ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপূর্ব এই

ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই ; কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছুসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, 'আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পা পিছলে কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।'

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ী। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি এবং বার্নিশকরা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া, খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া একখানি পাৎলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদগত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা

মৃদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়ি-পরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া, তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন-মোচনে রাখাল খিল্ খিল্ শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা-পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই এক দিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে নির্দয়-ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙ্গুরের স্তূপের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী-সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে

গিয়া দেখে বানিশকরা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহু চেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশ্যে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিজোড়াটি পরিয়া, প্যাণ্টলুন চাপকান পাগড়ি-সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্য কলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর এই অসঙ্গত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুত বেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতুহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্বণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্ত দিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তারপর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল-নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ-নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থসমালোচনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং 'হারমোনিয়ম-শিক্ষা' বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু, মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লীবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ রায় বি, এ কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?"

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি!"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল, প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল, 'মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর-কাহাকেও বিবাহ

করিব না।' অন্য জড়পুত্তলি মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই-তিন দিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপূর্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃন্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু, তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল, তথাপি আশা করিলেন দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জব্‌জবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোক সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্য বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি ষ্টীমার কোম্পানীর কেরানি-রূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে একটি ছোট টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট-বিক্রয় কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ঈশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে-পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, "এই মাসে দিন ভালো আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর-কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃণ্ময়ীর মা এবং পল্লীর যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুত গমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা-অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত হৃদয়ে মৃণ্ময়ী মনে করিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু, তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এক রাত্রির মধ্যে মৃণ্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাশুড়ী সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, তুমি কিন্তু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"

শাশুড়ী যে ভাবে বলিলেন মৃণ্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল, এ ঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল, খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশুড়ী মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃণ্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃণ্ময়ীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃণ্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃণ্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল "না। আমি তোমাকে কক্‌খনোই ভালোবাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।"

মৃণ্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু, অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ী মৃণ্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোন পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদর-খানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃণ্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এসো আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃণ্ময়ী প্রবল-বেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখো কে এসেছে।" রাখাল ভূপতিত মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃণ্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বাসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোনমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন মৃণ্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃণ্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতিকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃণ্ময়ী শাশুড়ীকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ী অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন,

"কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই ; বলে বাপের কাছে যাব। অনাসৃষ্টি আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমন করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃণ্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্নারাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃণ্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক 'রানারগণ' চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃণ্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখুস করিয়া অনিশ্চিত স্বরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মৃণ্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্ দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থোলে কাঁধে করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃণ্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানি নে।" এই বলিয়া ঘাটে-বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃণ্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কে ও! মিনু মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।" মৃণ্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্।" বনমালী তাহাদের

গ্রামের মাঝি ; সে এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতির বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত ; সে কহিল, "বাবার কাছে যাবে ? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মৃণ্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল ; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিল। মৃণ্ময়ী বিস্ফারিত-নেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন তখন মৃণ্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-এক দিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপূর্বকে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যে অনুরূপ দুর্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃণ্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, "মৃণ্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে ?"

মৃণ্ময়ী সবেগে অপূর্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব।"

অপূর্ব চুপি চুপি কহিল, "তবে এসো আমরা দুইজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃণ্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তত

হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃণ্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল ; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শ-যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ! দুই ধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুই ধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃণ্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল ঃ ওই নৌকায় কী আছে, উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন-সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই-সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুন্সেফের আদালতকে জমিদারী কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই-সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায়-বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ী ডাকিল, "বাবা।" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী ; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে

তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে-ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃণ্ময়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব লোকাভাব অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা; এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার যোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর এক করিয়া তুলে রাঁধাবাড়া। তাহার পরে মৃণ্ময়ীর বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর-জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শন-পূর্বক মৃণ্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল, আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃণ্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রু গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিনুর কোন দোষ না ধরিতে পারে।"

মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই

নীরব অভিযোগ, নিস্তব্ধ অভিমান, লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কলেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, "বউয়ের কী করবে।"

অপূর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক্।"

মা কহিলেন "না বাপু, কাজ নাই; তুমি তাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্বকে 'তুই' সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "আচ্ছা।"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মৃণ্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "মৃণ্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?"

মৃণ্ময়ী কহিল "না"।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?"

মৃণ্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পারব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না।

"বোধ হয় দু-বৎসর কিংবা তারও বেশী হতে পারে।"

মৃণ্ময়ী আদেশ করিল, "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে এইখানেই থাকবে?"

মৃণ্ময়ী কহিল, "হঁা, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।"

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে ?"

মৃণ্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু, অপূর্বর ঘুম হইল না, বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলে এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালাবদল করিয়া লওয়া যায়। রূপার কাঠি হাস্য, সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মৃণ্ময়ীকে জাগাইয়া দিল ; কহিল, "মৃণ্ময়ী, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃণ্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি, আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে ?"

মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কী ?"

অপূর্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া, ভালবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃণ্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সম্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল--কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড়ো কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মৃণ্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া

দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃণ্ময়ী দেখিল, কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গিয়াছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার সহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মৃণ্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল, যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য কেন এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল ; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্বপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃণ্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই ; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর-একটা বাড়ি, আর-একটা ঘর, আর-একটা শয্যার কাছে গুন্‌গুন্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, "মা আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।"

এ দিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণ মুখ স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়োই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ীর পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ী তৎক্ষণাৎ ছলছল নেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ী বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণতঃ সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ী স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর-একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়ীকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়ীও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই-যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর-একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি

আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন আমার অনুরোধ মানিলে কেন আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।

তাহার পর, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেই পুষ্করিণী, সেই পথ, সেই তরুতল, সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্ব মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষ্ণার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, 'আহ, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।'

অপূর্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, 'মৃণ্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই।' মৃণ্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, 'তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কি বুঝিয়া গেলেন।' অপূর্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না। ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্‌কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না।' মৃণ্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি-পাড়-দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোট বড় করিয়া উপরে কোন সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, 'তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো।' তার কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর-একটু বাহুল্য

করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃণ্ময়ীও তাহা বুঝিল; এইজন্য আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল— 'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুঁটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর বাছুর হয়েছে।' এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরও যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃণ্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাশে শাশুড়ী অথবা আর-কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে, সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এ পত্রের কোনো ফল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন, ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ী আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল, অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মৃণ্ময়ীকে আরও ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্ কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন মৃণ্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপু অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি, কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃণ্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড়

[redacted]

লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল ; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যেদিকে পাল্ ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে তুমি কি খাও ?"

তারাপদ কহিল, "যা পাই তাই খাই ; সকল দিন খাই-ও না।"

এই সুন্দর ব্রাহ্মণ-বালকটির আতিথ্য গ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল ; কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন ; সে সংক্ষেপে বলিল, "আমার ভালো লাগেনা।"

নদীর উপর দুই তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার-করা হইতে নৌকাচালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকৌতুহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে ; এই জন্য সে নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান ভূমি আছে ;—কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ। ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন বন্ধন নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এ-দিকে অনেকদিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া তাহার অনেক প্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনো প্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ

খণ্ড সকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চিরপ্রথামতো একদিন সন্ধ্যা-বেলায় তাঁহার স্ত্রী-কন্যাকে রামায়ন পড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশলবের সূচনা হইতেছে, এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাতের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখুন! আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।"

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল;—দাঁড়ি-মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য, করুণা এবং সঙ্গীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতুহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহিগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন?

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়। কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃ-স্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল-বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল, তবে সে-দিন যতবার চুল খুলিয়া যত রকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে

না। অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বোধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদণোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোন গুণ আছে, ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল, তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কুশলবের গান করিল, সেদিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, সঙ্গীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে; —তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চারু, কেমন লাগ্‌ল?" সে কোনো উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গীটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—কিছুমাত্র ভালো লাগে নাই এবং কোনো কালে ভালো লাগিবে না!

চারুর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পর যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিবাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া

আসিয়া সরোষ-রোদনে বলিত, "মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।" পিতামাতা তাহাকে এক্‌লা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সঙ্গীত উপভোগ করিতেছেন—ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত। এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে তাহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশী বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সবল তনুদেহখানি নানা সন্তরণ-ভঙ্গীতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না; এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণ-লীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল, তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া, কখনো গুন টানিয়া নদীর শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই সকল নদী-উপনদীর মতো, শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনের মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারো কোনরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এদিকে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোৎখচিত বনের পাশে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিন দশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ী হইতে পাল্কী এবং টাট্টু ঘোড়ার সমাগম হইল এবং বাঁশের লাঠি-হস্তে পাইক-বরকন্দাজদের দল ঘন ঘন ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একেবারে সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী বলিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্য-বন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোন বন্ধন ছিল না বলিয়াই বালক এই আশ্চর্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিল। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোন প্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা সকল কাজের প্রতিই তাহার এক প্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক, অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে; রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে; ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে,—"দাদাঠাকুর,একটু বসো তো ভাই, আমি আস্‌ছি"—তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান্ করিতেও সে মজবুৎ, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদর সুদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতে নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুন ঠাকরুণের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সে-ই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর

সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যে-দিন দেখা করিতে আসিল সে-দিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল তারাপদ নামক তাহাদের নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণ-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুন ঠাকরুণকে সে মাসী বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে, যখন শুনিল তারাপদ কেবল যে বাঁশীতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিতেছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশী বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্ঠকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ—অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একটু আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণ বালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল? আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে? সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়!

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বদ্বেষশরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন? বুঝিবে কাহার সাধ্য!

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছসূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার সখের বাঁশীটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দয়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশী ধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, "চারু, আমার বাঁশীটা ভাঙছ

কেন ?" চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে "বেশ করছি, খুব করছি" বলিয়া আরো বার দুইচার বিদীর্ণ বাঁশীর উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশীটি তুলিয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিল তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে, তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশীটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতুহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতুহলের ক্ষেত্র ছিল, মতিলালবাবুর লাইব্রেরীতে ইংরাজী ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন, "ইংরেজী শিখবে ? তা হোলে এ-সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।" তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, "শিখব।"

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাষ্টার রামরতন বাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরেজী অধ্যাপনকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিল না; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নির্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত, তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—

কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জেদ করিয়া বসিল, আমিও ইংরাজী শিখিব। তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালী কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহ-দুর্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাষ্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্রে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসঙ্গত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন কি কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালি ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত, তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখাখাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্নমুখে বসিয়াছিল; চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ

একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুস্কিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে-বিদ্যা তাহার কোন কালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠির ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল ঃ "আমি আর কখনো খাতায় কালি মাখাব না।" লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।"

এদিকে সঙ্কুচিতচিত্ত সোনামণি দুই একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত, সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসঙ্কোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, "কী সোনা! খবর কী? মাসি কেমন আছে?"

সোনামণি কহিত, "অনেকদিন যাওনি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।"

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত! সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "অ্যাঁ সোনা!

তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনি বাবাকে গিয়ে বলে দেব!" —যেন সে নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালরূপ জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ৎ সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণা ভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিত চিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়াদ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ী যাব এখন!" চারু সর্পিনীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত —"যাবে বৈ কি! তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই একদিন সন্ধ্যার পর বামুন ঠাক্‌রুণের বাড়ী গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মা'র মসলার বাক্সের চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করযোড়ে সানুনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি আর আমি এমন করব না! তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি খেয়ে যাও!" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সঙ্কটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্ত মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনো তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে

না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমানুষী করিতে থাকে, তখনি একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তত হইয়া থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষে কোন্ দিক্ হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রু-বারি বর্ষা, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারো নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখ-সাচ্ছ্যন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়ত দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এদিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহ বয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজী পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটি আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্য তুমি অত খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছ কেন, তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনো হয়? তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নাই। আমার একমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই!"

একদিন রায়ডাঙার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার

ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল—কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের বুঝি কোনো একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরি অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হোক শ্বশুর বাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী-পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভালো কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ার মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মতো তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো কখনো রাগ অনুরাগ কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃতশান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে-ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তরঙ্গ-চূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে

জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিন। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না; দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন এই আবদ্ধ আসক্তভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতায় মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবার জল বাঁধিয়া থাকিত; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গরুর গাড়ি চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহ-প্রত্যাগত পার্বতীর মতো কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্য সহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালক বালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল। কুটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়-সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল,—শুষ্ক নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশ-বিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো নানা আয়তনের নৌকা আসিয়া লাগিল—বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৌরিকবর্ণ জল-রথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের

সঙ্গে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারিদিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগর-দোলা, কোনো নৌকা যাত্রাদল, কোনো নৌকা পণ্য-দ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সর্টের দল বিপুল শব্দে দ্রুত-তালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিম দেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সঙ্গীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদী-তীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল;—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; —মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল। সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারা-বর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর একতীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটির দ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধ সামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারী কাছারির ঘাটে লাগিল, এবং

পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিত আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিত আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ-বালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুর্বুদ্ধি

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না, সুতরাং নর এবং নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধরকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু, শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলগ্নই ব্যর্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির-বাড়ীতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শুভকর্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে, শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোনোমতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনও সদর কখনও খিড়কি-দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "ব্যাপারটা বড়ো গুরুতর।" দুটো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম, কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য, কন্যার অন্ত্যেষ্টি-সংকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।"

আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।"

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠা ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলো ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, "মাপ করো, দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।"

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু, করেন কী, করেন কী। আপনার কাছে আমি চিরঋণী, আমার পায়ে হাত দিবেন না।"

আমি কহিলাম, "নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।"

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওগো, আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি; ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করুন।"

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম; বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পরদিন দশটা-বেলায় গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পরদিনেই দারোগাবাবু কহিলেন, "ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেলো। দেখাশুনার তো একজন লোক চাই?"

মানুষের মর্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু, নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোন কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল।

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমনকি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণ কণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম, আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্ধকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিনের সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা

শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্মে পরলোকে কোনমতেই শান্তি পাইতেছে না। সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, “বাবা, কেন এমন করিলে।”

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল, গরীবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে পারিতাম না। কোনো ছোটো মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত, আমার শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্ণা বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের খেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাত্রি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, এখনও বিরাম নাই।

জমিদারের কাছাড়িবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্বে এরূপ দুর্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত, তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না এবং একটি ব্যগ্র কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়নঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সম্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কী রে।” উত্তরে শুনিলাম, গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বহিয়া

আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারী কাছারির অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া ছিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনও সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনও লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারম্বার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্‌স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছু নাই। কন্‌স্টেবল বলিয়া গেছে, "থাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।"

এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনও কিছু মনে হয় নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণা-গদ্‌গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদ্‌লার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজরগুলাকে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতে ছিলেন। তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আপনারা মানুষ না পিশাচ?" বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, "টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া

যাইবেন ; এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক।”

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশ লইয়া অনেক আত্ম-ধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফেল

লেজা এবং মুড়া, রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেই রকম। প্রাচীন হালদার-বংশ দুই খণ্ডে পৃথক হইয়া প্রকাণ্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে; কেহ কাহারও মুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ এক বংশজাত, এক বয়সি, এক স্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিদ্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশুনা ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্বপ্রকার শখ তিনি খাতাপত্র ও স্কুল-বইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্‌ফাট্ করিয়া সাজাইয়া স্কুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সঙ্গে দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুলপির বরফ, লাঠিম ও মার্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে-মনে পরাভব অনুভব করিয়া নলিন কেবলই ভাবিত, নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সেরূপ সুযোগ ঘটিবার পূর্বে ইতিমধ্যে নন্দ বৎসরে বৎসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্ত হস্তে বাড়ি আসিয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য স্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাষ্টার রাখিলেন, ঘুমের সময় হইতে একঘণ্টা

কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাশ করিতে করিতে বি-এ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এনট্রান্স-ক্লাসে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমন সময়ে তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বৎসর মেয়াদ খাটিয়া এনট্রান্স-ক্লাস হইতে তাহার মুক্তি হইল এবং স্বাধীন নলিন আংটি, বোতাম, ঘড়ির চেনে আদ্যোপান্ত ঝক্‌ঝক্ করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিষ্প্রভ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এনট্রান্স-ফেলের জুড়ি চৌঘুড়ি, বি-এ পাশের এক ঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ওয়েলার-ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দর বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জুড়ি এবং তাহার স্ত্রীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সবচেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না, পাছে আরও ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহার ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডিতে এক প্রবাসী বাঙালীর এক পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে। কাছের সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশী লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনানো হইল। কন্যাটি সুন্দরী বটে। নলিন কহিল, "যিনি যাই করুন, ফস্‌ করিয়া রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অন্তত এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে তো আমরা পূর্বেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই।"

কথাবার্তা তো প্রায় একপ্রকার স্থির, পানপত্রের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একদিন প্রাতে দেখা গেল ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র থালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন কহিল, "দেখে এসো তো হে, ব্যাপারখানা কী।"

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধূর জন্য পানপত্র যাইতেছে।

নলিন তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "খবর নিতে হচ্ছে তো।"

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্‌ছড়্ শব্দে দূত ছুটিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কলকাতার মেয়ে, কিন্তু খাসা মেয়ে।"

নলিনের বুক দমিয়া গেল; কহিল, "বল কী হে!"

হাজরা কেবলমাত্র কহিল, "খাসা মেয়ে।"

নলিন বলিল, "এ তো দেখতে হচ্ছে!"

পারিষদ বলিল, "সে আর শক্তটা কী।" বলিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

সুযোগ করিয়া নলিন মেয়ে দেখিল। যতই মনে হইল, এ মেয়ে নন্দর জন্য একবার স্থির হইয়া গেছে, ততই বোধ হইতে লাগিল, মেয়েটি রাওলপিণ্ডিজার চেয়ে ভালো দেখিতে। দ্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ঠেকছে হে।"

হাজরা কহিল, "আজ্ঞে, আমাদের চোখে তো ভালোই ঠেকছে।"

নলিন কহিল, "সে ভালো কি এ ভালো।"

হাজরা বলিল, "এই ভালো।"

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরও একটু যেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশী ফ্যাকাসে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভায় সোনা মিশাইয়াছে। ইহাকে তো হাতছাড়া করা যায় না।

নলিন বিমর্ষভাবে চিত হইয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে কহিল, "ওহে হাজরা, কি করা যায় বলো তো।"

হাজরা বলিল, "মহারাজ, শক্তটা কি।" বলিয়া পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠে তর্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সত্যই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন যথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার

সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, "তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরও একগুণ অধিক করিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্বমাত্র না করিয়া নলিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শুভলগ্নে শুভবিবাহ সত্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বলিল, "বি-এ পাশ করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা! এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়োবাবু ফেল।"

অনতিকাল পরেই নবগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে-হলুদ।

নলিন কহিল, "ওহে হাজরা, খবর লও তো পাত্রীটি কে।"

হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাত্রীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলপিণ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নলিন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির বড়োবাবু আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাত্রীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, "আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল! শেষকালে নন্দর কপালে জুটিল! ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মতো বড়ো হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, 'এখন আর কোনমতেই ইহাকে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আসলে ইহাকেই দেখিতে ভালো! ভারি ঠকিয়াছি।"

অন্তঃপুরে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্ত্রীর ছোটখাটো সমস্ত খুঁত মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, স্ত্রীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নলিন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। "বাহবা, অপরূপ রূপমাধুরী। এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি, আমি এতবড়ো গাধা।"

বিবাহসন্ধ্যায় আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নলিন শুইয়া পড়িয়া গুড়গুড়ি হইতে যৎসামান্য সান্ত্বনা আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে এমন সময় হাজরা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল।

নলিন হাঁকিল, "দারোয়ান!"

হাজরা তটস্থ হইয়া দারোয়ানকে ডাকিয়া দিল।

বাবু হাজরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "অবহি ইস্কো কান পকড়কে বাহার নিকাল দো।"

প্রমথ চৌধুরী

……

মন্ত্র শক্তি

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না ; কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে, শাস্ত্র পড়ে নয়, মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কী দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পূব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সুমুখে ; পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ির দাসী-চাকরানীরা কখনো কখনো রাত-দুপুরে পেত-ধোঁয়ার মতো যাঁর ধড়, আর কুয়াসার মতো যাঁর জটা। আর দক্ষিণে পূজোর আঙিনা—যে আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল ব'লে একটি কবন্ধ জন্মেছিল। এঁকে কেউ দেখেন নি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দি সর্দার, তার সৈন্যসামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে, তারই ব্যবস্থা করছিল। কী চেহারা তার! গৌরবর্ণ, মাথায় ছ-ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁফ ছাঁটা। সে ছিল ওদিকের সব-সেরা লকড়িওয়ালা।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন, "ঈশ্বর পাটনিকে এক-হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন-না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি, কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি—ও হাতে নিলে, কোন লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম করলে ও 'না' বলতে পারবে না, কারণ ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।"

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাংস, চর্বি একবিন্দুও নেই। রঙ তার কালো, অথচ দেখতে সুপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, "আজ তোমাকে এক-হাত খেলা দেখাতে হবে।"

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, "হুজুর, লেঠেলি আমার জাতব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মতো আমিও খেয়ার নৌকা পারাপার করেই দু-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠিখেলা নয়, লগিঠেলা। তাই বলছি হুজুর, এ আদেশ আমাকে করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম "তা হলে তুমি লাঠি খেলতে জান না?"

সে উত্তর করলে, "হুজুর, জানতুম ছোকরা-বয়সে। তারপর আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরি নি, লকড়িও ধরিনি, সড়কিও ধরি নি; তা ছাড়া আর-একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের স্মুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কী করে? হুজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারি নে, তবে—হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে?"

ঈশ্বর বললে, "ছেলেবেলায় এরা-সব খেলা শিখত। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে—আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে যে, আমি কোনো মন্তর-তন্তর শিখেছি—তারই গুণে আমি সকলকে হটিয়ে দিই। হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে, তবে আমার যা ছিল তা এদের কারও ছিলনা। সে জিনিস হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে, তার হাতের লাঠি-সড়কির মার কোন্ দিক থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারত না, আর শুধু মার খেত। শেষটা ওরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে। তারপর, একদিন এরা রাত-দুপুরে আমার বাড়ি চড়াও হয়ে, আমাকে বিছানা থেকে তুলে, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবার উদ্‌যোগ করলে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দারের হাতে। আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বললে, "তুমি ঠাকুরের স্মুখে দিব্যি করো যে, আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেবো। হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি এই দিব্যি করেছি; আর

তারপর থেকে একদিনও লাঠি-সড়কি ছুঁই নি। কথা সত্যি কি মিথ্যে – ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।"

মিছু আমাদের বাড়ির লেঠেলদের সর্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে ?"

সে 'হাঁ' 'না' কিছুই উত্তর করলে না।

ঈশ্বর এর পর বলে উঠল, "হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলি নি— আর, কখনো বলবও না।"

তারপর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "মিছু যদি গুলিখোর হয় তো এমন পাকা লেঠেল হল কী করে ?"

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে তো যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না ?— ঠাকুরদাস কামার অত বড়ো মোষটার মাথা এক কোপে বেমালুম কাটলে, অথচ ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করি নে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরের জোর এখন তো ক'মে এসেছে— যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয় তা হলে দেখতে পাবেন যে, বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।"

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম, তারা ঈশ্বরকে খেলবার অনুমতি দেবে কি না। তারপর পরস্পর পরামর্শ করে বললে, "আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মতো অনুমতি দিচ্ছি। দেখা যাক, ও কী ছেলেখেলা করে।"

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর ঈশ্বর কোমরের কাপড় তুলে বুকে বাঁধলে ; আর তার ঝাঁকড়া চুল একমুঠো ধুলো দিয়ে ঘষে ফুলিয়ে তুললো, তারপর মাটিতে জোড়াসন হয়ে ব'সে পাঁচ মিনিট ধরে বিড় বিড় করে কী বকতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব এই বলে চীৎকার করে উঠল, "দেখছেন, বেটা মন্তর আওড়াচ্ছে – আমাদের নজরবন্দী করবার জন্যে।"

ঈশ্বর এ-সব চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করল না। তার পর, যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখি, সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বলছে ও শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মতো।

ঈশ্বর বললে, "প্রথম এক-হাত লকড়ি নিয়েই ছেলেখেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লকড়ি ধরুক।"

মনিরুদ্দি সর্দার বললে, "আমার ছেলে কামালের সঙ্গেই এক-হাত খেলে তাকে যদি হারাতে পারো, তা হলে আমি তোমাকে লকড়ি খেলা কাকে বলে, তা দেখাব।"

তার পরে একটি বছর কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতোই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি; বাঁ হাতে ছোট্ট একটি বেতের ঢাল, আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টুক্‌টুকে একখানি লকড়ি।

খেলা শুরু হল; তার পর, এক মিনিটের মধ্যেই দেখি কামালের লকড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে, আর কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, "যে লকড়ি হাতে ধ'রে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি!"

এ কথা শুনে মনিরুদ্দি রেগে আগুন হয়ে লকড়ি-হাতে এগিয়ে এল। ঈশ্বর বললে, তোমার হাতের লকড়ি কেড়ে নেবো না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেব।"

এর পরে পাঁচ মিনিট ধরে দুজনের লকড়ি বিদ্যুৎবেগে চলাফেরা করতে লাগল। শেষটা মনিরুদ্দির লকড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল। আর দেখি, মনিরুদ্দির সর্বাঙ্গে লাল লাল দাগ হয়ে গিয়েছে, যেন কেউ সিঁদুর দিয়ে তার গায়ে ডোরা কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে হেদাৎউল্লা লাফিয়ে উঠে বললে, "ধর্‌ বেটা সড়কি।"

ঈশ্বর বললে, "ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিয়ো না। জানি, তুমি খুনে। কিন্তু এ তো কাজিয়ে নয়—আপোষে খেলা। আর এই কথা মনে রেখো, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তোমার গায়েও আছে।"

এর পর সড়কির খেলা শুরু হল। সড়কির সাপের জিভের মতো ছোট ছোটো ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয় আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কী রকম করে, কারণ সড়কির ফলা

তো সাপের জিভ নয়, দাঁত। সে যাই হোক, হেদাৎউল্লা হঠাৎ "বাপ রে" ব'লে চীৎকার করে উঠল।

তখন তাকিয়ে দেখি, তার কব্জি থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে পড়ে।

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি জখম করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত থেকে খসিয়ে না দিতুম, তা হলে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না, ও চায়—হয় জখম করতে, নয় খুন করতে।"

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখে লেঠেলদের মাথায় খুন চড়ে গেল, আর সমস্বরে 'মার্‌, বেটাকে' ব'লে চীৎকার ক'রে তারা বড়ো বড়ো লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করলে। ঈশ্বর একখানা বড়ো লাঠি দু হাতে ধ'রে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দুজনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা করতে লাগলুম। হুজুরের হুকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে, আর তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হয়েছিল। কারো কারো মাথাও ফেটে গিয়েছিল। শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমাকে বললে, "আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি। কাউকেও এক ঘা মারি নি। ওদের গায়ে-মাথায় যে দাগ দেখছেন—সে-সব ওদের লাঠিরই দাগ। এলোমেলো লাঠি চালাতে গিয়ে এর লাঠি ওর মাথায় পড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি-যে এদের লাঠিবৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি, সে শুধু হুজুরের—ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে।"

মিছু সর্দার বললে, "হুজুর, আগেই বলেছিলুম, ও বেটা জাদু জানে, এখন তো দেখলেন যে, আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?"

ঈশ্বর হাতজোড় করে বললে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে। তবে লাঠি-সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কী যেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই; যিনি আমার দেহে ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।"

আমি বুঝলুম, লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন, তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠিখেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই—যথা, সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে তিনিই দিগ্বিজয়ী হন যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কী, যাঁদের শরীরে তা নেই তাঁরা তা জানেন না, আর যাঁদের শরীরে আছে তাঁরাও জানেন না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহেশ

এক

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি-পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহরবেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধূঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল উর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে ; এবং অন্তঃপুরের লজ্জা-সম্ভ্রম পথিকের করুণার আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্‌রা, বলি ঘরে আছিস?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর!

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত

খরবাক্যই বাহির হইবে। কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হ'লে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।

কি করব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দুমুঠো খাইয়ে আনব তা মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই ক'রে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি—খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে - ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর ?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্‌ ত ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু'আঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক্। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি ?—ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি ? কি করলি খড় ? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ ? গরুটার জন্যে এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই ? ব্যাটা কসাই !

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া ব'লে কর্তামশায় সব ধ'রে রাখলেন। কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাব কোথায়, আমাকে পণদশেক বিচুলিই না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস ! সাধ ক'রে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ ! হেসে বাঁচিনে !

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস-দুয়েক খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল।

কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না ; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই - খেয়ে রেখেছিস, দিবিনে ? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে নাকি ? তোরা ত রাম-রাজত্বে বাস করিস্,—ছোটলোক কি না, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস্ ।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে করব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তার আমরা করিনে। কিন্তু কোথা থেকে দিই, বল ত ? বিঘে চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে, কোণে ব'সে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোণা যাচ্ছে—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দু'দিন পেট পুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু'পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্, ছুঁয়ে ফেলবি নাকি ?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সে দিন দেখে এসেছি—এ কটি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি খেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব—কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি, শুধবি কি করে শুনি ?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধবো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেবনা ! যেমন করে পারি শুধবো ! রসিক নাগর ! যা যা সর, পথ ছাড়। ঘরে যাই, বেলা হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচকিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর,, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি ? গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফল-মূল ও ভিজা চালের পুঁটলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েছে একমুঠো খেতে চায়—

খেতে চায় ? তা বটে ! যেমন চাষা, তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই ! নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিঙ, কোন দিন দেখছি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণ-কাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা ; কহিল তোকে দিলে না এক মুঠো ? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক্ গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্, টপ্, করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন ক'রে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেট-পুরে খেতে দিতে পারিনে—কিন্তু তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুঝিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশানধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিল। এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল্ ? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি ? গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায়না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেলতে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার

তাহার দু'চোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল। তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শীগ্গির করে এটুক খেয়ে নে বাবা, দেরি হলে আবার—

বাবা!

কেন মা?

ভাত খাবে এসো। বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ, বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরানো পচা খড় মা, আপনি ঝরে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার করছ?

না, মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশী জানে? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে!

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েছি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাড়িতেই মরে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির শানকিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল?

আমিনা উদ্বিগ্ন-মুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বললে বড় খিদে পেয়েছে?

তখন ? তখন হয়ত জ্বর ছিল না মা।

তাহ'লে তুলে রেখে দি, স"াঝের বেলা খেয়ো ?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে ?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল ; কহিল এক কাজ কর্‌ না মা, মহেশকে না হয় ধ'রে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবিনে, আমিনা ? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

দুই

পাঁচ-সাত দিন পরে এক দিন পীড়িত গফুর চিন্তিত-মুখে দাওয়ায় বসিয়া ছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্তবেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেছ বাবা, মানিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগলি !

হ"া বাবা, সত্যি ; তাদের চাকর বললে, তোর বাপকে বল গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে ?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহু প্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু ও আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন

নিরীহ তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এই ভয় তাহার নাই। বিশেষতঃ মানিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বললে, তিন দিন হ'লেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেলবে?

গফুর বলিল, ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখ-মাত্রই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিল ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো, একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়ের মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলা তলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি, একজন বুড়োগোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙাব না, এই পুরোপুরিই দিলাম—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার

উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলছি—খবরদার বলছি, ভাল হবে না!

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি! আমার জিনিস আমি বেচব না—আমার খুশী। বলিয়া সে নোটখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে! বলিয়া সে ট্যাক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল।

একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দু'টাকা বেশি নেবে, এই ত? দাও হে, পান খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধলা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়ো বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা বিশ্রী কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে, তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলো চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল, শিববাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা তোকে যে আমি কি সাজা দেব, ভেবে পাইনে। কোথায় বাস ক'রে আছিস, জানিস?

গফুর হাতজোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাইনে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদী এবং বদমেজাজী বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো করব না কর্তা! বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের এক দিক হইতে আর এক দিক পর্যন্ত নাকখত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিববাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েছে। আর কখনো এ-সব মতি-বুদ্ধি করিস্‌নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্তার পুণ্য প্রভাবে ও শাসন-ভয়েই নিবারিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং সে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ, তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞান-নেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে, মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

তিন

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ এ কথা ভাবিতে

যেন ভয় হয়। মনে হয় সমস্ত প্রজলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এমনি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয়, এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা, ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত? কি বললি—হয় নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিস্‌নি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম!

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্রিরে যে বলেছিলুম। রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাকবে কি ক'রে? রোগা বাপ খাক্‌ আর নাই খাক্‌, বুড়ো মেয়ে চারবার পাঁচবার করে ভাত গিলবি! এবার থেকে চাল আমি কুলুপ-বন্ধ ক'রে বাইরে যাবো। দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্‌, তাও নেই!

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস্‌ কি? এত লোকে মরে, তুই মরিস্‌নে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে কেবল সে-ই জানে। তাহার মনে পড়িল, তাহার এই স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান-কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দু'বেলা অন্ন জুটে না। কোন দিন একবেলা, কোন দিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয় বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে, তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু'একটা গর্ত খুঁড়িয়া যা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি, তেমনি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পরে ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না। কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস্‌ ?

গফুর তিক্ত-কণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন ?

বাবুমশায় ডাকচেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া-দাওয়া হয়নি, পরে যাবো।

এত বড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল ; সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে, অত ক্ষীণ-কণ্ঠে অত বড় কানে গিয়া পৌঁছায় না—না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পর কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঘণ্টাখানিক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয় ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছে। পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এত বড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্ত-কণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যত দূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল!

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্ণিমেষ-চক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চকচকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

পাড়ার লোক কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই—সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আব্রু থাকে না, এ কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস্‌নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল। গফুর নিষেধ করিল, ও সব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশী সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।

রাজশেখর বসু (পরশুরাম)

……

চিকিৎসা-সঙ্কট

সন্ধ্যা হব-হব। নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার হইতে ট্রামে বাড়ী ফিরিতেছেন। বীডন ষ্ট্রীট পার হইয়া গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সম্মুখে গরুর গাড়ী। আর একটু গেলেই নন্দবাবুর বাড়ির মোড়। এমন সময় দেখিলেন পাশের একটি গলি হইতে তাঁর বন্ধু বঙ্কু বাহির হইতেছেন। নন্দবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন—'দাঁড়াও হে বঙ্কু, আমি নাবচি।' নন্দর দু-বগলে দুই বাণ্ডিল, ব্যস্ত হইয়া চলন্ত গাড়ি হইতে যেমন নামিবেন, অমনি কোঁচায় পা বাধিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

গাড়িতে একটা সোরগোল উঠিল এবং ঘ্যাচাং করিয়া গাড়ি থামিল। জনকতক যাত্রী নামিয়া নন্দকে ধরিয়া তুলিলেন। যাঁরা গাড়ির মধ্যে ছিলেন, তাঁরা গলা বাড়াইয়া নানা প্রকারে সহানুভূতি জানাইতে লাগিলেন। —'আহা হা বড্ড লেগেচে—থোড়া গরম দুধ পিলা দোও—দুটো পা-ই কি কাটা গেচে?' একজন সিদ্ধান্ত করিল মৃগি। আর একজন বলিল ভির্মি। কেউ বলিল মাতাল, কেউ বলিল বাঙ্গাল, কেউ বলিল পাড়াগাঁয়ের ভূত।

বাস্তবিক নন্দবাবুর মোটেই আঘাত লাগে নাই। কিন্তু কে তা শোনে। 'লাগেনি কি মশায়, খুব লেগেচে—দু-মাসের ধাক্কা—বাড়ি গিয়ে টের পাবেন।' নন্দ বার-বার করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে, প্রকৃতই তাঁর কিছু মাত্র চোট লাগে নাই। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন—'আরে মোলো, ভাল করলে মন্দ হয়। পষ্ট দেখলুম লেগেচে তবু বলে লাগেনি।'

এমন সময় বঙ্কুবাবু আসিয়া পড়ায় নন্দবাবু পরিত্রাণ পাইলেন, মনঃক্ষুণ্ণ যাত্রিগণসহ ট্রাম গাড়িও ছাড়িয়া গেল।

বঙ্কু বলিলেন—'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল আর কি। যা হোক, বাড়ির পথটুকু আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। এই রিক্‌শা—'

রিকশা নন্দবাবুকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল, বঙ্কু পিছনে হাঁটিয়া চলিলেন।

নন্দবাবুর বয়স চল্লিশ, শ্যামবর্ণ, বেঁটে গোলগাল চেহারা। তাঁর পিতা পশ্চিমে কমিশারিয়েট চাকরি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান নন্দর জন্য কলিকাতায় একটি বড় বাড়ি, বিস্তর আসবাব এবং মস্ত এক গোছা কোম্পানির কাগজ রাখিয়া যান। নন্দর বিবাহ অল্পবয়সেই হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি বিপত্নীক হন এবং তারপর আর বিবাহ করেন নাই। মাতা বহুদিন মৃতা, বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধা পিসী। তিনি ঠাকুর-সেবা লইয়া বিব্রত, সংসারের কাজ ঝি-চাকররাই দেখে। নন্দবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। প্রধান কারণ—আলস্য। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ, রেস এবং বন্ধুবর্গের সংসর্গ—ইহাতে নির্বিবাদে দিন কাটিয়া যায়, বিবাহের ফুরসৎ কোথা? তারপর ক্রমেই বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, আর এখন না করাই ভাল। মোটের উপর নন্দ নিরীহ গোবেচারী অল্পবাষী উদ্যমহীন আরামপ্রিয় লোক।

নন্দবাবুর বাড়ির নীচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য-আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু ক্লান্ত বোধ করিতেছেন; সেজন্য বালাপোষ গায়ে দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের চা এবং পাঁপরভাজা শেষ হইয়াছে, এখন পান সিগারেট এবং গল্প চলিতেছে।

গুপীবাবু বলিতেছিলেন—'উহু। শরীরের ওপর অত অযত্ন কোরো না নন্দ। এই শীতকালে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।'

নন্দ। মাথা ঠিক ঘোরেনি, কেবল কোঁচার কাপড় বেধে—

গোপী। আরে না, না। ঘুরেছিল বইকি। শরীরটা কাহিল হয়েচে। এই ত কাছাকাছি ডাক্তার তফাদার রয়েছেন। অত বড়

ফিজিশিয়ান আর শহরে পাবে কোথা ? যাও না কাল সকালে একবার তাঁর কাছে।

বন্ধু বলিলেন—'আমার মতে একবার নেপালবাবুকে দেখাইলে ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ আর দুটি নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে, কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ।'

যষ্ঠিবাবু মুড়িশুড়ি দিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। তাঁর মাথায় বালাক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি এবং তার উপর কম্ফর্টার। বলিলেন—'বাপ, এই শীতে অবেলায় কখনো ট্রামে চড়ে ? শরীর অসাড় হ'য়ে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।'

নিধু বলিল—'নন্‌দা, মোটা চাল ছাড়। সেই এক বিরিঞ্চির আমোলের ফরাস তাকিয়া, লক্কড় পাল্কি গাড়ি আর পক্ষীরাজ ঘোড়া, এতে গায়ে গত্তি লাগবে কিসে ? তোমার পয়হার অভাব কি বাওয়া ? একটু ফূর্তি করতে শেখ।'

সাব্যস্ত হইল কাল সকালে নন্দবাবু ডাক্তার তফাদারের বাড়ি যাইবেন।

ডাক্তার তফাদার M. D. M. R. A. S. গ্রে ষ্ট্রীটে থাকেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, দু-খানা মোটর, একটা ল্যাণ্ড। খুব পসার, রোগীরা ডাকিয়া সহজে পায় না। দেড় ঘণ্টা পাশের কামরায় অপেক্ষা করার পর নন্দবাবুর ডাক পড়িল। ডাক্তার-সাহেবের ঘরে গিয়া দেখিলেন এখনো একটি রোগীর পরীক্ষা চলিতেছে। একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারী নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ফিতা দিয়া তাহার ভুঁড়ির পরিধি মাপিয়া বলিলেন -'বস্‌, সওয়া ইঞ্চি বড় গিয়া।' রোগী খুশী হইয়া বলিল - 'নবজ্‌ তো দেখিয়ে।' ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে নাড়ীর উপর একটি মোটর-কারের স্পার্কিং প্লগ ঠেকাইয়া বলিলেন—'বহুৎ মজেসে চল্‌ রহা।' রোগী বলিল- 'জবান ত দেখিয়ে।' রোগী হাঁ করিল, ডাক্তার ঘরের অপর দিকে দাঁড়াইয়া অপেরা গ্লাস দ্বারা তাহার জিভ দেখিয়া বলিলেন - 'থোড়েসি কসর হায়। কল্ ফিন্ আনা।'

রোগী চলিয়া গেলে তফাদার নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ওয়েল ?'

নন্দ বলিলেন—'আজ্ঞে বড় বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে এসেচি। কাল হঠাৎ ট্রামে থেকে—'

তফাদার। কম্পাউণ্ড ফ্রাক্‌চার? হাড় ভেঙেচে?

নন্দবাবু আনুপূর্বিক তাঁর অবস্থা বর্ণনা করিলেন। বেদনা নাই, জ্বর হয় না, পেটের অসুখ, সর্দি, হাঁপানি নাই। ক্ষুধা কাল হইতে একটু কমিয়াছে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে বড় আতঙ্ক।

ডাক্তার তাঁহার বুক পেট মাথা হাত পা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'জিভ দেখি।' নন্দবাবু জিভ বাহির করিলেন।

ডাক্তার ক্ষণকাল মুখ বাঁকাইয়া কলম ধরিলেন। প্রেস্‌ক্রিপশন লেখা শেষ হইলে নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনি এখন জিভ টেনে নিতে পারেন। এই ওষুধ রোজ তিনবার খাবেন।'

নন্দ। কি রকম বুঝচেন?

তফাদার। 'ভেরি ব্যাড।'

নন্দ সভয়ে বলিলেন—'কি হয়েছে?'

তফাদার। আরো দিন-কতক ওয়াচ না করলে ঠিক বলা যায় না। তবে সন্দেহ করচি cerebral tumour with strangulated ganglia। ট্রিফাইন্ ক'রে মাথার খুলি ফুটো ক'রে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে।

নন্দ। বাঁচব ত?

তফাদার। দ'মে যাবেন না, তা হ'লে সারাতে পারবো না। সাতদিন পরে ফের আসবেন। মাই ফ্রেণ্ড মেজর গোঁসাই-এর সঙ্গে একটা কন্‌সল্‌টেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত-ডাল বড় একটা খাবেন না। এগ ফ্লিপ্, বোনম্যারো, সুপ, চিকেন ষ্টু, এই-সব। বিকেলে একটু বর্গণ্ডি খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হ্যাঁ, বত্রিশ টাকা। থ্যাঙ্ক ইউ।

নন্দবাবু কম্পিত পদে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাবেলা বঙ্কুবাবু বলিলেন—'আরে তখনি আমি বারণ করেছিলুম ওর কাছে যেও না। ব্যাটা মেড়োর পেটে হাত বুলিয়ে খায়। এঁঃ, খুলির ওপর তুরপুন চালাবেন।'

ষষ্ঠিবাবু। আমাদের পাড়ার তারিণী কবিরাজকে দেখালে হয় না?

গুপীবাবু। না না, যদি বাস্তবিক নন্দর মাথার ভেতর উলট-পালট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে হাতুড়ে বদ্দির কম্ম নয়। হোমিওপ্যাথিই ভাল।

নিধু। আমার কথা ত শুনবে না বাওয়া। ডাক্তারি তোমার ধাতে না সয় ত একটু কোবরেজি করতে শেখ। দরওয়ানজী দিব্বি একলোটা বানিয়েচে। বল ত একটু চেয়ে আনি।

হোমিওপ্যাথিই স্থির হইল।

পরদিন খুব ভোরে নন্দবাবু নেপাল ডাক্তারের বাড়ি আসিলেন। রোগীর ভিড় তখনও আরম্ভ হয় নাই, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর ডাক পড়িল। একটি প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতা। চারিদিকে স্তূপাকারে বহি সাজানো। বহির দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শেয়ালের মত বৃদ্ধ নেপালবাবু বসিয়া আছেন। মুখে গড়গড়ার নল, ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপাল ডাক্তার কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'বসবার জায়গা আছে।' নন্দ বসিলেন।

নেপাল। শ্বাস উঠেচে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রুগীর শেষ অবস্থা না হ'লে ত আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করচি।

নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তিনিই রোগী।

নেপাল। ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েচে কি?

নন্দবাবু তাঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন।

নেপাল। তফাদার কি বলেচে?

নন্দ। বললেন আমার মাথায় টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জানো? গোবর। আর টুপির ভেতর শিং, জুতোর ভেতর খুর, পাৎলুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়?

নন্দ। দু-দিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয়?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে?

নন্দ। কাল সন্ধ্যে বেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল। না ডান দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন—"ঠিক ক'রে বল।"

নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মধ্যিখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায়?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটরভাজা এনেছিল তাই খেয়ে—

নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—"হাঁচোড়-পাঁচোড় করে।"

ডাক্তার কয়েকটি মোটা মোটা বহি দেখিলেন, তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"হুঁ। একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে এলোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুনে ব্যাটারা দু-গ্রেন কুইনিন দিয়েছিল, এখনো বিকেলে মাথা টিপ টিপ করে। সাতদিন পরে ফের এস। তখন আসল চিকিৎসা শুরু হবে।"

নন্দ। ব্যারামটা কি আন্দাজ করচেন?

ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—"তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরুবে নাকি? যদি বলি তোমার পেটে differential calculus হয়েচে, কিছু বুঝবে? ভাত খাবে না, দু-বেলা রুটি, মাছ-মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের যুষ, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার, তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবচো আমার আলমারির ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সেই ভয় নেই, আমার তামাকে সলফর-থার্টি মেশানো থাকে। ফী কত তাও ব'লে দিতে হবে নাকি? দেখচো না

দেওয়ালে নোটিস লট্‌কানো রয়েছে বত্রিশ টাকা? আর ওষুধের দাম চার টাকা।"

নন্দবাবু টাকা দিয়া বিদায় হইলেন।

নিধু বলিল—'কেন বাওয়া কাঁচা পয়হা নষ্ট করচ? থাকলে পাঁচ রাত বক্সে ব'সে থিয়েটার দেখা চল্‌ত। ও নেপাল-বুড়ো মস্ত ঘুঘু, নন্‌-দাকে ভালমানুষ পেয়ে জেরা ক'রে থ ক'রে দিয়েচে। পড়্‌ত আমার পাল্লায় বাছাধন, কত বড় হোমিওফাঁক দেখে নিতুম। এক চুমুকে তার আলমারি-সুদ্ধ ওষুধ সাব্‌ড়ে না দিতে পারি ত আমার নাক কেটে দিও।'

গুপী। আজ আপিসে শুনছিলুম কে একজন বড় হাকিম ফরকাবাদ থেকে এখানে এসেচে। খুব নামডাক, রাজা-মহারাজারা সব চিকিৎসা করাচ্চে। একবার দেখালে হয় না।

ষষ্ঠি। এই শীতে হাকিমী ওষুধ? বাপ্‌, সরবৎ খাইয়েই মারবে। তার চেয়ে তারিণী কোবরেজ ভাল।

অতঃপর কবিরাজী চিকিৎসাই সাব্যস্ত হইল।

পরদিন সকালে নন্দবাবু তারিণী কবিরাজের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাড়ি-গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া আট-হাতি ধুতি পরিয়া একটি চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এই অবস্থাতেই ইনি প্রত্যহ রোগী দেখেন। ঘরে একটি তক্তাপোষে তাহার উপর তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মলিন তাকিয়া। দেওয়ালের কোলে দুটি ঔষধের আলমারি।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া তক্তাপোষে বসিলে কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবুর কন্‌থে আসা হচ্ছে?' নন্দবাবু নিজের নাম ও ঠিকানা বলিলেন।

তারিণী। রুগীর ব্যামো ডা কি?

নন্দবাবু জানাইলেন তিনিই রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিব্রত করিলেন।

তারিণী। মাথার খুলি ছেঁদা ক'রে দিয়েচে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপালবাবু বললেন পাথুরি, তাই আর মাথায় অস্তর করাইনি।

তারিণী। নেপাল? সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরাবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M. B. F. T. S. —মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ, হ্যাপ্‌লা, তাই কও। সেডা আবার ডাকদর হ'ল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাক্‌তি ছেলে-ছোকড়ার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বললেন ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্র-চিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। যস্তিবাবু-রি চেন? খুলনের উকিল যস্তিবাবু? নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিভিল সার্জন পা কাটলে। তিনদিন অচৈতন্যি। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক্ তারিণী-স্যানরে। দেলাম ঠুকে এক দলা চ্যবনপ্রাশ। তারপর কি হ'ল কও দিকি?

নন্দ। আবার পা গজিয়েচে বুঝি?

'ওরে অ ক্যাব্‌লা, দেখ্‌, দেখ্‌, বিড়েলে সব্‌ডা ছাগলাদ্য ঘেত খেয়ে গেল'—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন—'হ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারি ব্যামো হয়েছিল কখনো?'

নন্দ। অনেক দিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেচি। পাঁচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হ'ল।

তারিণী। একই কথা, পাঁচ দেরা সারে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, জান্‌তি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

তারিণী। হবেই না ত। উর্দ্ধ্‌ হয়েচে কি না। দাত কন্‌কন্ করে ?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। করে, জান্‌তি পার না। যা হোক, তুমি চিন্তা কোরোনি বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্চি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারি হইতে একটা শিশি বাহির করিলেন এবং তাহার মধ্যস্থিত বড়ির উদ্দেশে বলিলেন—'লাফাস নে, থাম্‌, থাম্‌। আমার সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাক্‌লি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল-সন্ধ্যি একটা করি খাবা! আবার তিন দিন পরে আস্‌বা। বুজেচ ?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

তারিণী। ছাই বুজেচ। অনুপান দিতি হবে না? ট্যাবা লেবুর রস আর মধুর সাথি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না! ওলসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ এই-সব খাবা। নুন ছোবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চ্যানি দিয়ে রাঁধি খাতি পার। গরম জল ঠাণ্ডা করি খাবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি ?

তারিণী। যারে কয় উদ্‌রি। উদ্ধ্‌শ্লেষ্মাও কইতি পার!

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্ষ চিত্তে বিদায় হইলেন।

নিধু বলিল—'কি দাদা, কোব্‌রেজির সাধ মিটলো ?'

গুপী। নাঃ, এ-সব বাজে চিকিৎসার কাজ নয়। কোথাও চেঞ্জে চল।

বঙ্কু। আমি বলি কি, নন্দ বে-থা ক'রে ঘরে পরিবার আনুক। এ-রকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।

নন্দ চিঁ চিঁ রবে বলিলেন—'আর পরিবার। কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নেই। এই বয়সে একটা কচি বউ এনে মিথ্যে জঞ্জাল জোটানো।'

নিধু বলিল—'নন্‌-দা, একটা মটোর কেনো মাইরি। দু-দিন হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হড্‌সন; ষেটের কোলে আমরাও ত পাঁচজন আছি।'

ষষ্ঠী। তা যদি বললে, তবে আমার মতে মোটর-কারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা, কিন্তু মেরামতী খরচ যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাটলো, কাল গিন্নির অম্বলশূল, পরশু ব্যাটারি খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। অমন কাজ কোরো না নন্দ। জেরবার হবে। এই শীতকালে কোথা দু-দণ্ড লেপের মধ্যে ঘুমুব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যান্ প্যান্ ট্যাঁ ট্যাঁ!

নিধু। ষষ্ঠি খুড়ো যে রকম হিসেবী লোক, একটি মোটাসোটা রোঁ-ওলা ভল্লুকের মেয়ে বে করলে ভাল করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত।

গুপী। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। কাল সকালে নন্দ একবার হাকিম সাহেবের কাছে যাও। তারপর যা হয় করা যাবে।

নন্দবাবু অগত্যা রাজী হইলেন।

হাজিক-উল-মুল্‌ক্ বিন লোকমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল হকিম য়ুনানী লোয়ার চিৎপুর রোডে বাসা লইয়াছেন। নন্দবাবু তেতলায় উঠিলে একজন লুঙ্গিপরা ফেজ-ধারী লোক তাঁকে বলিল—'আসেন বাবু-মশয়। আমি হাকিম সাহেবের মীরমুন্সী। কি বেমারী বলেন, আমি লিখে হুজুরকে ইতালা ভেজিয়ে দিব।'

নন্দ। বেমারি কি সেটা জানতেই ত আসা বাপু।

মুন্সী। তব্‌ ভি কুছু ত বোলেন। না-তাক্‌তি, বুখার, পিল্লি, চেচক, ঘেঘ, বাওয়াসির, রাত-অন্ধি—

নন্দ। ও-সব কিছু বুঝলুম না বাপু। আমার প্রাণটা ধড়ফড় করচে।

মুন্সী। সো হি বোলেন। দিল্ তড়প্‌না। মোহর এনেছেন?

নন্দ। মোহর?

মুন্সী। হাকিম সাহেব চাঁদি ছোন না। নজরানা দো মোহর। না থাকে হামি দিচ্চি। পয়তালিশ টাকা, আর বাট্টা দো টাকা, আর রেশমী রুমাল দো টাকা। দরবারে যেয়ে আগে হুজুরকে বন্দ্‌গি জনাব বোলবেন, তারপর রুমালের ওপর মোহর রেখে সামনে ধরবেন।

মুন্সী নন্দবাবুকে তালিম দিয়া দরবারে লইয়া গেল। একটি বৃহৎ

ঘরে গালিচা পাতা, একপার্শ্বে মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া হাকিম সাহেব ফরসিতে ধূমপান করিতেছেন। বয়স পঞ্চান্ন, বাব্‌রী চুল, গোঁফ খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। আবক্ষলম্বিত দাড়ির গোড়ার দিক সাদা, মধ্যে লাল, ডগায় নীল। পরিধান সার্টিনের চুড়িদার ইজার, কিংখাপের জোব্বা, জরির তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসব্বর এবং রুমী মস্তগি জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। চার-পাঁচজন পারিষদ্‌ হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আছে এবং হাকিমের প্রতি কথায় 'কেরামৎ' বলিতেছে। ঘরের কোণে একজন ঝাঁকড়া-চুলো চাপ-দেড়ে লোক সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং এবং বিকট অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।

নন্দবাবু অভিবাদন করিয়া মোহর নজর দিলেন। হাকিম ঈষৎ হাসিয়া আতরদান হইতে কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নন্দর কানে গুঁজিয়া দিলেন। মুন্সী বলিল—"আপনি বাংলায় বাতচিত বোলেন। হামি হুজুরকে সম্‌ঝিয়ে দিব।"

নন্দবাবুর ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হাকিম ঋষভকণ্ঠে বলিলেন—"শির লাও।"

নন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। মুন্সী আশ্বাস দিয়া বলিল—"ডর্‌বেন না মশয়। জনাবকে আপনার মাথা দেখ্‌লান।"

নন্দর মাথা টিপিয়া হাকিম বলিলেন—"হড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া।"

মুন্সী। শুনছেন? মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়ে গেছে।

হাকিম তিনরঙা দাড়িতে আঙুল চালাইয়া বলিলেন—"সুর্মা সুর্খ্‌।"

একজন একটা লাল গুঁড়া নন্দর চোখের পল্লবে লাগাইয়া দিল। মুন্সী বুঝাইল—"আঁখ ঠাণ্ডা থাকবে, নিদ হোবে।" হাকিম আবার বলিলেন—'রোগন্‌ বব্বর।" মুন্সী হাঁকিল—'এ জি বাল্‌বর, অস্তরা লাও।'

নন্দবাবু 'হাঁ-হাঁ আরে তুম্‌ করো কি'—বলিতে বলিতে নাপিত চট্‌ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মতালুর উপর দু-ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার উপর একটা দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল। মুন্সী বলিল, "ঘব্‌ড়ান কেন মশয়, এ হচ্ছে বব্বরী সিংগীর মাথার ঘি। বহুৎ কিম্মৎ। মাথার হাড্ডি শকৎ হোবে।"

নন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুন্সী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল—"আমার দস্তরি ?" নন্দ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া তিন লাফে নীচে নামিয়া গাড়িতে উঠিয়া কোচমানকে বলিলেন—"হাঁকাও।"

সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। চাকর বলিল, বাবুর বড় অসুখ, দেখা হবে না। সকলে বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঁই মাচা

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক-খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার-কাটি পুরিয়া দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমান তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে, ব'সে রইলে যে? —দাও না একটা ঘটি? আঃ ক্ষেন্তি টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যহতি পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন—কেন—কি আবার—কি—

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্তস্বরে বলিলেন—দেখ, রঙ্গ কোরো না বল্‌ছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জাননা, কি খোঁজ রাখ না? অতবড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ?—কি গুজব ?

—কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাগ্দী দুলেপাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দর লোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।—সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ স্বরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না—ও নাকি উচ্ছুগগু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে, দুলে-বাড়ী, বাগ্দী-বাড়ী উঠে ব'সে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার! একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর! ও!

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি?—আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠলো। ……হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই? পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?—

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার স্বর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটী উঠাইয়া লইয়া খিড়কী-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এ-সব কি রে? ক্ষেন্তি-মা, এ-সব কোথা থেকে আন্‌লি? ওঃ? এযে—

চোদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলির মোটা ও হল্‌দে হল্‌দে চেহারা দেখিয়া মনে হয়, কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই তিন পাকা পুঁই পাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছানো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেপটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকান। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর-দিনকার দরুন দু'টো পয়সা বাকী আছে, আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায়-কাকা বললে, নিয়ে যা···কেমন মোটা মোটা···

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁঝের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আহা কি অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে—পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত, নিয়ে যা··· আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হল না···যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে···ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ পাড়া সে পাড়া ক'রে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?—কোথায় শাক কোথায় বেগুন, আর-একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাশ—ফেল্ বলছি ওসব—ফেল।

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিল, পুঁই শাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন– যা তো রাধী ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো—যা ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো···

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।—সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে—তুমি আবার—বরং—

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর এক পাড়ায় নিয়ে আস্‌বে দুটো পাকা পুঁই শাক ভিক্ষে ক'রে? যা, যা······তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয়······

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না—নিঃশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন······

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের?···

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী-দোরের আশে পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া

আসিলেন—বাকীগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারে ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুঁচো চিংড়ি দিয়া একরূপ চুপিচুপিই পুঁই শাকের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁই শাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিক ওদিক ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের এক টুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁই শাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীমায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে—স্বঘর নৈলে পাত্র দেবে না, স্বঘর নৈলে পাত্র দেবে না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধ'রে প'ড়ে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তারা কি স্বঘর? রাম বল ছ' সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়! পরে স্বর নরম করিয়া বলিলেন—তা সমাজের সে সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের······

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয়···

······আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে? আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকী

এই তো? সমাজে ব'সে এ সব কাজগুলি তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।…পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?……গরীব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ-মেজেষ্টর না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী, বাগান, পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল। দুই ভাইয়ের অভাব কি?……

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুই পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েকমাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী-লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল…।

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন—যা, শীগ্গির শাবলখানা নিয়ে আয় দেখি? কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে

জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপর পিতাপুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল - ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।……

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন—মুখুয্যে-বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল—খুড়িমা মা ব'লে দিলে খুড়িমাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নট মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে ?

মুখুয্যে-বাড়ী ও পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচাল্‌তা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হল্‌দে পাখী আমড়া গাছের এ ডাল হইতে ও ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল - খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা! - পাখী দেখিতে গিয়া - অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ খুপ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল—কে যেন কি খুঁড়িতেছে…দুর্গার কথার পরেই সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা খানিকদূরে যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ খুপ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—এখনও নাইতে যাস্‌নি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই মা, এক্ষণি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে--কর্তা ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধূলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু করে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে খানিক আগে কি করছিলে শুনি ?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন আমি ! না আমি কখন ? কক্ষণো না, এই ত আমি···সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এই মাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না।······আমি সব জানি, মনে ভেবেছিলে আপদ্ ঘাটে গিয়েছে আর কি···দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কিসের খুপ খুপ শব্দ···তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিক দূর গেলাম আবার দেখি শব্দ···তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে যা ইচ্ছে কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে ?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলো প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন ; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও যোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলোর মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না···।

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহ মুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো—শুনে যা···

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্ততঃ করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস,···না ?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটু খানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশ-ঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল, তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস্ না যে বড় ? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না।

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, উত্তর দিল হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙ্‌ব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছ মেটে আলু চুরি করতে ? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই এক গলা বিজন বন, তার মধ্যে দিন-দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্য থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে ? যদি গোঁসাইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয় ? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত ? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব—তা ব'লে পরের জিনিসে হাত ? এ-মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা ?

দু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস।

অন্নপূর্ণা গিয়ে দেখিলেন ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারীর আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসী হইয়া-যাওয়া আসামীর মতন ঊর্ধ্বমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তার বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে—দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন—দূর পাগলী, এখন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে?

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে? আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

পৌষ-সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতেছিলেন—একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্র-সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল—মা, ঐ একটু······

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু লক্ষ্মীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাত-খানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল—'মা, আমায় একটু'···

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি, ঐ নারকেল-থালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।···ক্ষেন্তি ক্ষিপ্রহস্তে নারিকেলের উপরের থালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল, সুরেশ-কাকাকে আর ও পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও বেলা ত পায়েস, ঝোল, পুলি, মুগতক্তি, এই সব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল—হঁা মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেদী বলছিল, ক্ষীরের পূর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে?

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল,—খেঁদির ওই সব কথা। তোদের মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে। ওমা, কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ, আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়।

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐ দিকে যা।

ক্ষেন্তি নারিকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ-স্বরূপ হয় তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক-এক টুক্‌রো পাতা পেতে বোস তো দেখি? গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জলদেওয়া ভাত আছে ও বেলার, বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই সেজো মেয়ে রাধী আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অনেক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন সে কম করিয়াও আঠারো উনিশ খানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি, আর নিবি?···ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ খেতে হয়েছে, মা! ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু···সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজন পটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালমানুষ, কাজ কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টু শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি···

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশী কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সীলেট-চুণ ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু' পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এইজন্যে বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারে নীল রং-এর মেঁদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা-চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।—তাঁর এই অত্যন্ত আগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তার বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?···

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত···তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলবে—মা বল্‌ব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি?···

এক বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন--ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু-সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—নাঃ, সব তো আর······তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। ········তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ ছ'টি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুন্‌লাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও!

—একেবারে চামার···

—তারপর বল্‌লাম টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না, ভেবে দেখলাম কি না? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে···ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায়···আরও কত কি! পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?···

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে। শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!'······পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন —বলি আমরা ছোট লোক কি বড় লোক, তোমার তো সরকার-খুড়ো জানতে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি··· প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বার-কতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে

ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে……

—দেখতে পাওনি ?

—নাঃ! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ-অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ……যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল। ………চার কি ঠিক করলে ? ………পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না। ………

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাক্‌লি পিঠের জন্যে চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন ?

পুঁটি বলিল—আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না ?

—ওমা, দেখ না, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলেছে, এখুনি ধ'রে উঠবে…

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—স'রে এসে বোস না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না ? এই দিকে আয়!

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল… …খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপাইয়া ধরিলেন……দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল। …

পুঁটি বলিল—মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কাঁনাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠিকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।…

পুঁটি ও রাধী খিড়কী-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুক্‌নো পাতায় খস্‌ খস্‌ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠে খানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলে-মানুষ পিছু হঁাটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল···।

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি?

পুঁটি বলিল—হঁ্যা মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম।

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে···রাত তখন খুব বেশী। জ্যোৎস্নার আলোর বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্‌-র্‌-র-র শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে···দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত···

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিন জনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল—যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে···বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে—সুপুষ্ট নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!······

মাহাবুব উল আলম

……………………………………………………………………

আবহাওয়া

কমল ঘরামীকে দেখিতে পারি না। মুখটার জিরান নাই, হরদম বকর-বকর চলিয়াছে। কত শাসন করি!--তবু বলি, বড় বাধ্য সে। যেই ডাক-গিরি করি, কমল অম্‌নি চুপ করে। কিন্তু কেমন যে স্বভাব, কখন নিজের অজ্ঞাতেই আবার ‘বকর-বকর’ শুরু করিয়া দেয়—হয় হাতের হাতিয়ারের সহিত, নয় বাঁশ-গাছের সহিত, নয় আমার শিশু ছেলেটির সহিত। সহকর্মী নবীন ওকে শাসায়, তখন চম্‌কে আবার চুপ করে। আমি ভাবি মুদ্রা-দোষ! মন জিজ্ঞাসা করে—কখন হইতে এ মুদ্রা-দোষের আরম্ভ।

বকর-বকর করিতে করিতে কাজের উপর হইতে কমলের মনোযোগ ছুটিয়া যায়। আমার কাজের ক্ষতি হয়। তাই তাহাকে দেখিতে পারি না। তবুও ভবিষ্যতের যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে কমলকে যে আমার কাজ হইতে কখনও বিদায় দিব এরূপ মনে হয় না। হয়ত সে বাধ্য বলিয়া তাহার প্রতি মনের এই পক্ষপাতিত্ব, নয়ত আর-কিছু।

কমল যেদিন প্রথম কাজ করিতে আসে সেদিন ঘোড়ার মতো একটা লম্বা নাক ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে নাই। পরে নজরে আসিল তাহার ‘বকর-বকর’ স্বভাব। উহা তাহার প্রতি আমাকে চটাইয়া রাখিল।

ওদিকে প্রথম দেখাতেই টের পাইলাম যে, নবীন কাজের লোক বটে, নীরবে কাজ করিয়া যায়। কোথাও এক তিল ফাঁকি নাই। তাহার প্রতি খুশী না হইয়া পারি!

কমল ও নবীন কাজ করে। আমি সাম্‌নে বসিয়া তদারক করি। আমাদের সম্পর্ক হইতেছে কাজের। চুপ-চাপ বসিয়া থাকিলেও নবীন

ও আমার মধ্যে বেশ একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। আমি প্রতি বেলায় কতটা কাজ আশা করি, নবীন তাহা আপন মনেই বুঝিতে পারে। সে উহা একবিন্দুও কম হইতে দেয় না এবং যাহা করে ভালো করিয়াই করে। কমল ইহার কোনই ধার ধারে না। বকর-বকর চালাইতে পারিলেই বাঁচে। যখন বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হয় তখন তাহার মুখটা এত গুরু-গম্ভীর দেখায় যে, মনে মনে না হাসিয়া পারি না।

একেই ত কমলের দা'য়ের অভিযোগ, বাঁশ কাঁচা হওয়ার অভিযোগ, ঘরে চাল না রাখার অভিযোগ, বৌয়ের পিঠে কাপড় না থাকার অভিযোগ—সম্ভব অসম্ভব একশ' রকমের অভিযোগ থাকে, তার উপর পরের দিন হইতে অভিযোগের নূতন কারণ দেখা দিল 'ছোট মিয়া' অর্থাৎ ছোট খোকা। একেই কমল অকেজো ও বেগোছাল বলিয়া আমার ধারণা, তার উপর আবার অকর্মণ্যতা ও বেগোছাল ভাব ষোল আনা ধরাইয়া দিবার জন্যই যেন ছোট খোকা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। কমল বাঁধটি দিয়া যখন বাড়তি বেত কাটিতে দা'য়ের জন্য হাত বাড়ায়, তখন দেখে দা'খানি পাশে নাই। ছোট খোকা অদূরে তাহা দিয়া একাগ্র মনে মাটি কোপাইতেছে। কমল যখন তামাক সাজিতে যায়, দেখে দেশলাইটি যথাস্থানে নাই; তল্লাস করিয়া বাক্সটি পায় পুকুর ঘাটে, ভিজা অবস্থায়, খালি। কাঠি-গুলো কিছু ঘাটে ছড়ানো, কিছু পুকুরের জলে ভাসিতেছে। কাঠিগুলি কুড়াইয়া রোদে শুকাইয়া লইতে কমলের একটি ঘণ্টা যায়। কমল যখন বাড়ী ফিরিবে, দেখে গায়ের ছাড়া কোর্তাটিতে মাটি বাঁধিয়া ছোট খোকা উঠানময় টানিয়া বেড়াইতেছে। কমলকে দেখিয়া অন্দরে পলাইয়া যায়। কমল ঢেলা খুলিয়া কোর্তাটি ঝাড়িয়া লয়। দিন-শেষের পুরস্কারের ন্যায় ময়লা কোর্তাটিকে হাসিমুখে কাঁধে ফেলিয়া লম্বা কদমে বাড়ী চলিয়া যায়।

কমল ও ছোট খোকার মধ্যে সম্পর্ক ইহার বেশী দূর গড়াইল না। না কমল খোকাকে কোলে করিল, না খোকা গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত দুর্বোধ্য ভাষায় আলাপ জমাইল। আমার কড়া দৃষ্টির ফল হইতে পারে। কমলকে খোকার উৎপাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আমি তাহার দা, তামাকের সরঞ্জাম ও ছাড়া কাপড় প্রভৃতি রাখার জন্য বিশেষ স্থান

দেখাইয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতে কাজ হইল না। একদিকে কমলের ভুল হইতে লাগিল বেশী, অপর দিকে খোকার আঁচও নিভুর্ল হইয়া উঠিল সে পরিমাণে।

নূতন উপায় চিন্তা করিতেছি, ইহারই মধ্যে একদিন মনে হইল যে, উহার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, দেখিতে পাইলাম, নীরবতার ভিতর দিয়াও উহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। খোকার দৌরাত্ম্য যে কমলের শুধু প্রীতিকর তাহা নহে, বরং সে যেন উহারই আশায় থাকে ! আর উহারই আশায় থাকিয়া যে সময়টা যায় উহার ভিতর কমল পূর্বের ন্যায় আর বকর-বকর করে না। পূর্বাপেক্ষা গোছালভাবে কাজ করে। এ যেন একই জিনিস আপ্‌সে উভয়ে ব্যবহার করিতেছে। খোকা যখন দা লইয়া যায়, কমল দ্বিরুক্তি না করিয়া অপর কাজে হাত দেয়। কমলের যখন কাজ শেষ হইয়া আসে, খোকা পূর্ব হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়া মাটি টানা ছাড়িয়া কমলের কোর্তাটি যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। কমল হাসিমুখে খোকার দিকে চায়। খোকাও এক মুখ হাসি ছড়াইয়া অন্দরে পলাইয়া যায়।

এক সময় নবীনও যে কাজ করিতেছে সে-কথা আমি ভুলিয়াই গেলাম। সেটা—ঘরের যখন খোকার অংশটা নির্মাণ হইতেছে, কমলের তখন উৎসাহের সীমা ছিল না। সে এমন নিখুঁত নক্সা অনর্গল দিতে লাগিল যে, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। এই খেই-হারা লোকটির কোন্ খাদটায় যে এত সব কল্পনা জট পাকাইয়াছিল, তাহা কে জানে! উৎসাহের আতিশয্যে, কাজের প্রতি একাগ্রতায় এ কয়দিন খোকাও পেছনে পড়িয়া রহিল। আমার সহিত কমলের সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া উঠিল। এ কয়দিন কমল যাহা করিল, তাহা আমার মনঃপূত হইল না। নবীনটা যে কাজ করিতেছে, সবই যেন উদ্দেশ্যহীন মনে হইল।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"কমল ! তোমার কয় ছেলে ?"

কমল এক ঝলক জ্যোতি আমার মুখের উপর ছড়াইয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে, একছেলে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত বয়স ?"

সে হিসাব না করিয়াই উত্তর দিল—"আজ, ৮ বৎসর ৩ মাস ২৩ দিন।"

ভাবিলাম, পিতা বটে! ছেলের বয়সের মাস দিন পর্যন্ত হিসাব করিয়া রাখিয়াছে। হবেও বা! একটি মাত্র ছেলে কি না!

তারপর বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় কয়দিন কাজের এমন তাড়াহুড়া লাগিয়া গেল যে, ছোট খোকার কথা একরূপ ভুলিয়াই গেলাম। বড় সেনাপতির ন্যায় নবীন যেন একাই একশ' জন হইয়া উঠিল। কোন কথাই হইল না! তবুও এটা পরিষ্কার মনে হইতে লাগিল যে, ভিটা যদি ভিজে তবে সে দায়িত্ব হইবে নবীনের। নবীনও তাহার আড়ষ্ট ভাব কাটাইয়া হঠাৎ ভয়ানক দৃঢ়তার সহিত হুকুম দিতে আরম্ভ করিল। আমি যে মনিব, আমার উপর যে কারও হুকুম খাটে না, এ প্রশ্ন মনেই আসিল না। আমি ও কমল পরম ক্ষিপ্রতার সহিত তার হুকুম তামিল করিতে লাগিলাম। এ কয়দিন শুধুই মনে হইল ঃ নবীন আমাদের সর্দার, আমরা তাহার অনুগত মাত্র, একমাত্র তাহার হুকুম তামিল করাই হইতেছে আমাদের কাজ। কমল বকর-বকর করিল কি না করিল, তাহা নজরেই পড়িল না।

অবশেষে কাজ শেষ হইয়া আসিল। আমি সামনের সাবেক আসনে বসিয়া কাজ তদারক করিতে লাগিলাম।

যেদিন কাজ শেষ হইবে সেদিন নবীনকে মনে হইল মুক্তির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল। কমলকে মনে হইল বড় অন্যমনস্ক।

সে বকর-বকর না করিয়া খুব একমনে কাজ করিল; কিন্তু, তবুও বারে-বারে নবীনের চোখে তাহার অনেক ভুল বাহির হইয়া পড়িল। আর আর দিনের ন্যায় নবীন ইহার জন্য শাসন করিল না বরং দু' একটা হাসি তামাশা করিল। কিন্তু তবুও মনে হইল, যেন প্রতিবারই কমল উত্তরোত্তর লজ্জিত হইয়াছিল।

পরের দিন উহাদের বেতন চুকাইয়া দেওয়ার দিন। সকালে অভ্যাস মতো কিছুক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করিয়া ঘরে ফিরিতেছি—দূর হইতে দেখি দহলিজের সম্মুখে কমল ও ছোট খোকা মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। খোকার সদ্যজাগা মুখে তখনও তন্দ্রার আলস। দেখি কমল

একবার চুপি চুপি চারিদিকে চাহিল। তারপর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া হাত বাড়াইল। খোকাও হাত বাড়াইয়া তাহার কোলে গেল, কিছুক্ষণ কমল তাহাকে বুকে চাপিয়া রাখিল। তারপর সন্তর্পণে নীচে নামাইয়া দিল। এত শীঘ্র যে নামাইয়া দিবে খোকা বোধ হয় আশা করে নাই। কারণ, তখনও তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমল অতি যত্নে ধুতির খুটে-বাঁধা একটি পাকা বেল বাহির করিয়া খোকার হাতে দিল। বেল হাতে পাইয়া খোকা অন্দরের দিকে ভোঁ দৌড় দিল। কমল বোধ হয় ইহা আশা করিয়াছিল। কারণ, তাহার মুখটা দেখিলাম হাসি-হাসি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই যেন কোথায় কি বিকল হইয়া সে ধীরে ধীরে সেখানে বসিয়া পড়িল।

কমলের বেতন দিতে যাইয়া বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। যে করিয়াই হউক এই আধ-ক্ষেপা লোকটিকে একটা চাকরের মতো হিসাব করিয়া বেতন দিতে আমার বড় লজ্জা লাগিল।

নবীব আসিল পরে। বেতন চুকাইয়া দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ হে, তুমি কমলের ছেলেটিকে দেখেছ ?"

নবীন মাথা নাড়িয়া ধীরভাবে উত্তর করিল, "তার ত ছেলে পুলে নাই।"

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম ঃ—"কি রকম! এই যে বললে, এক ছেলে —আট বছরের মতো বয়স।"

নবীন মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল ঃ "এটা তার স্বভাব। ছেলে কবে মরে গেছে, এখনও প্রতিদিন ও জীবিতের ন্যায় মানুষের মতো তার বয়স হিসাব ক'রে রাখে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম ঃ "আশ্চর্য! ছেলে মরতে নিজের চোখে বিশ্বাস কর্‌তে চায় না যে, ও বেঁচে নেই ?"

নবীন ধীরভাবে বলিল ঃ "মরতেও দেখেনি। তখন ও ছিল রেঙ্গুনে। যেদিন ছেলেটি মারা যায় তার পরের হাটেই কমলের পার্শেল এসে পোঁছায়—ছেলের জন্য জুতা, বই, কত কি খেলনা! বড় সাধ ছিল ছেলে মানুষ করার। তারপর বাড়ী ফিরে এই 'বকর-বকর'—সব কিছুর বিরুদ্ধেই নালিশ। কেউ কাজে নিতে চায় না। আমি কোন রকমে চালিয়ে নিচ্ছি।"

আমি নীরবে পরিমাপ করিতে লাগিলাম, কত বড় একটা অভিযোগ ভিতরে লুকাইয়া এই লোকটা বাহিরে অভিযোগের অভিনয় করিয়া যাইতেছে।

নবীন চলিয়া গেল। কিন্তু আধা পথ হইতেই কি মনে করিয়া আসিল। খানিক অপেক্ষা করিয়া বলিল, "বাবুজী! আমার একটা অনুরোধ। শশাঙ্কবাবুকে বলে আমার চৌকিদারী ট্যাক্সটা মাফ ক'রে দিতে পারেন? ছেলেপিলে ত জন্মাল না। এ বুড়ো হাড় ক'খানার উপর কি চৌকিদারের পাহারা না হলেই নয়?

প্রশ্নে ও গলার স্বরে চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল, এ যেন নবীন আমার সঙ্গে কথা কহিতেছে না। যেন একটা ক্লান্ত লোক তাহার ভিতরের মানুষটার ভিতর আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। ভাবিতে লাগিলাম: এই লোকটি কতখানি বড়। নিজের নিঃস্বতার ব্যথা ভিতরে চাপিয়া রাখিয়া অপর এক রিক্তের ব্যথা অবলীলাক্রমে বহিয়া যাইতেছে! মনে হইল: এ যে কত বড় তাহার পরিমাপ একমাত্র কমলই জানে। তাই একমাত্র ইহারই শাসন কমল মানিয়া চলে।

দু'মাস পরে। বড় বিপদ! জ্বরের ঘোরে খোকা প্রলাপ বকিতেছে। ডাক্তার কব্‌রেজ শঙ্কিতভাবে পালা করিয়া রাত দিন তাহার শয্যার পাশে কাটাইতেছে। খোকা শুধুই ঝগড়া করিয়া যাইতেছে—বড় ভাই ইউসুফের সহিত ঝগড়া: "দাদা! আমাল বেল! আমাল বেল!"

বিকালের দিকে জ্বর পড়িয়া আসিল। কিন্তু, ডাক্তার বদ্যির মুখে একটা আসন্ন বিপদের ছায়া নামিয়া আসিল। মনটা এত খারাপ হইয়া গেল যে, শক্তির আশায় রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম।

কখন যে নিজের অজ্ঞাতেই হাটের নিকটে আসিয়া পড়িলাম তাহা টেরও পাইলাম না। হঠাৎ হুঁশ হইল—রথ-তলায় বহুলোকের সমাগম দেখিয়া এবং বাদ্য কীর্তনের আওয়াজে। চাহিয়া দেখি—যে বাজাইতেছে সে কমল। দু'চোখ বাহিয়া আষাঢ়ের ধারা নামিতেছে। সে বাজাইতেছে, কি বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া নিজেই বাজিয়া উঠিতেছে, তাহা ভালো বোঝা গেল না। আর মুদিত নয়নে ভাবাবেশে "হরি

রাম হরি রাম হরি হরি রাম রাম" চীৎকারে যে নৃত্য করিতেছে সে নবীন। চোখের জলে তাহার বুক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে। দর্শকদের কাহারও চোখ শুষ্ক নহে।

নিজের অজ্ঞাতেই এক পাশে বসিয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে মনে হইল, উপস্থিত কাহারও মনেই যেন গ্লানি নাই। মনে হইল, এই সংকীর্তনের মাঝে যেন নবীনের অনাগত সন্তানগণ, কমলের আট বছরের ছেলে, সুস্থ-দেহ ছোট খোকা, মায় তাহার সেই কবেকার সেই বেলটি—সকলেই দু'হাত তুলিয়া আনন্দে নাচিতেছে।

যেন সব হারানো মনের দেখাই ইহার ভিতর পাওয়া যাইবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইমারত

শিবপ্রতিষ্ঠা করেছেন শ্যামাপ্রসাদবাবু। লোকের কাছে পরম বিস্ময়ের কথা। কৃপণ লোক, কার্পণ্যের তপস্যায় তাঁর পিতামাতাও নাকি মুদ্রাত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। লোকে বলে, এক এক পয়সা মা-বাপ শ্যামাদাস বাবুর। তার টাকাও গল্পের টাকা। গল্পের বস্তু অল্প হয় না, কেউ বলে লাখ, কেউ বলে দু'লাখ, কেউ বলে—লোকটা যত বড় টাকার স্তূপটিও তত বড়। তাঁর সিন্দুকের সর্বশেষ স্তরের যে টাকাগুলি, সেগুলি ওজনে ঠিক থাকলেও আকারে ঠিক নাই, উপরের টাকার রাশির ভারের চাপে চেপ্টে বড় হয়ে গিয়েছে এবং চেহারাতেও কালো হয়ে গিয়েছে। ছাতা ধরেছে। অনেকে বলে—সেগুলি অচল ; কেননা সরকার নোটিশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম আমলের টাকা, যেগুলিতে মুকুটহীন রাণীর মূর্তি মুদ্রিত সেগুলি অচলিত হয়ে গেল। একটি সময়ও তারা দিয়ে দিলেন, এই টাকা স্থানীয় রাজকোষে দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন টাকা বদল নেবার জন্য। কিন্তু শ্যামাদাস বাবুর স্বভাবই অন্য রকমের, সিন্দুকে যা তিনি রাখেন তা আর বার করেন না। লোকে বলে—শ্যামাদাস বাবুর ধারণা, বার করলেই বাইরের বাতাসে সে উড়ে যাবে। শ্যামাদাসের তৃপ্তি—সঞ্চয়ের তৃপ্তি, সেখানে অচল হলেও ক্ষতি নাই ; যেহেতু না চলবার প্রশ্ন নাই সেখানে। সেই লোক শিবপ্রতিষ্ঠা করবেন, এতে লোকের বিস্মিত হবারই কথা।

বিস্ময়ের প্রধান কারণ এবং মূল রসটা আকস্মিকতার মধ্যেই নিহিত থাকে, এবং তার বৈচিত্র্য ও মহার্ঘতা অল্পক্ষণ স্থায়িত্বের মধ্যেই আবদ্ধ ফ্রেমে ঘেরা ছবির মত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারও ব্যতিক্রম হ'ল।

মন্দিরের উপকরণ যখন এল, তখন পাকা ইঁট দেখে লোকের মনে হ'ল—তাদের কল্পনাকে এটা ছাড়িয়ে গেল। বললে ইট পাকা হলেও কাদা দিয়ে গাঁথবে।

কয়েকদিন পর দেখা গেল—চুন এসেছে, মজুরে সুরকি ভাঙছে। লোকে থমকে দাঁড়াল। গাঁথনি পাকাই হবে তা হলে! ছোটখাটো পাকা মন্দির একটি। বিস্ময় আবার একদফা উৎপাদিত হ'ল—জনাব শেখ রাজমিস্ত্রীকে দেখে, এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ পাকা কারিগর এবং তার হাতে কাজ কম খরচে হয় না।

মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওলংয়ের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মত সাদা এবং সোজা, বাবরী-কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কার্নিশ দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তারার মত চক্‌চক্ করছে। ঘাড়ের চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নীচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্নিশের বিটের মত—সবচেয়ে পাতলা কর্নিজ দিয়ে দড়ি ধরে কাটা হয়েছে যেন। গোঁফ এবং গাল কামিয়ে চিবুকের নীচে নর-দাড়িটিও ঠিক এমনই সযত্নে কাটা। ধপ্‌ধপে পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলির ফাঁকে কালো মিশির দাগ—পয়েন্টিং করা আলসের মত। চকচকে ছোট একটি হুকোতে ইঞ্চি চারেক লম্বা একটি বাঁশের নল লাগিয়ে, ভাল তামাকের মিষ্টি গন্ধে চারিদিকে বেশ একটা নেশার আমেজ ছড়িয়ে জনাব তামাক টানছে আর দীর্ঘ হাতখানির সরু আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ দিয়ে কাজ করাচ্ছে। গলায় দু' হালি কালো করে বেড় দিয়ে বাঁধা একটি পাকা সোনার চৌকোতক্তি। গায়ে চেক-কাটা পরিচ্ছন্ন ফতুয়া, কাঁধে বাহারে রঙের ডোরাকাটা সযত্নে পাঠ করা একখানি গামছা। পরনে ময়ূরকণ্ঠি রঙের লুঙ্গি। পায়ের চটি জোড়াটা এককালে সৌখিন ছিল; কিন্তু এখন পুরানো হয়েছে।

ইঁটের থাক দেওয়া হচ্ছে। মজুরেরা ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে থাকবন্দী করে রাখছে; যাতে ইঁট তুলতে সুবিধা হয়, বরবাদ না যায়, এমনকি দু'খানা ইট সরালেই ধরা যায়।

জনাব বলছিল, ই করে রাখ বাপ, হুঁশ করে—হুঁশ করে রাখ্। সুঁ-জু—সমা—ন করে একটির উপর একটি রেখে যা বাপ। গাঁথনি

করা ইমারতের নতুন বাহার দিবে। বেটাল হলে টলে পড়ে যাবে না। এই দেখ,। সর। দেখে লে।

সে তাকে সরিয়ে নিজেই ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে রাখতে লাগল— নিপুণ হাতে অবলীলাক্রমে।—হঁা। হুঁশ আর হিসাব। আর কাম করবার সময় মনে মনে বলিস না—বাবারে! মন যখুন বলবে—বাবারে, তখুন একবার তামুক খেয়ে লিবি। লে, টেনে লে একটান। খুসবই-ওয়ালা তামাক। কাঁধের গামছাখানি দিয়ে হাত দু'খানি থেকে ইঁটের ধূলো ঝেড়ে নিয়ে কল্কেটি সে মজুরটির হাতে দিলে।

বিস্মিত রামপ্রসাদ জনাবের পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার জনাব এদিকে ফিরতেই প্রশ্ন করলে, তুমি এখানে জনাব? ব্যাপার কি বল তো?

কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করলে জনাব—সেলাম গো বাবু। শ্যামাদাস বাবুজীর মন্দিল হবে। আমি গাঁথছি।

তাতো দেখছি। কিন্তু শ্যামাদাস বাবুকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি?

জনাব একটু হাসলে। বললে, আজ্ঞে না, অল্প খরচে সেরে দিব—সে বুলেছি আমি বাবুকে।

তোমার হাতে অল্প খরচে হবে তো?

জনাব হা—হা ক'রে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে ব'লে উঠল, আঃ, হায়—হায়—হায় গো! বলি, উকি ইটা ভাঙ্গচিস গোতু? অঁ্যা! নোড়ান মতুন মোটো—সোটো! অঁ্যা!

সে এগিয়ে গেল লম্বা পা ফেলে।

এদিকে এক জায়গায় জমায়েৎ হয়ে ব'সে বেশ যেন মজলিস করার ভঙ্গিতে মজুরনীর দল ছোট হাতুড়ি দিয়ে ইঁট ভেঙ্গে খোয়া তৈরী করছিল।

বাছাই করা মজুরনী সব জনাবের। জনাবের নিজের মজুরি-ও বেশী, ওর মজুরনীদের মজুরিও চড়া। পরিচ্ছন্ন কাপড় আঁট ক'রে বেড় দিয়ে সর্বশেষ উদ্বৃত্ত অংশটুকু কোমরে ফেরতা দিয়ে জড়িয়ে পরেছে, হাতে এক হাত করে কাচের চুড়ি, স্বাস্থ্যবতী তরুণী নিয়ে জনাবের মজুরনীর দল। আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সাধারণে না জানলেও মজুরনীরা জানে, তরুণী হ'লেও যদি কেউ বেঁটে আর মোটা হয় তবে তারাই বারণ

করে দেয়, তু বুন যাস না। লেবে না। বুড়ো বলে—ঢ্যাপসা মেয়ে কাম করতে পারে না। ল'ড়ে বসতেই ওদের ছ মাস। তরুণী মেয়েদের মধ্যে আবার যাদের চোখ ডাগর, চুল বেশী, তারাই থাকে জনাবের পাশে; জনাবের হাতে ইঁট যুগিয়ে দেয়, মশলা ঢেলে দেয় গাঁথনির উপর, ওলং এগিয়ে দেয়, জলের যগ-বাটী দেয় হাতে হাতে, রাজমিস্ত্রীর হুকো কলকে তামাকটিকে রাখে সযত্নে, বরাতমত সেজে দেয়। মধ্যে মধ্যে জনাব ভরা-দুপুরের রোদের সময় বলে, লাতবউ, একটা গায়েন কর্‌না ভাই। বেশ মিহি গলায়। তু গাইবি, আমি আর লাতিন শুনব। হঁ্যা।

মিহি কাজের সময় মধ্যে মধ্যে কাজ বন্ধ করে ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দেখতে দেখতে বলে, দেখ্‌তো ভাই লাতনী লাতবউ, তুদের ডাগর চোখে, দেখতো এক নজর। বল্ দেখিনি কুথা কি খারাপ লাগছে?

অন্য মজুরনীরা সব দিদি। বড় দিদি, মেজদিদি থেকে ছোটদিদি পর্যন্ত।

আগেকার কালে যারা পাশে থাকত, তাদের কেউ ছিল ঠাকুরঝি, কেউ কেউ ছিল ভাবী। দু-চারজনকে বউ বলেও ডাকত। তাদের দুজন প্রৌঢ়া এখনও আছে জনাবের দলে। তারা সর্দারনী। দেখাশুনা করে মজুরনীদের কাজ। নিজেরাও করে টুকিটাকি এটা ওটা। এরাই আড়াইকাটির মত সংগ্রহ ক'রে আনে নতুন মজুরনী। আনলে জনাব খুশি হয়, সংগ্রহ-কারিনী প্রৌঢ়া দিন কয়েকের জন্য জনাবের কাছে পুরানো কালের সমাদরের খানিকটা যেন ফিরে পায়।

জনাব এগিয়ে গেল মজুরনীদের খোয়া ভাঙ্গার জায়গায়। নতুন একটি মজুরনী খোয়া ভাঙছে—খোয়াগুলি ঠিক ভাঙা হচ্ছে না, অনভ্যস্ত হাতের হাতুড়ির আঘাতে কতক হচ্ছে বড় বড়, বাকি খানিকটা ভেঙে গুড়ো হয়ে যাচ্ছে, কতক হচ্ছে নেহাৎ ছোট যা নিয়ে কোন কাজ হবে না।

জনাব তার হাত থেকে হাতুড়ি নিয়ে ভাঙার কৌশলটা দেখিয়ে দিলে—এই দেখ্‌—এই দেখ্‌ চোখ দুটি তো বড় বড়, নজর করে দেখ্‌। বেশী মোটাও হবে না—বিচি বিচি ছুটুও হবে না; বেশী জোরে হাতুড়ি মারবি না, আবার আস্তে আস্তে টুকুস টুকুস ক'রে মারলেও হবে না। এক তালে যা; হঁ্যা, এই দেখ্‌—এই দেখ্‌।

শ্যামাদাস বাবু এসে দাঁড়ালেন। খাটো মানুষটি, গৌরবর্ণ রঙ, পাকাচুল, চঞ্চল প্রকৃতির ছেলের মত অস্থির লোক। বার কয়েক এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়ালেন, তারপর এসে দাঁড়ালেন মজুরনীদের খোয়া ভাঙার জায়গায়—জনাবের কাছে। দাঁড়িয়ে তিনি স্থির থাকতে পারেন না ; অনবরত দোলেন। হাতের আঙ্গুলগুলি অহরহ সক্রিয়, অঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়ে মধ্যমার নখটা অবিরাম খুঁটে চলেছেন! লোকে বলে টাকা বাজিয়ে এই অভ্যাসটা হয়েছে তাঁর। শ্যামাদাস বাবু বললেন, জনাব! একে বলে—এই ছুঁড়ীগুলোকে লাগালে কেন হে?

জনাব হাসলে, বললে, জোয়ানী বয়েস না হ'লে কাজ হবে কেন হুজুর? খাটবে কে? তাছাড়া পাতলা হাত ওদের এখুন—হাল্কা পা, হাল্কা শরীল, হাঁটবে বন বন করে, ভারায় উঠবে খর খর করে।

শ্যামাদাস বললেন, না—না—না, হারামজাদীরা ভারি পাজী। ক্রমাগত ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসবে। মজুরগুলো কাজ করবে না ; ফষ্টি করবে। ভাগাও—ওগুলোকে তাড়িয়ে দাও।

জনাব বললে, আপুনি যান এখান থেকে হুজুর! আমি রইলাম, আপনার কাম রইল। বরবাদ হয় আমাকে ফজিয়ৎ করবেন। আমি জবাবদিহি করব।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামাদাস বাবু বললেন, এই মাঝারী একটি মন্দির হবে। বেশী ছোটও না হয়, বেশী বড়ও না হয়। বুঝেছ তো? আবার একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, লোকে বলছে—তুমি লাগলে আর থাম না।

জনাব হাসলে, বললে, ইমারত আপনার, আমার নয়—আমার বাবার নয়। আপনি যেমন হুকুম করবেন তেমনিই হবে—পাঁচ হাত বলেন—পাঁচ হাত ; দশ হাত বলেন—দশ হাত ; আবার বুলেন—একশো হাত, দেড়শো ফুট তাই হবে। তবে একটা হিসাব তো আছে! যেমন ভিত করবেন, তেমনিই মন্দির হবে। আবার মাঝখানে বুলেন—থেমে যাও জনাব, তাই হবে। কণি-পাটা নিয়ে চলে যাবো বাড়ি।

শ্যামাদাস উত্তর খুঁজে পেলেন না এর। নিরুত্তর হয়ে চঞ্চলভাবেই চ'লে গেলেন সেখান থেকে।

মন্দির উঠছে।

লোকে যেতে যেতে দেখে, পথে দাঁড়ায় সবিস্ময়ে। মন্দির তো ছোট হবে না।

ভারা বাঁধা হয়েছে। একখানা বাঁশের দৈর্ঘ্য ছাড়িয়েছে—বাঁশের মাথায় আবার নতুন বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তারও দুটো থাক ছাড়িয়ে তৃতীয় থাকে তক্তা পেতে জনাব কাজ করে যাচ্ছে। পাশে দুটি তরুণী,—কাহারদের বউ মতিবালা, আর হাড়ীদের মেয়ে দাসী। জনাবের বিপরীত দিকে আর একটা ভারায় দুজন রাজ কাজ করছে—আবদুল আর রসিদ।

শ্যামাদাস বাবু কখন নিচে এসে দাঁড়িয়েছেন। লোকের কথাই সত্য। জনাব সহজে থামবে না। এখনও চারখানা দেওয়াল সোজা উঠে যাচ্ছে। কাটান দিয়ে এখনও একখানা ইঁটও গাঁথা হয় নাই। সুতরাং কত উঁচুতে যে মন্দিরের চূড়া গিয়ে ঠেকবে সে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার উপর কাজ অগ্রসর হচ্ছে যেন শামুক চলেছে। জনাবকে দোষ দেওয়া যায় না, সে কাজ করে যায় ঠিক। কিন্তু ওই যে দুটো রাজমিস্ত্রী, ওরা ক্রমাগত বিড়ি খাচ্ছে। বিশেষ করে সবচেয়ে অল্প বয়সীটা। শুধু বিড়ি খাওয়াই নয়—অল্পবয়সী মজুরনীগুলোর সঙ্গে হাসাহাসির আর বিরাম নাই। তিনি ডাকলেন, জনাব!

জনাব নিচে তাকিয়ে বললে, আজ কাটান দিব হুজুর।

তা বেশ। কিন্তু একে বলে ঐ ছোকরা রাজমিস্ত্রীটাকে কাজ করতে বল!

জনাব ছোকরার দিকে দৃষ্টি ফেরালে। জনাবের মনে আছে, আজ ও কোন্‌খান থেকে ইঁট গাঁথতে শুরু করেছে। কত ফুট গেঁথেছে সেও সে মাপ না ক'রে একবার নজর দিলেই বুঝতে পারে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। সত্যই ছোকরার কাজ মোটেই এগোয় নাই।

সে বললে, কি রে? তু কি ভেবেছিস বুল্‌তো। মতলব কিরে তুর?

ছোকরা ব্যস্তভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে, কোনও উত্তর দিলেনা।

জনাব বললে, দেখ, একটি বাত তুকে বলি। শুনে রাখ। এই টাকা বড় খারাপ চিজ। চাঁদি লয়, পারা। পারাকে পুড়িয়ে ভসম লিয়ে যা, সিঁ তখুন ওষুদ। কাঁচা খা, গায়ে ফুটে নিকলে যাবে।

একখানা ইঁট হাতে নিয়ে তার উপর কর্নিকের ঘা দিতে দিতে আবার বলে, পরের ষোল-আনি টাকা, যখুন ষোল-আনি কাম করে লিবি, তখুন সে হ'ল পারা ভসম। তাতে যা খাবি, সে দিবে তুকে তাগদ। আর ফাঁকি দিয়ে লিবি তো সি টাকা লয়, সি পারা। তাতে যা খাবি, সে হবে বদহজমী।

রাগ হলে জনাবের হাতে কাজের গতি বেড়ে যায়। বাঁ হাত বাড়িয়ে সে বললে, ইঁট লাতবউ! হাঁ। মসলা-জল লাতিন। আচ্ছা, বাস করো।

খং-খং-খং-খং, ইঁটের উপর কর্নিকের আঘাত কামারশালায় লোহার উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দের মত বাজতে লাগল।

জনাব বললে শ্যামাদাস বাবুকে, আপনি যান বাবু। আজ থেকে আমি ফিতা মেপে হিসাব ক'রে কাম লিব। এই—এই রসিদ। এই হারামজাদী শুষনি! এই!

জনাবের হাঁকে ডাকে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। সচকিত হয়ে উঠল সকলে। চালাও চালাও। কাম চালাও। হাঁ।

খস্‌খস্‌ শব্দে কর্নিক চলতে লাগল জল-সপসপে চুন-সুরকি মেশানো মসলার উপর। গাঁথনির ইটের গায়ের পাটা বসিয়ে তার গায়ে হাতুড়ির আঘাত পড়তে লাগল ঠক-ঠক-ঠক-ঠক।

জনাব আবার কিছুক্ষণের মধ্যে খুশি হয়ে উঠল। হ্যাঁ। এই তো। তারপর সে কাহারদের বউ মতিবালাকে বললে, লেতো ভাই লাতবউ, দুপুরের আমেজে ধরতো একখানা মিহি গলায়। ধরতো! লাতিন তু ভাই একবার তামুক সাজবি।

মতির বড় বড় চোখ। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুলে মস্ত বড় খোঁপা। জনাবের ভারি প্রিয় সে। এরই মধ্যে জনাব তার লজ্জার সঙ্কোচকে অনেকখানি সহজ ক'রে এনেছে। গান গাইতে বললে, সে আর সলজ্জভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু হেসে নিরুত্তর ভাবে ঘাড় নেড়ে অস্বীকৃতি জানায় না, দিব্য গান গেয়ে যায়। এদের লজ্জা-সঙ্কোচকে জয় করবার শক্তি এবং দক্ষতা জনাবের অদ্ভুত।

দাসী তামাক সাজতে বসল। মতি মৃদুস্বরে গান ধরল—

বাবুদের চিলে কো-ঠার ছাদে
চিল কাঁদিছে গো ভরা-দুপুরে—
চিলি পালায় কোথা বাসা
বেঁধেছে কোন্ তালপুকুরে।

জনাব বললে, উঃ, কতক্কালকার গান। ছেরক্কাল রেজেরা গায়।

দাসী হুকো-কল্কে এগিয়ে দিলে। জনাব কল্কে খসিয়ে মতির হাতে দিয়ে বললে, লে, পেসাদ করে দে ভাই। তু খেয়েছিস তো ভাই লাতিন? তারপর আবার বললে, দে, উয়াদিকে এক ছিলাম ভাল তামাক দে। লেরে ভাই, খা, খুসবয়ওয়ালা তামুক এক টান খেয়ে-লে, জমিয়ে কাম কর্।

আবার বললে সান্ত্বনার স্বরে, দেখ্, তুদের ভালর তরেই বুলি। ষোল বছর বয়সে বাবা কর্নি হাতে দিয়েছিল, আর ওই কথাটি বলেছিল আমাকে। বুলেছিল—বাপ, এই কথাটি মনে রাখিয়ো; আগে ষোল আনি কাম দিবে, তারবাদে ষোল আনি টাকাটি লিবে।

কর্নিকের আঘাতে একখানা ইঁট ভেঙে আধখানা নিচে পড়ে গেল। জনাব একবার দেখে নিলে নিচেটা। তারপর বললে, জোয়ানী কাল হ'ল খাটবার আর কাম শিখবার কাল। যে শিখবে আখের ভাল হবে। লইলে আখের তার ঝরঝরে। ওই তিনকড়ে আর আমি এক সাথে কাম শুরু করেছিলাম। তা দেখে কেনে, তিনকড়েকে কেউ ডাকে? গারার (কাদার) গাঁথুনি গেঁথেই তার দুনিয়ার চিন্তি কাবার হয়ে গেল।

মতি হেসে বললে, তিনকড়ি মিস্ত্রীর ওপর তোমার ভারি রাগ, লয়?

হা-হা করে হেসে উঠল জনাব।—তুকে কে বললে গো লাতবউ?

মতি সলজ্জ কৌতুকে বললে, রঙ্গুকে নিয়ে ঝগড়া আমরা জানি না বুঝি? হাড়ীদের মেয়ে রঙ্গু!

উত্তরে জনাব মতির ডাগর চোখের সলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে রসিকতা ক'রে বসল। মতি মুখে কাপড় দিয়ে বললে, মরণ!

জনাব বললে, ঠিক তুর মত চোখ আর চুল রঙ্গুর। তবে তুর চেয়ে অনেক কালো। তেমন কালোই আর চোখে পড়ল না।

জনাব হঠাৎ ভারার উপর উঠে দাঁড়াল।

বদ্ধিষ্ণ গ্রাম। তবে পাকা গাঁথুনির ঘরের সংখ্যা কম। দক্ষিণে হরিশবাবুর দোতলা দু-মহলা দালান, মধ্যে শ্যামাদাস বাবুর এবং শ্যামাদাসের ভাইয়ের পাকাবাড়ী। তারই ওধারে রামবাবুদের একতলা দালান। মধ্যে মন্দির। রামবাবুদের পাঁচটা শিবমন্দির পাশাপাশি। ও-পাড়ায় দুটো খুব প্রাচীন কালের মন্দির। ওই উত্তর দিকে একটা মন্দির। উত্তর-পশ্চিম কোণে জনাবের পাড়ার মসজিদ। মিনার দুটো সোজা উঠে গিয়েছে। জনাব বললে, ওই দেখ লাতবউ। ওই রাম-বাবুর একতলা দালান। ওই দালানে আমার হাতে খড়ি। তিন-কড়িরও হাতে খড়ি ওই হোথা থেকেই। রঙ্গু এল খাটতে। আমাদের থেকে রঙ্গু বয়সে বড়। এই তুর মতুন চোখ, দাসীর মত চুল, আর সেকি কালো রঙ! দেখে আমি মাতাল হয়ে গেলাম। ইটা দিতে এল রঙ্গু। লিতে গিয়ে ঝুড়ির কিনারাটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল। রঙ্গু মুচকি হেসে বললে—ফেললে তো। দেখো, নিজে পড়ে যেয়ো না।

দাসী হেসে বললে, তাবাদে তুমিতো রঙ্গুকে নিয়ে ভাগলে তিনকড়ির ভয়ে।

ভাগলাম?—জনাবের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। সে বললে, তিনকড়ির ভয়ে ভাগি নাই।

জনাবের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। আঠারো বৎসর বয়সে হাড়ীদের মেয়ে রঙ্গুকে নিয়ে সে একদিন এখান থেকে পালিয়েছিল। লোকে বলে—তিনকড়ি রাজমিস্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রঙ্গুকে ছিনিয়ে নিয়ে আত্ম-রক্ষার জন্যেই জনাব পালিয়েছিল। জনাবের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হয়। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনকড়ি? আরে, শরমকি বাত, লজ্জার কথা! মর্কটের মত চেহারা, উল্লুকের মত তরিবৎ, তার সঙ্গে পিয়ারীদল নিয়ে লড়াইয়ে নাকি পালিয়ে যেতে হয়! সেকালের জনাবের চেহারা এরা দেখে নাই। তাই এমন কথা বলে।

পালিয়েছিল সে অন্য কারণে। রঙ্গু যদি যেতে রাজী না হত, তবু সে পালাতো। বাপের সঙ্গে গিয়েছিল সে পাথর চাপড়ির মেলা। বড় জাগ্রত পীরসাহেব সেখানে। দশ-বিশ হাজার লোক জমায়েত হয় পীরের অর্চনার

জন্য। তার অসুখের জন্যেই তার বাপ পীরসাহেবের কাছে মানত করেছিল। মানতের টাকা ধান মোমবাতি তেল নিয়ে সপরিবারে তার বাপ পাথরচাপড়ি গিয়েছিল। পথে কিছুদূরে পড়ে রাজনগর। এককালে নবাব ছিলেন এখানে। সেখানে অনেক ইমারত আছে। পাথরচাপড়ির ফেরত রাজনগর দেখতে গিয়েছিল তারা।

জনাব অবাক হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড এক তিন-খিলানি ফটক। আশপাশ সব ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু তিন খিলান দাঁড়িয়ে আছে জমাটবন্দী পাথরের মত। কি তার বাহার, কি সব নক্সা। রাজমিস্ত্রীর ছেলে সে—নিজে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখছে, কিন্তু এ জিনিস সে কল্পনাও করতে পারে নাই কখনও। মনে মনে হাজারো বার, লাখো বার সেলাম জানালে এই ইমারতের ওস্তাত কারিগরকে। সবিস্ময়ে সে বার বার উচ্চারণ করলে—শোভান আল্লাহ!

ছেলের বিস্ময় দেখে বাপের কৌতুক হল। সে ফিরবার পথে জেলার সদরের ইমারতগুলো দেখিয়ে নিয়ে এল। হিন্দুদের এক পুরানো মন্দির আছে। সে দেখেও তার তাজ্জব মনে হল।

জনাব চোখে যেন যাদুর সুরমা পরে ঘরে ফিরল। হাজার সেজের ঝাড়-লণ্ঠনের হাজার বাতির আলোর জলসা থেকে ফিরে কাঠের পিলসুজের ওপর মাটির প্রদীপ দেখে যেমন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, তেমনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল ছিল রঙ্গু। গ্রামের বাইরে বিশ-পঁচিশটা ঝুরিওয়ালা বটতলায় রাত্রে কেউ যায় না। বলে—ভূত আছে ওখানে। জনাবের ওই জায়গাটা খুব ভাল লাগে। বুড়া গাছটার ঘন ছায়ার তলায় কোন গাছ, এমনকি ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না,--পাকা মেঝের মত তক্‌তক্ করে, মাথার উপরে ডালে পাতায় ছাউনিটি সুঢৌল গোল, যেন ছাদের মত—গম্বুজের মত মনে হয়। মূল কাণ্ডটাকে চারিদিকে ঘিরে বিশ-বাইশটা মোটা ঝুরি নেমে মাটির বুক ফুড়ে চলে গিয়েছে – বিশ বাইশটা থামের মত। ছেলেবেলা থেকেই জনাবের এই গাছালটিকে বড় ভাল লাগত। এখন শুধু ভালই লাগেনা, এখন তার মনে হয়, খোদাতায়ালার এ এক বাহারের ইমারত। ছেলেবেলায় এসে গাছটার কাছে বসে থাকত দিনের বেলা। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাহস বাড়ল, তখন

বিকেলের দিকে এসে গাছটার তলায় গিয়ে বসত, ঘুরে-ফিরে দেখত। রঙ্গুর সঙ্গে পরিচয় যখন প্রেমে পরিণত হল, তখন সেই প্রেমে তার সাহস হয়ে উঠল দুঃসাহস। সন্ধ্যার পর সে এসে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকত একটা মোটা ঝুরিতে ঠেস দিয়ে। ঝুরিটিতে এবং জনাবে যেন এক হয়ে যেতো। গাছটার ঝুলে পড়া ডালে ঝুলিয়ে দিত তার সাদা গামছাখানা। দূর থেকে অন্য লোক ভয় পেত, ভাবত, সাদা কাপড় পরে কেউ গাছের ডালে বসে দোল খাচ্ছে! রঙ্গু দূর থেকে বুঝতে পারত জনাবের নিশানা। সে নির্ভয়ে চলে আসত। রঙ্গুর সঙ্গে যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ ছিল তার আনন্দ।

রঙ্গুর কাছে সে গল্প করত রাজনগরের তিন খিলানি ফটকের সদরের চূড়ার, মন্দিরের, সদরের বড় বড় ইমারতের, এর ওর কাছ থেকে শোনা শহর মুরশিদাবাদের নবাবী আমলের ইমারতের। শহর—কলকাতায় এক মিনার আছে—নাম বলে মনুমেণ্ট। তলাতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মাথার পাগড়ি টুপি খসে মাটিতে পড়ে যায়।

রঙ্গুর শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু অবসর হয় না। তারও ঘর-দুয়ার আছে —মা-বাপ-ভাই আছে, স্বামী আছে। রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে যারা মজুরনী খাটে তাদের সঙ্গে রাজমিস্ত্রীদের অপবাদ রটে, অভিভাবকেরা জানে—অপবাদের মূলে সত্যও আছে ; তবু নিয়ম হল সব দিক মানিয়ে চলার। সেইটাই ভাল। রাজমিস্ত্রীদেরও এ বিষয়ে একটা নিয়ম আছে, সেটা তারা মেনে চলে ; গোপনে প্রেম যতই প্রবল হোক, তারা প্রণয়িনীদের ঘরছাড়া করে নিজেদের ঘরে আনে না। এতে বদনাম হয় তাদের। ব্যবসার ক্ষতি হয়। লোকে কাজ দিতে চায় না, মজুরনীদের কাজ করতে পাঠাতে চায় না তার কাছে।

অকস্মাৎ একদিন জনাব তাকে বলে, আমার সঙ্গে যাবি ?

কোথা ? কোলকাতা, না, মুরশিদাবাদ, না, ডিল্লি, না, লাহোর ? তুমি তো নিয়ে গেছ আমাকে কত জায়গা। হাসলে রঙ্গু।

রঙ্গুর হাত চেপে ধরলে জনাব, বললে, না। ইবার আমি পালাব, খোদার কসম। একটু চুপ করে থেকে জনাব বললে, বাপজীকে এত করে বুললাম, তা সি যেতে দিবে না। বুলে - মা-মরা ছেলে আমার তু, তুকে ছেড়ে থাকতে পারব না আমি। আর গাঁয়ে মায়ে সমান কথারে বাবা, ইখানেই কাল কেটে যাবে খেয়ে-পরে কোন রকমে। উসব খেপামী করিস না।

তা তো হল। কিন্তু যাবে কোথা ? জায়গাটা শুনি ?

সাহেবডাঙ্গার কুঠি জানিস ?

হ্যাঁ। রেশম-কুঠি আছে সাহেবদের। সেখানে।

রেশম-কুঠিতে কি করবা ?

সিখানে লতুন করে সব ইমারত হবে। পুরানো সব ভেঙে নয়া নয়া কারখানা করছে সাহেবানেরা। মোট মজুরী যাবি ?

রঙ্গু এই অল্প বয়সের মধ্যে বদজনের প্রলোভনে পড়েছে, অর্থসামগ্রীও সে অনেক পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ জনাবের মত নিজেকে দেয় নাই এমন ভাবে। ফলে, সবদিক মানিয়ে, ঘর-সংসার এবং জনাব—এই দুইকেই বজায় রেখে মানিয়ে চলা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সে প্রকাশ্যভাবে জনাবকে তার নিজের বলে এবং নিজেকে একান্তই জনাবের বলে ঘোষণা করে দাঁড়াতে চায়। সে বললে, চল, তাই চল।

পরদিন সন্ধ্যায় আর তারা মিলিত হল না। রাত্রি একটু গভীর হলে জনাব এসে দাঁড়াল পুঁটলী নিয়ে। ছোট বড় পাটা দুখানা হাতে নিয়েছিল। রঙ্গুও এল একটি পুটলী নিয়ে। দুজনে তারা বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারে সাহেবডাঙ্গার রেশম-কুঠি। একেবারে নদীর কিনারার উপর। সাহেবানেদের কীর্তি দেখে জনাব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। শোভান আল্লাহ ! ক্রোশভর কিনারা একদম নীচে থেকে উপর পর্যন্ত বাঁধিয়ে ফেলেছে। বাঘিনীর মুখের মধ্যে লোহার দস্তানা পরা হাত পুরে দিলে যেমন হয়, দরিয়ার হাল হয়েছে ঠিক তেমনই। কাঠের দাঁড় দিয়ে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চিবুতে চেষ্টা করছে সে। বাঁধানো সীমানা বরাবর নদী এখানে ধনুকের মত বাঁক ঘুরতে বাধ্য হয়েছে।

বাঁধানো কিনারার উপর উঠেছে কুঠি। পাঁচিল চলে গিয়েছে তীরের মত সোজা। তার ভিতর দেখা যাচ্ছে গোল থামওয়ালা দোতলা বাড়ী; সবচেয়ে বিস্ময়কর, চোপলা মিনারের মত উঠে গিয়েছে ইটের তৈরী চিমনী।

ঘাটে উঠবার সময় জনাব পোস্তার গাঁথনিটা বেশ করে হাত দিয়ে নেড়ে দেখলে। আরে বাপরে বাপ ! জমে একদম পাথর বনে গিয়েছে। ইটের

উপরে ইট, তার উপরে ইট, মাঝখানের মসলা কোথায় কতটুকু, ধরতে পারা দূরে থাক্, আন্দাজও করা যায় না।

সাহেবের সামনে গিয়ে সেলাম করে সে দাঁড়াল। কুঠির তখন অনেক কাজ, নতুন বয়লার বসবে, চিমনী তৈরী হবে; নতুন করে পাঁচ শো খাই তৈরী হবে, তার শেড চাই। নতুন গুদাম হবে, কোয়ার্টার হবে, আণ্টাঘর হবে। অনেক কাজ, অনেক মিস্ত্রী চাই, অনেক লোক চাই। কাজ পেয়ে গেল জনাব। কুঠির দারোয়ান তাকে সঙ্গে করে জিম্মা করে দিলে বড় মিস্ত্রীর—শেখ খুরশেদ আলী।

ঘাড়-কামানো বাবড়ি চুল—চেরা সিঁথি মাথায় মখমলের টুপি, গায়ে পাঞ্জাবী আস্তিন, পরনে চেকদার লুঙ্গি, পায়ে ফুলদার চকচকে জুতা—নাম পাম-শু। দোষে গুণে বেশ মানুষ ছিল খুরশেদ। বয়স এখন তার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। জনাবকে এক নজর দেখলে। জনাবকে দেখতে গিয়ে রঙ্গুকে দেখে সে বললে, ও? ও কে?

জনাব বললে, আমার লোক। তারপরই নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলে, আমার বিবি।

খুরশেদ হেসে বললে, ঝুট।

তারপর আবার হেসে বললে, তাতেও কোন হরজা নেই। তুম রাজমিস্ত্রী হ্যায়—উ তুমার রেজা হ্যায়। লেগে যাও কাজে। পিঠের দিকে জামার গলায় ঝুলানো ছিল ভাঁজ করা ইঞ্চি মাপের স্কেলটা—সেটা সে টেনে নিয়ে মাপতে বসল গাঁথনিটা। অবাক হয়ে গেল জনাব। সেও লাগল পরের দিন থেকে। নদীর ধারের পলিমাটির তৈরী ইট—পগমিলে মাটি তৈরী হয়েছে, বাক্স-ফর্মায় ছ'খানি পিট একেবারে যেন র‍্যাঁদা করা কাঠের মত সমান; একখানির উপর আর একখানি রাখলে বেমালুম বসে যাবে—কেতাবের ভিতরে সমান মাপে কাটা কাগজের উপর কাগজের মত। পাতলা গঁদের আঠার মত আস্তরণ মসলা কনিক চালিয়ে টেনে দিয়ে একখানার পর একখানা ইট বসিয়ে যাচ্ছে সোহাগের পান দিয়ে জোড়া সোনার দানা, দানার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। খিলান হচ্ছে—সাহেব লোকের আণ্টাঘর—গান হবে, বাজনা হবে, সাহেব-মেম লোক নাচবে—জোড়া বেঁধে; গোটা ঘর জোড়া এক খিলান, দুই ধারে দুই

থাম। বিশ ফুট চওড়া খিলান, মোটা শালের রোলা দিয়ে মাচা বেঁধে খিলানের ঠেকা বাঁধা হয়েছে, তার উপর ইট গাঁথা হচ্ছে। খিলানের ইট সোজা বসছে না, বসছে আড়াআড়ি। মসলা নিয়ে দাঁড়িয়ে তৈরী করিয়েছে বড় মিস্ত্রী। বিলাইতী মাটি আর কাশীর চিনির মত মিহি বালি মিশিয়ে শুকনা অবস্থায় বারবার তাকে কেটে ঘেঁটে মিশিয়ে জল ঢেলে ক্ষীরের মত পাতলা করে তৈরী সে মসলা। সেই মসলা ঢেলে দিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে, কর্নিক দিয়ে মেজে ঘষে জোড় মিলিয়ে দিচ্ছে। বিলাইতী মাটি ওই এক তাজ্জবের মসলা! বালিতে আর বিলাইতী মাটিতে মিশিয়ে তাল পাকিয়ে রেখে দাও ঠাণ্ডায়, একটু শুকলে ফেলে রাখ পানিতে; একদিন পর তুলে নাও—ব্যস পাথরের গুলী হয়ে যাবে!

আণ্টাঘরের গাঁথনি শেষ হল, আরম্ভ হল পলেস্তারা। সাহেব বলেছিল—বিলাতী মাটিতে বালি মিশিয়ে পলেস্তারা কর। খুরশেদ বললে, হুজুর, পঙ্কের কাম হোক—মার্বেলকে মাফিক জিল্লা দেগা। উসকে'পর আঁখ রাখনেসে দরদ নেহি লাগেগা।

তিনকড়ি রাজ পঙ্কের কাম হয়তো চোখে দেখেছে। এখানে জনাব কিছু করেছে। কিন্তু সে কাজের হদিস সে জানে না। বিলাইতী মাটি এখানেও আমদানি হয়েছে অনেকদিন। তিনকড়ি বুদ্ধি খাটিয়ে বেশি মজবুত করবার জন্য বিলাইতী মাটির সঙ্গে বেসাবার বালির ভাগ কমিয়ে চুন মিশিয়েছিল তার বদলে। উল্লুক—বুরবক—গিধ্বড় কাঁহাকা। মনে পড়লে জনাবের হা—হা করে হাসতে ইচ্ছে করে। মদের সঙ্গে দুধ! আরে উল্লুক! হায় নসীব জনাবের। বিলাইতী মাটির সঙ্গে চুনা! তোবা! তোবা! ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল গাঁথনি।

হায় খোদা! হে ভগবান! এ কাজ কি এত সোজা? একি এমনি হয়। খোদাতায়ালা দুনিয়া তৈরি করলেন—কোথাও গড়লেন পাহাড়, কোথাও গড়লেন নদী, কোথাও গড়লেন বন, সমান মেঝের মত দুনিয়ায় ক্ষেত গড়লেন, কিনারায় সমুদ্দুর। তাঁর কাছ থেকেই না বড় বড় মানুষ দামী মগজে ভরে নিয়ে এল সেই বিদ্যা। সে কি সোজা! কত বড় বড় কেতাব লিখেছে সব বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, কত নকশা, কত মশলা, কত মাপ, কত হিসাব সে দেখেছে। চোখে দেখেছে

সে সব কেতাব সাহেবদের টেবিলের উপর। খুরশেদ কতক শিখেছিল তাদের কাছে, কতক শিখেছিল তার পুরানা সফী ওস্তাদের কাছে—মুরশিদাবাদের বুড়া ওস্তাদ কারিগর, মগজের খোপে খোপে ছিল তার নবাবী আমলের ইমারতী এলেম, খুরশেদের কাছে জনাব অনেক কষ্টে আদায় করেছে এইসব বিদ্যা, এইসব এলেম, বহু! দাম তাকে দিতে হয়েছে এর জন্য। রঙ্গুকে দিতে হয়েছে খুরশেদকে।

রঙ্গুকে দেখে নেশা জাগল খুরশেদের। জনাবের উপর সে সদয় হয়ে উঠল। জনাবের কাছে সে পান চাইত রোজ। বলত, রঙ্গিলা বিবির হাতের সাজা পান খাওয়াও মিয়া। এই সূত্রপাত। তারপর একদিন বললে, রঙ্গিলা বিবির হাতের রান্না খাওয়াও জনাব ভাই। তখন জনাবকে রাখত ঠিক নিজের পাশে। জনাবও তখন কাজের নেশায় বিভোর। তখন খুরশেদের এ নেক নজরের কারণ সে ঠিক ধরতে পারে নাই। ভাবত তার কাজে খুশী হয়ে বড় মিস্ত্রী তাকে ভালবাসছে, তাকে ঠিক ভাইয়ের মত দেখছে, তাই তার বাড়িতে নিজে থেকে যেচে নিমন্ত্রণ নিলে। রঙ্গুর হাতের রান্না খেতে চাওয়ার খুরশেদের কিছু মতলব ঠাওর করবার মতও ছিল না। সে নিজেই পঞ্চমুখে রঙ্গুর রান্নার প্রশংসা করত। রঙ্গু হাসত কাজের যোগান দিতে দিতে।

রঙ্গু সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, তাই নেমন্তন্ন কর বড় মিস্ত্রীকে। খুব আচ্ছা করে কলিজার কালিয়া রেঁধে খাওয়াব।

জনাব সেদিনও বুঝতে পারে নাই কথাটা।

বুঝতে পারলে, হঠাৎ একদিন খুরশেদ তাকে বললে, রঙ্গিলা বিবিকে তুমি ছেড়ে দাও জনাব ভাই।

চমকে উঠল জনাব।

আমি ওকে কলমা পড়িয়ে নেকা করব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল জনাব।

বড়মিস্ত্রী হেসে বললে, রঙ্গি চলেও গিয়েছে আমার বাসায়। সেও রাজী আছে। আর বেশী গোলমাল করলে কোনও ফায়দাও হবে না এতে। সেটা তুমি সহজেই সমঝাতে পার।

সমঝাতে হল বইকি। সারারাত নদীর বালিতে বুক চাপড়ে কেঁদে সে বুঝলে। মনকে বুঝালে। তার পরের দিনটাও সে বুঝলে। তার পরদিন সে হাসিমুখে এসেই খুরশেদকে বললে, তাই হোক বড় ভাই। হাজার হলেও তুমি ওস্তাদ।

বড় মিস্ত্রী বললে, তুই বেছে নে, এত কামিন রয়েছে—যাকে পছন্দ হবে তোর বল্।

পছন্দ সে করলে একজনকে, কিন্তু সে কথা বললে না বড় মিস্ত্রীকে। খুরশেদের বাসায় ছিল কিছুদিন আগে নেকা করা স্ত্রী। তাকেই নিয়ে একদা সে সাহেবডাঙ্গা থেকে গভীর রাতে বেরিয়ে পড়ল। তখন আণ্টা-ঘরের মেঝে হয়ে গিয়েছে—ছাদ হয়েছে, পলেস্তারা হয়েছে, থামে পঙ্কের কাজের পালিশ হয়েছে। গাঁথা হচ্ছিল তখন চিমনি, মাঝের জায়গায় গাঁথুনি চলছিল, ভারার উপর থেকে নীচের দিকে চাইলে শরীর শিরশির করে—মাথা ঝিম ঝিম করে। খুরশেদ তখন কিছু কিছু সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তার ভয় হল হঠাৎ খুরশেদ তাকে ভারা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। শয়তান, ও সব পারে। পুরো চিমনিটা গাঁথতে সে পারলে না—এই আফসোস নিয়ে সে হামিদনকে নিয়ে পালাতে বাধ্য হল।

ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং করে পাঁচটা ঘণ্টার আওয়াজ হল। ইস্কুলের ঘণ্টা, পাঁচের ঘণ্টা শেষ হল, বাজল তিনটে। জনাবের চমক ভাঙল—কত কালের কথা! কাজ করতে করতেই সে ভাবছিল। হাতের শেষ ইটখানি বসিয়ে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

মতিবালা প্রশ্ন করলে, কি ভাবছিলে গো ওস্তাদ ? রঙ্গুকে ?

হেসে জনাব বললে, উঁহু।

তবে ?

তুর ডাগর চোখ দুটি ভাবছিলাম।—সে তার গালে একটা টোকা মেরে দিলে।

রাগের ভঙ্গিতে মুখ গম্ভীর করে মতি বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, উকি না। হ্যাঁ।

নিচে থেকে ডাকলেন শ্যামাদাস বাবু, জনাব !

এই যাই আজ্ঞা। আজ দেখেন কাজ। মেপে দেখেন।

কাটান দিলে ?

কাল দিব। ভেবে দেখলাম--আজ দিলে জেরাসে খুঁত থাকত।

শ্যামাদাস চঞ্চল হয়ে নখ খুঁটতে আরম্ভ করলেন--শোন তো তুমি, শোন তো, একে বলে--তোমার মতলবটা কি একবার খুলে বলতো শুনি ?

জনাব বললে, পেটে এখুনও দানা-পানি পড়ে নাই বাবু। এমুন লয়। আসব সন্‌জের সময়। এখুন হয়তো খারাপ বাত বেরিয়ে যাবে। সন্‌জেতে আসব।

সন্ধ্যার সময় সে এল। এখন তার গায়ে ফতুয়ার বদলে জামা। পরনে কাপড়—বহরে বড়। কোচাটি উলটে গুঁজে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে মানানসই করে নিয়েছে।

শ্যামাদাসবাবু বললেন, লোকে যা বলে, মিছে নয়। লাগলে, একে বলে—থামতে চাওনা।

জনাব হেসে বললে, এ আপুনি কি বুলছেন হুজুর? কাম শেষ না হলে থামব কি করে গো? সবেরই একটা সময় আছে, থামবারও একটা সময় আছে। একি বাজিকরের হুকার জল-হই বসায়ে দিলে, দিয়ে বুললে--পড়্, জল, পড়তে লাগল। বুললে--থাম্! ব্যস, থেমে গেল!

শ্যামাদাসবাবু বললেন, আজ কাটান মারবার কথা তুমি নিজে--

হাঁ বলেছিলাম—তা দেখলাম আজ যদি এইখানে কাটান মারি, তবে জেরাসে খুঁত হয়, খারাপ হয়ে যায় মন্দিল। ধরেন, সবেরই একটা হিসাব আছে। ফিতা ধরে মাপ—ফুট ইঞ্চির হিসাব।

কিন্তু এরই মধ্যে কত উঁচু হয়েছে দেখেছ ?

জনাব ভুরু কুঁচকে হাসলে,—উঁচু হয়েছে! উই কি উঁচু? উচাই যদি না হবে, তবে মন্দিল করছেন কেনে হুজুর? একখানা সাতফুট বাই আটফুট গপরার গাঁথনি ঘর করলেই তো হত। মাথার উপর একটা

তেকোণা পেরাপেট গেঁথে একটা ত্রিশূল বসায়ে দিলেই হয়ে যেত। তা বলেন না কেন—এখনও হবে। তাই করে দিছি আপনার। গাঁথুনি বন্ধ থাক্, কড়ির অগর পাঠায়ে দিন, টালি আনিয়ে নিই—

বাধা দিয়ে শ্যামাদাসবাবু বললেন, আঃ তুমি বড়, একে বলে—বাজে বক জনাব। তা কে বলেছে হে বাপু? চঞ্চল হয়ে তিনি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন, ঘুরতে লাগলেন ঘরময়, আঙ্গুল দিয়ে নখ খোটার মাত্রা বেড়ে গেল।

জনাব বললে, তবে আপনি বলছেন কি? মন্দিল হবে আপনার, আমার নয়। আমি লিয়ে যাবনা ঘরে। লোকে বলবে না—জনাব শেখের মন্দিল, বুলবে অমুক বাবুর মন্দিল। হুজুর, মন্দিল লোকে করে কেন? ঘর করলেইত হয়। হুই মাথা লম্বা করে আকাশের গায়ে মার দিয়ে মন্দিল করে কেন? তার উপরে দেয় আপনার কলস, তার উপর ত্রিশূল—কেউ দেয় চক্র। কেউ বা দেয় পিতলের, কেউবা দেয় সোনার। কেনে দেয় হুজুর? উচার জন্যই মন্দিল। আপনার দেবতা—আপনার ঠাকুর যে ইমারতে থাকবেন, সে নিচু হবে মানুষের 'থান' (চেয়ে)? আপুনি থাকেন দোতলা ঘরে, তার চিলেকোঠা হুই উঁচা। আর ঠাকুরের মন্দিল এই নিচু হবে? মন্দিল হবে, দেবতার মন্দিল আকাশের গায়ে মার দিয়ে মাথা উঁচা করে খাড়া থাকবে, সুরুযের আলো পড়ে সোনার কলস ঝলবে। গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাঙবে সকালে, আল্লাকে-ভগবানকে প্রণাম করতে মুখ তুলবে, আপনার মন্দিলের চূড়া চোখে পড়বে। তারা প্রণাম করবে আপনার ঠাকুরকে। বলবে-হঁ্যা, অমুক বাবু একটা আদমীর মতন আদমী ছিল, ভক্ত ছিল বটে, মন্দিল করে গিয়েছিল বটে। বেহেস্তে থেকেও শুনবেন সে কথা আপুনি। মন্দিলের চূড়া ক্রোশ বরাবর দূর থেকে দেখা যাবে। তবে সে মন্দিল। গাঁয়ের চারপাশে গাছপালা, জঙ্গল মনে হয় দূর থেকে। সেই জঙ্গলের মাঝখানে গাছপালায় মাথা ছাড়িয়ে আশ্বিনের টুকরাভর মেঘের মত মন্দিলের মাথা দেখা যাবে। লোকের প্রথমে মনে হবে, মেঘই বটে। তা'পর মনে হবে-না, মেঘ তো লয়, মন্দিল—এ মন্দিল। তারিফ করবে লোকে। বলবে-হঁ্যা, ইমানদার লোকের কীতি

বটে। দেশ-দেশান্তরের লোক কেউ আসছে ই-গাঁয়ে। পথের রাহী শুধালে—অমুক কত দূর ভাই? লোকে বুলবে—আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই নজরে আসবে, পহেলেই দেখতে পাবে এই মন্দিলের চূড়া। ওই চূড়াতে চোখ রেখে চলে যাও।—কার মন্দিল ভাই?—অমুক বাবুর মন্দিল। হ্যাঁ!

শ্যামাদাসবাবু কথার মাঝখানেই পায়চারি ছেড়ে এসে চেয়ারে বসেছিলেন। স্তব্ধ হয়ে তিনি বসেছিলেন। নখ খুঁটছিলেন অত্যন্ত মৃদু ভাবে। জনাব তার কল্কের স্তিমিত আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বাইরে গিয়ে বসল। সেখানে আড়ালে বসে তামাক খেতে লাগল। এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বললে, বাবু!

উঁ।

বুলেন, কথাটা আমি ঠিক বুলেছি কি না?

শ্যামাদাসবাবু বল্‌লেন, হুঁ, কথাতো ভালই বটে। একে বলে—শুনতেও ভাল লাগছে। কিন্তু—

উয়াতে আর কিন্তু নেই হুজুর। সাহেবডাঙ্গার কুটি 'থনে' গেলাম বর্ধমান। শুনলাম রাজবাড়ীতে ইমারত হবে নতুন। বুঝলেন। পথে পেরথম চোখে পড়ল সারি সারি মন্দিল—একশো আট শিবমন্দিল। দুধের মত সাদা মন্দিলের সারি, আঃ, মাঠের মধ্যিখানে—দু কোশ দূর থেকে নজরে পড়ছে, আর মাঝে মাঝে গাছের আড়াল পড়ছে। তা'পর কাছে এলাম। হুজুর, সেখান থেকেই একশো আট সেলাম দিলাম রাজাকে—আর একশো আট সেলাম দিলাম কারিগরকে। তা বাদে আপনার রাজবাড়ি, ইমারত, সে বাদই দেন। রাজা বাদশা নবাবদের কীর্তিই আলাদা। কিন্তু আপনিও তো আমীর লোক—আমীরের মত কীর্তি তো আপনাকে করতে হবে। রাজার বাড়ির থাম নিচেতলা থেকে উঠে গিয়েছে তিনতলার ছাদ পর্যন্ত। পঙ্কের কাজ করা গোল থাম। সে সব কথা না হয় বাদই দিলাম। রাজবাড়ির কাম হয়ে গেল, শুনলাম কাম হবে কাছেই এক জমিদার বাড়ির—মন্দিল হবে। নটা চূড়া হবে মন্দিলের, দাওয়া হবে মানুষের গলা ভোর উঁচা। কলকাতার ইঞ্জিনিয়ার নক্সা করেছেন।

শ্যামাদাসবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন।

জনাব অপেক্ষা করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর সেও উঠল। কি করবে সে বসে থেকে? ঝকমারির কাম করেছে সে এই বাবুটির কাজ হাতে নিয়ে। দিলদার লোকের কাম করেও সুখ আছে। তাতে মজুরি কম হয় সেও আচ্ছা। দিলদার লোক ছিল বর্ধমানের সেই জমিদার। ঘুর ঘুর করে বাবুসাহেব মন্দিরের চারপাশে ঘুরছেই।

হ্যাঁ, ওখানটা কেমন যেন বেঁকে গেল মিস্ত্রী?

না হুজুর, ঠিক আছে। নিচে থনে উঁচাতে এমন দেখায়।

মিস্ত্রী—দেখ, আমার ভারি ইচ্ছে—

বলুন হুজুর, বলুন কি ইচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার করেছেন বটে মাঝখানের চূড়াটি এই রকম, কিন্তু আমার ইচ্ছে—বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দির তুমি দেখেছ তো—সেই রকম হয়।

হবে, সেই রকমই হবে।

আর দেখ, ভেবেছিলাম মন্দিরের সামনে যে খিলানের বারান্দা, ওখানেই শুধু মার্বেল দেব। তা না, সামনে যে খোলা বারান্দা ভিজে রোয়াক, ওটাতেও মার্বেল দেব। কি বল?

হাঁ হুজুর! খুব ভাল হবে।

বর্ধমানের ওই গাঁয়েই হামিদন মরেছিল। বিশ্রী ঘা হয়ে মরেছিল হামিদন। হামিদনের দোষ নাই। সে ঘা তাকে ধরিয়েছিল জনাব। জনাবকে ধরিয়েছিল বর্ধমানের কামিন সৈরভী। ছিপ্ছিপে পাতলা চেহারা, কোকড়ানো চুল, ঢুলঢুলে চোখ; ঠোঁট দুটো একটু উঁচু ছিল সৈরভীর; হাসলে দাঁতের সঙ্গে মাড়ি বেরিয়ে পড়ত। নেশা লাগত তাকে দেখে। কিন্তু বিষ ছিল তার মধ্যে। সে-ই জনাবের জীবনে প্রথম বিষ। জনাব নিজের চিকিৎসা করেছিল। হামিদন লুকিয়েছিল প্রথমটা। তারপর যখন প্রকাশ করতে বাধ্য হল, তখন সে বর্ধমান ছেড়েছে। দূর পাড়াগাঁ থেকে চিকিৎসা ভাল হয় না। মরে গেল হামিদন।

নসীব—নসীব জনাবের। হামিদন মরে গেল—মন খারাপ হয়ে গেল জনাবের। জমিদার বাড়ির কাজ শেষ হতেই সে ফিরে এল এ গাঁয়ে। বাপজান সেই সময়ে অসুখে পড়েছিল। বাপজান বললে, আর বিদেশে

যাসনা বাপ। যে কটা দিন আমি বাঁচি, ইখানেই থাক। কাজকাম কর। সাদী নিকা কর্।

জনাব থেকে গেল। নসীব জনাবের।

জনাব বেরিয়ে আসছিল শ্যামাদাসবাবুর ওখান থেকে। থমকে সে দাঁড়াল শ্যামাদাসবাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই পতিত জায়গাটা—মন্দিরের সামনে। মন্দিরের পিছনে পুকুর। পুকুরের ওপারে বোধহয় চাঁদ উঠেছে।

ওঃ, মন্দির যখন শেষ হবে, তখন এমন বাহার দেবে!

কে; কে ওখানে? মন্দিরের সামনে উপরের দিকে মুখ করে কে দাঁড়িয়ে আছে? জনাব এগিয়ে এল। সে বিস্মিত হয়ে গেল। শ্যামাদাস বাবু উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জনাবের বুঝতে দেরী হল না, বাবু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে মন্দিরটাকে ছকে দেখে নিচ্ছেন।

হুজুর?

শ্যামাদাস বাবু চমকে উঠলেন।

আজ্ঞে, আমি জনাব। সেলাম। তাহলে যাই আমি।

একে বলে—কাল থেকে জোর দিয়ে কাজ আরম্ভ কর। একে বলে—বড় হোক ছোট হোক তাড়াতাড়ি শেষ কর।

যো হুকুম।

জনাবও একবার আকাশের দিকে তাকালে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গোটা মন্দিরটা।

মন্দিরের কাজ জোর চলছে। খাঁজে খাঁজে অল্প অল্প ভেঙ্গে চারখানি দেওয়াল পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে উঠে চলেছে। মন্দিরের চূড়ার মাঝখান ছাড়িয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। জনাব ভারার উপর দাঁড়িয়ে দেখে। হুই দেখা যাচ্ছে তাদের পাড়ার মসজিদের মিনার। ও মিনারের আধখানা জনাবের হাতের গড়া। যে বৎসর সে ফিরল, সে সালটা পুরানো লোকের সবার মনে আছে,

বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। দু-তিন বাঁশের উপরে বাঁধা ভারা যখন ঝড়ে দোলে তখনই জনাবের সে দিনকার কথা মনে পড়ে। দুনিয়াটা দুলে গেল ঝড়-ভাঙ্গা বাড়ীর মত। বড় বড় দালান ভেঙ্গে পড়ল। ছাদে ফাট ধরল। সে ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেল মসজিদের দক্ষিণ তরফের মিনার। এ গাঁয়ে তখন দালান কোথা? হরিশবাবুর দালান, এই শ্যামাদাস বাবুর দালান হয়েছে সবে। রায় বাবুদের একতলা দালানটাকে সে ইমারতই বলে না। ইটের পাঁজা। পলেস্তারা নাই, পয়েণ্টিং পর্যন্ত না। আরে, আসল মানুষের গাঁথনিটা তো হাড়ের, গাছের ভিতরটা তো কাঠ; হাড়ের কাঠামোর উপর মাংস লাগিয়ে পঙ্কের কামের পলেস্তারার মত চামড়া দিলে তবে না সে মানুষ, গাছের গায়ে বাকল না হলে কি সে গাছ? নোনা ধরেছে এর মধ্যে।

মিনারটার মাপ তার মনে আছে। তার ইচ্ছা ছিল মিনারটাকে আরও খানিকটা উঁচু করে সে তৈরী করে, কিন্তু তা হলে উত্তর তরফের মিনারটার সঙ্গে বেমানান হত। অনেক ভেবে তার মনে হয়েছিল, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ দিকেরটা হোক না বড়। পাশাপাশি ছোট বড় তালগাছ দাঁড়িয়ে থাকে সেকি খারাপ লাগে দেখতে? গড়তে পারলে বেমানানের মধ্যে এমন বাহার আনা যায়। সে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যায়। ট্যারা কামিন টুনীর দিকে সব মাতালের মত চেয়ে থাকে, অথচ ওটা কেউ ধরতে পারে না। মুশকিল তো ওই, সমঝদার লোক মেলে না! বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হলে বুঝতে পারে। এখানকার লোকে বুঝতে পারে নাই তার কথা। সেই পুরানা মাপে উত্তরের মিনারের সঙ্গে জুড়ি মিলিয়েই গড়তে হয়েছিল তাকে। হায় আল্লা, নিজের বাড়ির দিকে কেউ খেয়াল করে চেয়ে দেখে না। আপনার বাচ্চাদের বড় থেকে ছোট তক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখ দেখি।

আঃ! একটা ছোট্ট ইটের টুকরো লেগেছে জনাবের হাঁটুতে। কে? হুঁ! রসিদটা ছুঁড়েছে মতির গায়ে। দুটোতে চুলবুল করছে। গম্ভীর ভাবে জনাব বললে, কাম কর, রসিদ। কাম করে যা।

মসজিদের মিনারের চেয়ে মন্দির উঁচু হবে অনেক।

মাধববাবুর তিনতলা দালানটাই এখানকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। তিনতলার ছাদের সিঁড়ির মাথাটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ওই-টাই এখানকার সবচেয়ে ভাল বাড়ি। কলকাত্তার মিস্ত্রী এসে ওর চারিপাশে নক্‌শা কেটে গিয়েছে। থামের মাথায় কার্নিশে কারিগরি করে গিয়েছে। হাঁ, সে লোকটা মিস্ত্রী একটা। বিলাইতী মাটি আর বালিতে কার্নিশের মাথা জমিয়ে কেটে কেটে বার করত নক্‌শা। দুই হাতে সাদা ফুল। ঠোঁটে গালে সাদা ফুল। খাটো মানুষটা, পাজামা পরত। মাথায় দিত মখমলের কালো টুপি, গায়ে রঙিন কামিজ। নক্‌শার মিস্ত্রী ভাল। ছাদ খিলানের কিছু জানে না কিন্তু। সে ছাদ খিলানে এই জনাব আলী শেখ।

এখানকার ওই পুরানো কয়টা মন্দির—মস্‌জিদের গম্বুজের খিলান ছাড়া তামাম ছাদে জনাবের কর্নিকের দাগ আছে। ভূমিকম্পে সব ছাদে ফাট ধরেছিল। জনাব কতক তার তুলে ফেলে নতুন তৈরী করেছে। কতক—যে সব ফাট অল্প অল্প, সেসব বহুত হুশিয়ারির সঙ্গে মেরামত করে জোড় মিলিয়ে দিয়েছে। বেমালুম জমে ফের এক হয়ে গিয়েছে। বড় বড় সার্জন ডাক্তার ভাঙা হাড় কাটা অঙ্গ জুড়ে দেয়—এমন জুড়ে দেয় যে, একটু দাগ ছাড়া কিচ্ছু বুঝতে পারা যায় না, তাও কাটা চামড়া সেলাই করলে তবে দাগটা থাকে, নইলে বে-মালুম জুড়ে যায়। শুধু জুড়েই যায় না, ঠিক সহজ শরীরের মত জোরালো হয়। জনাবের ছাদ জোড়ার কেরামতিও ঠিক তেমনিই। এক ফোঁটা জল পড়ে না আজও।

শ্যামাদাসবাবু ডাকলেন নিচে থেকে, জনাব!

বাবু!

ঝিনুক তাহলে কিনতে আরম্ভ করি? এনেছে আজ কজন।

হ্যাঁ, হুজুর। উয়াতে আর কথা কি!

পঙ্ক-চুন তৈরী হবে। মন্দিরের একদম মাথার অংশটা পঙ্ক চুনে পলেস্তারা হবে—মাজাই হবে। নেশা ধরেছে শ্যামাদাসবাবুর।

চার দেওয়ালের উপর 'পারা লেবেল' বসিয়ে দেখলে জনাব, মাছ-খানে চার কোণায় বসিয়ে দেখে নিলে—ঠিক আছে, ঠিক মাঝখানটিতে মুক্তার দানার মত টলটল করছে পারা।

ঠিক হ্যায়, চালাও, হাত চালাও হুঁশ করে রসিদ, হুঁশিয়ারী করে কাম করবি।

ইটের উপর কর্নিকের ঘা পড়েছে খনখন—খন-খন। চূড়ার কাটান যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে লোহার কড়ি বেরিয়ে নিচের দাওয়ার কিনারায় গোল থামের মাথায় বসেছে। বরগা পড়েছে, তার উপর হচ্ছে ছাদ। কামিনের দল তালে তালে কোপা পিটছে, বাজনা বাজছে যেন। জনাব ভারা বেয়ে নেমে গেল ছাদে; মাটির বড় জালায় মসলা ভিজানো জল রয়েছে, জনাব নিজ হাতে মগে ভরে সেই জল ঢেলে দেয়। চালা দিদিরা—হাঁ। এক ঘা বেশি জোরে এক ঘা কম জোরে যেন না হয়। আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা!

যে দিকে বারান্দার ছাদ পিটছিল কামিনরা, তার বিপরীত দিকে গিয়ে জনাব দাঁড়াল। ডাকলে, ঠাকুরঝি, ইদিকে ভাই শুনতো একবার।

ঠাকুরঝি এখন প্রৌঢ়া—এককালে সে জনাবের পাশে থাকত, মতির এবং দাসীর মত। প্রৌঢ়া এসে দাঁড়াল।

নিম্নস্বরে জনাব বললে, মতিটার সঙ্গে রসিদটার কাণ্ডটা কি রকম বল দেখি?

ঠাকুরঝি একটু বিরক্তিভরে বললে, মরন, ওই আবার শুধাতে হয় নাকি?

হুঁ।—জনাব উঠে চলে গেল।

ঠাকুরঝি আপন মনে বললে, মরন, বুড়ো-বয়সে উ দিকে চোখ কেনে?

জনাব কাজে লাগল। হঠাৎ বললে, উহুঁ, ই হচ্ছেনা। মতি, তু নিচে ছাদের কাজে যা গো। এত উপরে ভারায় তু লারবি; হেই রানী, তু উপরে উঠে আয় গো।

রানী মধ্যবয়সী মেয়ে। সে সম্ভ এ পদ থেকে খারিজ হয়েছিল।

মন্দিরের গাঁথনি শেষ করে জনাব দাঁড়াল মাথায় কলস বসাবার শিকটা ধরে।

শ্যামাদাসবাবু নিচে দাঁড়িয়ে দেখলেন, জনাবকে দেখাচ্ছে ঠিক তাঁর মত খাটো-মাথার মানুষ। খুশী হয়ে উঠল তাঁর মন। তবু মনটা খুঁতখুঁত করে। অনেক টাকা বেশী খরচ হয়ে গেল—অনেক টাকা।

জনাব দেখছিল গ্রামের ঘরবাড়ি। গাছপালার মাথার উপর দিয়ে তার নজর চলেছে—ওই নয়াগাঁ, ওই বামুনপাড়া, ওই দেবীপুর। ওই মাঠে চৌধুরী দিঘি, ওই নয়ানজুলির মাঠ, ওই নদী কিনারের আঁকা-বাঁকা জঙ্গল ; ওই সরকারী পাকা সড়ক লাল ফিতার মত চলে গিয়েছে—পুতুলের মত লোক চলেছে, গাড়ি চলেছে—বাহবা, বাহবা! বুড়ো বয়সের ছাতিও তার দুলে উঠল।

এইবার পলেস্তারা, নক্‌শা, কার্নিশ, বিট, পাতলা ছুরির মত ধারালো মিহি কর্নিকের কাজ। কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছকে নিতে হবে নক্‌শা। সাদীর কনেকে যেমন টিপ দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজায়, তেমনই করে সাজাবার পালা।

ভারা থেকে সে নেমে এল। শ্যামাদাসবাবুকে সেলাম করে বললে, সেলাম হুজুর, দেখে লেন কাম! ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে এসে কাম দেখে লেন।

ঠাকুরঝিকে ডেকে বললে, শুন ইদিকে।

পকেট থেকে নীল কাগজে মোড়া দুটি সোনার কানের টাব তার হাতে দিয়ে বললে, মতিকে দিস। আর এই লে ভাই, তুর। একটি টাকাও তার হাতে দিলে।

মতিকে ?

হ্যাঁ। মন্দির শেষ হল। বকশিশ দিলাম লাত বউকে।

কি বলব।

আমি কিছু বুলব না। সে তার যা খুশি হয় করবে।

ঠাকুরঝি যেতে যেতে বললে, মরন!

আজ মাসখানিক পরে জনাব সন্ধ্যায় হুঁকায় তামাক খেতে খেতে ভূতুরে বটগাছতলায় গিয়ে বসে। এখান থেকে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। ইমারতগুলো আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কিছু যেন নড়ছে জমিনের উপর। এগিয়ে আসছে।

* * *

পলেস্তারা চলছে। হঠাৎ সেদিন জনাব এল না। শ্যামাদাসবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কি হল?

রসিদ হেসে বললে, ভীমরথি হয়েছে বুড়ার হুজুর। খারাপ ব্যামো হয়েছে।

খারাপ ব্যামো? কি বিপদ! কি ব্যামো?

ওই কামিনগুলাকে নিয়ে মাতামাতি করে হুজুর এই বুড়া বয়সে।—হাসলে রসিদ।

রাম রাম রাম।

কিছু ভাববেন না বাবু। আমরা কাম ঠিক বাজিয়ে দোব আপনার।

এই ব্যাধি জনাবের ছিল—প্রথম হয়েছিল বর্ধমানে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয়। আবার নতুন করেও হয়। জনাব যায় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বলেন, কি জনাব? একটু হাসেন সঙ্গে সঙ্গে।

জনাব সকলের সামনেই বলে রোগের নাম। বলে কাজকাম হাতে রয়েছে, জলদি সারিয়ে দিতে হবে। টাকা ধরে দেয় ডাক্তারের টেবিলের উপর।

আগে ইন্‌জেক্‌শন ছিল না। এখন ইন্‌জেক্‌শন উঠেছে। জনাব সব হাল-হদিস জানে। সকাল থেকে কোনকিছু না খেয়ে খালি পেটেই এসেছে। সে তার মোটা মোটা শিরওয়ালা হাত একখানা বাড়িয়ে দেয়; কনুয়ের ভাঁজের জায়গাটায় তাকিয়ে দেখে। ওখানটার শিরাতেই ডাক্তার সুচ ফুটিয়ে দেবে। বহুৎ তারিফের হাত ডাক্তারবাবুর। পুট করে সুচটি ফুটিয়ে চালিয়ে দেবে শিরার মধ্যে। বহুৎ পাতলা হাত। ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে একটু বসে সে চলে যায় বাড়ি।

অদ্ভুত বাড়ি জনাবের। মাটির দেওয়ালের ভাঙা ঘর। সামনে এক পাকা বারান্দা। গোল থাম, পাকা ছাদ, পাকা মেঝে। সেই বারান্দার উপর বিছানা পেতে সে শুয়ে পড়ে। ইন্‌জেক্‌শনের পর জ্বর আসবে। বাড়িতে কেউ নাই। হামিদনের মৃত্যুর পর সে আর নিকা করে নাই। ইচ্ছাই হয় নাই। কি করবে সে নিকা করে? রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রানী সই,

মতি নাত বউ, দাসী নাতনী এদের নিয়ে দিন কাটছে তার, কি করবে সে নিকা করে? এক হামিদন এসেছিল তার জীবনে, সেও জানটাকে দিয়ে গেল গোনাহ্‌গারির মাশুল। আবার নিকা? নিকা করে সে মানুষকে কষ্ট দিয়ে কাজ কি? ওদের তো সে ছাড়তে পারবে না। সে জানে। অহরহ কাজকামের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাত লাগে, চোখে চোখ রাখতে হয়, পায়ে ইট্‌ পড়লে 'আহা' বলে, যাদের চুল মুখে এসে পড়ে ঝুঁকে ইট-মসলা দেবার সময়, ভারার উপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয় আঁচল দিয়ে তাদের উপর দিল না পড়ে উপায় কি। এমন কোন রাজমিস্ত্রী সে তো দেখলে না, যে এদের দিল্‌ না দিয়ে পারলে। তবু তারা বিয়ে করে। করুক, জনাব করে নাই।

সে জানে খোদাতালার দরবারে এটা তার গোনাহ্‌। তার এই পাপ—'জেনার' জন্য গোনাহের গোনাগারি তাকে দিতে হবে। দুনিয়ার মানুষকে সে দেখছে। ভাল মানুষ আছে বই কি। এই দুনিয়ায় পয়গম্বর আছেন, ইমানদার মানুষ আছেন, তাইতো দুনিয়া আজও আছে। নইলে দুনিয়া ফেটে চৌচির হয়ে যেত মানুষের পাপে। ওরা বাদে বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে, ঘুষ নিচ্ছে, চুরি করছে, জেনা-ব্যাভিচার করছে। সে সুদ খায় না, ঘুষ নেয় না, চুরি করে না। দস্তরী অবশ্য নিয়ে থাকে; সে মালিকে জানে—ঘুষ আর চুরি জানিয়ে করা হয় না। দস্তরী দস্তরী—সে তার পাওনা। সেও কার গোনাহ্‌ নয়। এক গোনাহ্‌ এই। সেই পাপের ভার আর বিয়ে করে সে বাড়াতে চায় না। স্ত্রী বর্তমানে এই অন্যায় আরও গোনাহ্‌।

সে বলে, আল্লাহ্‌তালা খোদাতায়ালা—মহম্মদ রসুল আল্লাহ্‌! আমার এই গোনাহ্‌টুকু মাপ কিয়া যায় হজরত।

অনেকক্ষণ পর সে আবার বলে, যদি গোনাহ্‌গারি দিতে হয়, মাফ যদি নাই কর, সাজা দিয়ো তুমি।

জ্বরের ঘোর কমে আসে; জনাব উঠে বসে। দুটো ইন্‌জেক্‌শনেই জনাব তাজা হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে রোগের লক্ষণ আর কিছু

নাই। বাবড়ি চুল আঁচড়ে গামছায় মুখ মুছে গায়ে ফতুয়া দিয়ে চটি পায়ে সে এসে দাঁড়াল মন্দিরের কাছে।

বুড়ো হয়েছে জনাব। রাগ যেন চট্ করে হয়ে যায়। রসিদকে সে সজোরে এক চড় মেরে বসল। বেইমান কোথাকার! শয়তান কোথাকার!

রসিদ হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর রুখে উঠল!

জনাব গর্জে উঠল, চিল্লাস না। এখানে চিল্লাস না। গর্দানা ধরে নিকাল দিব। ইখানে চিল্লাস না। তুর বাপ স্থদি কারবার করে, আমি টাকা ধারি না; তুর বাপের অনেক জমিন আছে—আমি কৃষাণ নই। তু ওই মতির সর্বনাশ করেছিস। নিজের বেমার উকে দিছিস। তুর নিজের জোয়ানি বয়েস, বেমার ধরিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিস না। তোবা, তোবা! হারামী —হারামী তুই! নিকাল হামরা হিয়াসে!

রসিদ তার যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে গেল।

জনাব মতির কাছে এসে দাঁড়াল। মতি ভয়ে কাঁপছিল। জনাব একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে, যা, তুকে আর কিছু বলব না। তুদের জাতটাই এমন।

ছুটির সময়ে বললে, ডাক্তারকে আমি বুলে রেখেছি। যাস। ডাক্তার ফুড়ে ওষুধ দিয়ে দেবে। জর আসবে, ইখানে শুয়ে থাকবি। ছুটি হলে বাড়ি যাবি। এই কাঁচা বয়সে এখন থেকে ঘুন ধরাস না শরীলে।

আবদুল বললে যাবার সময়, রসিদকে মেরে ভাল কর নাই ওস্তাদ। ওর বাপ---

জনাব হা-হা করে হাসলে। —কি করবে আমার?

রসিদ এবং রসিদের বাপ কিছু করতে পারত কি না ঠিক পরখ হল না। মাস দুয়েকের মধ্যে মন্দির শেষ হতেই জনাব চলে গেল এখান থেকে।

এ জেলার পাশেই জেলা সাঁওতাল পরগণা, সেখানে সাহেবান পাদরী বাবালোক বড় আড্ডা করেছে। সাঁওতালদের কেরেস্তান ধর্ম দিয়েছে। লেংটুর বদলে পাতলুন পরেছে, মেয়েরা ঘাঘরা পরে, বাবুলোকের মেয়েদের মত ভাল ভাল শাড়ি পরে, জুতা পরে, জামা পরে, খোপা বাঁধে,

লেখাপড়া শেখে। সেখানে এক বড় ভারী গির্জা হবে। বড় বড় খিলান, বহুৎ উচু চূড়া হবে, চাঁপার কলির মত গড়নের গোল চূড়া ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠে মিলে যাবে স্থচালো হয়ে। খিলান—গোল খিলান নয়—ঠিক ইস্কাপনের মাথার মত না হলেও ঐ ধরনের মাথাটি হবে—একটি বাহারের কোণ তৈরী করে মিলবে।

জনাবকে খবর দিয়েছে তারই জানা ঠিকাদার। জনাবের খিলানের পাকাহাত সে জানে।

মতিবালা খবরটা শুনে কাঁদলে।

জনাব বললে, যাবি আমার সঙ্গে ?

মতি চুপ করে রইল। সে পারবে না।

জনাব নিজেই বললে, নাঃ। যেয়ে কাজ নেই তোর। ঘর থেকে পা বার করলে তোরা আর থামবি না। ভাগবি আমাকে ফেলে কারুর সঙ্গে। তাছাড়া মরেই যদি যাই আমি তো তোর কি হবে ?

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, আমি রসিদকে বলে যাব! ওই তোকে দেখবে, বুঝলি! হেসে আরও বললে, আমি জানি তুর মনের আসল টানটা রসিদের উপর।

রসিদকে ডেকে বললে, গোসা রাখিস না ভাই। আমি চললাম। দেখিস, তু মতিকে দেখিস, মেয়েটা ভাল।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে একবার সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখলে। ওই মন্দির—মন্দিরের উপরে পঙ্কের পালিশ বকের পালকের মত ঝলমল করছে। মাথার উপর পিতলের কলস ঝলমল করছে। ওই মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিনার।

আবার সে ফিরল। সাঁওতাল পরগণায় লালমাটির টিলা, সেই টিলার উপর সাহেবানদের গির্জা হবে! চাঁপার কলির মত গোল ক্রমশঃ সরু স্থচালো হয়ে উঠবে গির্জার চূড়া।

* * *

শ্যামাদাসবাবুর মন্দির এবং জনাব নিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাবের কথা শেষ হয় নাই। সামান্য কয়েকটি কথা।

তিন বৎসর পর। জনাবের শেষ দশা। হয়তো আট দশটা দিন কি দু-একটা মাস কিংবা মাত্র কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে। সাঁওতাল পরগণা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে সে ফিরে এসেছে। অনেক ব্যাধি, তার মধ্যে পেটের অসুখটাই প্রধান। জীর্ণ শরীর, দেখলে চেনা যায় না, বাবড়ি চুল আছে, কিন্তু তার অধিকাংশই উঠে গিয়েছে। নাকের হাড়টা খাঁড়ার মত উঁচু হয়ে উঠেছে; মোটা হাড়গুলি সার হয়েছে, হাতের আঙুল ঠক ঠক করে কাঁপে। জনাব তবু সেই জনাব। ফিরে এল, সঙ্গে এক ওখানকার সাঁওতাল মেয়ে! বোধ হয় কেরেস্তান। ঘাঘরা না পরলেও বেশ কায়দা করে কাপড় পরে, চুল বাঁধে চমৎকার ছাঁদে। সাধারণ সাঁওতাল মেয়ের মত নয়। পুরানো লোকে বললে, তাজ্জব! একেবারে সেই রঙ্গুর মত দেখতে।

মাস খানেক পর সেদিন জনাব বসেছিল সেই বুড়ো বটতলায়।

তার বাড়ি তিন বৎসর না ছাওয়ানোতে ভেঙে পড়ারই কথা। কিন্তু একেবারে ভেঙে সেখানে নতুন ঘর হয়েছে। জমিদারের বাকি খাজনার নালিশে নীলামে রসিদ আলির বাপ সেটা কিনে পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘর তুলেছে। রসিদ এখন ঠিকাদারি শুরু করেছে; তার চুণ, সিমেণ্ট আরও মালপত্র সেখানে থাকে। মতিবালা সেখানে বাঁধা কামিন এখন।

জনাব প্রথম দুটো দিন আবদুলের বাড়ির দাওয়াতে ছিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দাওয়ার আশে পাশে লোক ঘুরতে দেখলে জনাব। সাঁওতাল মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জনাব তাকে আগলে জেগে বসে রইল। সকালে উঠে বাজারের ভিতরে একটা ঘর ভাড়া করলে। হাজার হলেও বাজার, এখান থেকে একটা মানুষকে জোর করে তুলে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। জোরের কিন্তু দরকার হল না; দিন বিশেক পরে মেয়েটাই চলে গেল—রসিদের আড়তে নয়। তার বাড়িতে—রসিদ তাকে কলমা পড়িয়ে নিকা করবে।

জনাব আবদুলকে বললে, দুটো করে রান্নাভাত আমাকে দিবি, পয়সা আমি দোব।

আবদুল বললে, তুমি ওস্তাদ। তুমার কাছে কাম শিখেছি। এ আমার ভাগ্যি। তুমি এইখানেই থাক। তবে পয়সা আমি লিব না।

খুশী হল জনাব। আল্লাহ্‌ তায়ালার দুনিয়া রসুলে আল্লা হজরত মহম্মদ এসে দিয়ে গেলেন; কোরান শরিফ, এসব কি বরবাদ হতে পারে? ইমানদার মানুষ আছে বই কি! সে বললে, বেশ, তবে আমি মরে গেলে নিবি। আমাকে ওই বটতলায় একটা ছোট ঘর—চালাঘর বানিয়ে দে। ওখানেই আমি থাকব।

সেকি!

হা। চোখের উপর আমি দেখতে পারব না আবদুল। তার চেয়ে নিরালায় বেশ থাকব আমি।

সে কিছুতেই তার গোঁ ছাড়লে না।

একটা চালাঘর।

সামনে কতকগুলো ইট। জনাব বলে, মেঝেটা বাঁধিয়ে নেব। তারই কতকগুলো সে বিছিয়ে নিয়েছে বটতলায়, সেখানে বসে থাকে।

আষাঢ় মাস। ঘনঘটায় মেঘ করে এসেছে, আকাশ যেন ভেঙে পড়বে। বৃষ্টি আসবে। জনাব উঠতে চেষ্টা করলে, পারলে না। আবার সে বসল। ওই চালাঘরে গিয়েই বা কি হবে, এ জল আটকাবে না। জোর হাওয়া দিলে হয়তো ভেঙে চাপাই দেবে। আবদুলের দাওয়াতে গেলেই বা কি হত? ঝাপটায় ভিজতে হত। নিজের ঘর থাকলেও ভাঙা চাল—দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে জল আসত। এ নয় তার চেয়ে কিছু বেশি।

ঘন কালো মেঘ। কালো রঙ মিশানো সিমেণ্ট করা মেঝের মত বাহার খুলেছে। বাহবা! বাহবা! ওকি, মন্দিরটা নয়? কালো আকাশের গায়ে সোনার বরণ কলস—কয়েকটা দানাবাঁধা বিজলির মত ঝকমক করছে, তার নীচে পঙ্কের পলেস্তারা করা দুধ-বরণ মন্দিরের মাথা। আহা—হা! চোখ ফেরালে সে। আকাশ-জোড়া কালো মেঘের পালিশের গায়ে হলুদ বরণ করে মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি। সোনার বরণ বহুড়ীরা জানালা ধরে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখছে। নিচের তলার বৈঠক-

খানা ঘরে বাবুরা মজলিশ করে বসে গরম চা খাচ্ছে। বাচ্চারা সব বারান্দায় ছুটাছুটি করছে। তার হাতে গড়া—তার হাতে সারা ছাদ। কোন ভয় নাই—যত জোর আসুক বৃষ্টি, এক ফোঁটা গলে পড়বে না। আনন্দে রহো, আরাম করো। আরও একটু দৃষ্টি ফিরিয়েই—ওই আর এক টুকরো দালান! কার চিলেকোঠা—কালো মেঘের গায়ে ভাসা বাড়ির মত মনে হচ্ছে? কবুতরেরা, কাকেরা, পেঁচারা আলসের নিচের খোপে খোপে গিয়ে ঢুকেছে, গলা ফুলিয়ে চুপ করে সব বসে আছে। এ খোপ রাজ মিস্ত্রীরাই রাখে। থাকুন সুখে আরামে মৌজ করে মালিকরা ঘরের অন্দরে, পাখিরা থাকবে খোপরে খোপরে। থাক্, তোরা আরামসে থাক। খোদাতায়ালার কাছে কলকল করে বলিস—জনাব আলির জেনার গোনাহ্, যেন মাফ করেন। আর গোনাহ্, তার নাই। আবার দৃষ্টি ফেরালে সে, এদিকে কোনকিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ—শুধু মেঘ। বাহারে! চমৎকার মেঘতো এ দিকটার। সাদায় কালোয় যেন ভাঙা-গড়া চলছে লহমায় লহমায়। ওই দিকটা দিয়েই সে সাঁওতাল পরগণা গিয়েছিল। বাঃ, সাদা মেঘ ঠিক যেন গির্জার চূড়া হয়ে উঠেছে। চাঁপার কলির মত গোল মিনার ক্রমশঃ সরু সূচালো হয়ে মিশে গিয়েছে। দুনিয়ার সব দুঃখ সে ভুলে গেল। দৃষ্টি ফেরালে সে আবার।

আঃ, ওই যে মসজিদ—ওই যে তার হাতে গড়া মিনার! ঝপঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতালার নিজের হাতে গড়া ইমারত।

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।

নজরুল ইসলাম

……………………………………………………………………

পদ্ম গোখরো

রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল। লোকে কাণা-ঘুসা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাউদ্দীনের প্রদীপের সাহায্য ছাড়া কেহই এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের কোনো জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য, কিন্তু সে জমিদারী কয়েক বৎসরের মধ্যেই "ছিল ঢেকি হ'ল তুল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্মূল" অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাঁদের এই দুরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণ-লঙ্কা দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইল। এমন কি তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চয়ই কোন খান্দানী জমিদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ীর মেয়ের সহিত বিবাহ হইল, সে বাড়ীর বংশ মর্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম ত নয়ই, বরং অনেক বেশী।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারি পাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অত রূপ, অমন বংশ-মর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়াব-পুত্রের কোন উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ী হইবে—ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে দরিদ্র মক্তব-

শিক্ষক মীর সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই। এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপের খ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর-বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা!

পিতার মন খুঁত-খুঁত করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জল মুখ দেখিয়া গভীর প্রশান্তিতে পুরিয়া উঠিল।

আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভ-দৃষ্টির সময় উভয়ের ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চিররুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদ্‌গদ্‌ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৌমার আসার পরেই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনা-দানায় ভ'রে উঠবে।"

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের "পয়" বলিয়া কোনো জিনিস আছে কি না জানিনা, কিন্তু জোহরার মীর বাড়ীতে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয়রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্বপুরুষের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীর বাড়ীর এই অপূর্ব পরিবর্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতুহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়ত বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি দিয়া সেই ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ

সর্পের গর্জনের মত একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলা বাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ী পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সু-নজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল, সত্য সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশী দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ও সাপটাকে মারতেই হবে, নইলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ!" বলিয়াই বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধধবল গোখরো সাপ বাহির হইয়া আসিল, মস্তকে তাহার সিন্দুর-বর্ণ চক্র বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, "মারিসনে, মারিসনে, ও বাস্তু-সাপ। দেখছিস নে, ও যে পদ্ম-গোখরো!"

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্ম-গোখরো-রূপী বাস্তু-সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পিতলের কোন কিছু আছে।"

আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "কই রে, সে রকম কোন শব্দ তো শুনিনি।"

আরিফ বলিল, "আমরা তখন সাপের ভয়ে অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়ত শুনতে পাইনি।"

পিতা-পুত্রে সন্তর্পণে দেওয়ালের দুই চারিটা ইট সরাইতে দেখিতে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কি চক্চক্ করিতেছে।

পিতা-পুত্রে তখন পরম উৎসাহে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন, তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসী বাদশাহী আশ্‌রফীতে পূর্ণ। কিন্তু এই কলসী উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসী উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল সেই কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটি পদ্ম-গোখরো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ঐখানে!"

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়। প্রথমটা ওই দিকে চ'লে গেছে, আমি দেখেছি।"

কিন্তু এ সাপটা প্রথমটাই হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কলসী ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম-গোখরো মারিতেও নাই।

কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখরো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে। জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসীর একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসী ত্যাগ করিয়া শান্ত ভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসী তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে কিছু করিল না। এক মনে দুগ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঝি পোকার মত এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্ম-গোখরো আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল, "ওই আগের সাপটা! এখনো গায়ে খোচার দাগ রয়েছে! আহা, দেখেছ কী রকম নীল হয়ে গেছে!"

আরিফ ও তাহার পিতামাতা অবাকবিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিল না যে, তাহাকে সাপে কামড়াইতে পারে! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিল।

কলসীতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কী করিবে, কোথায় রাখিবে—ভাবিয়া পাইল না।

শ্বশুর শাশুড়ী অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, "সত্যিই মা, তোর সাথে মীর বাড়ীর লক্ষ্মী আবার ফিরে এল !"

কিন্তু এ সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামে আর কেহ জানিতে পারিল না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমান ক্ষুদ্র মীর-পরিবারের সহজ জীবন-যাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। কিন্তু বধূর "পয়" দেখিয়াই বোধ হয়—আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বৎসর দুয়েকের মধ্যে মীর-বাড়ীর পুরাতন প্রাসাদের পরিপূর্ণরূপে সংস্কার হইল। বাড়ী-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কনট্রাক্টরী হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

কোন কিছুরই অভাব থাকিল না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

এই অর্থ প্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্ম-গোখরো যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়তো দুধ কলার লোভেই তাহারা জোহরার পিছু পিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু-সর্প—মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায় !

অবশ্য সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত ধীর ভাবে বাড়ীর সর্বত্র চলাফেরা করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। তবু জাত সাপ ত ! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতামহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও একপ্রকার অসম্ভব ! তাহারা যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না।

জোহরা হয়ত রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, শাশুড়ী দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ-শাশুড়ী খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু-সর্পদ্বয় আসিয়াই বধূর ডালের বাটীতে চুমুক দিল! দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

ভয়ে শাশুড়ীর পেটের ভাত চা'ল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় পালাইয়া বাঁচিল।

গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখরোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চীৎকার করিয়া পালাইয়া আসিয়া বাহির বাটীতে শয়ন করে।

জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মত তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়!

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে! আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনীদের মত নির্বিকার নিঃসঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুইটী যমজ সন্তান হইয়া আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতিপটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-চিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু-যুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজ বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী-মাতার সমস্ত হৃদয় মন করুণায় স্নেহে

আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মত সে ঐ সর্প শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহে তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোন উপায়ও নাই। তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যত-ফণা ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিস্ফল আক্রোশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ—তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না! রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার তো কোন অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধবশে বলিয়াছিল, "জোহরা, তোমাকে ছেড়ে চাইনা এই ঐশ্বর্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে! এর চেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশী শান্তিময় ছিল।"

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রু-ভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে! বলে "ওরা আমার ছেলে। ওরা ত কোন ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না ত ওরা।"

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, "তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম! আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না! এর চেয়ে যদি ওরা সত্যি সত্যি দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশী সুখের হ'ত!"

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে। ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছুদিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়ত সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে!

একদিন প্রত্যুষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, বহুদিন বাপের বাড়ী যাওনি, তোমার বাবাকে দু'তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এস।"

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতামাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণ-কান্তি স্বর্ণ ভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র পিতামাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু' একদিন যাইতে না যাইতে পিতামাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "হাঁরে, আরিফকে চিঠি লিখব আস্‌তে?"

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, "না মা, উনি ত শনিবারেই আস্‌বেন।"

জামাই আসিল, তবু কন্যার মুখে পূর্বের মত সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, "সত্যি বলত জোহরা তোর কি জামাই-য়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?"

জোহরা ম্লান হাসিয়া বলিল, "না মা! উনি ত আগের মতই আমায় ভালবাসেন! বাড়ীতে আমার দুটী খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।"

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ীর প্রথামত সেই সন্তান দুইটিকে বাড়ীরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া এ কথা বলিল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কোন কথা কেহ বলে না। জোহরার পিতা-মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশী ক্রুদ্ধ হইল। কি তাহার অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী

প্রতি শনিবারে আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, "বাবা! জোহরা ত একরকম খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে! ওর-কি কোন রোগ বেরামই হ'ল, তাও ত' বুঝতে পারছিনে—দিন দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে!"

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্প-তত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়ত সেই সাধনাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে।

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসুলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দুটিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই একদিনই তাহারা কি উৎপাত না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ীর কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহারা জোহরাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

উদ্যত-ফণা আশীবিষ! তবু সে কি তাহাদের কাতরতা, মিনতি! একবার আরিফ, একবার তাহার পিতা—একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালায়।

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমান-ভরে তাহাদের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, "বাবা, জান ত আমরা কত গরীব! মেয়ে ত' শয্যা নিয়েছে। দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা ত দূরের কথা। মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছুদিনের জন্য ওকে কলকাতায় বা বাড়ীতে নিয়ে যাও। তারপর ভাল হলে ওকে আবার রেখে যেয়ো!" বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্থির হইল, আগামীকল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল, তাহার শিয়রে কে একজন উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় আর একজন লোক—বোধ হয় স্ত্রীলোক, জোহরার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে! ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; তাহার চিৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোক ডাকাত! সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিল যেন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বেই আর একটি কামরা—স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা ষ্টীলের বাক্সে জোহরার গহনা-পত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা!

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনাপত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, "তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলঙ্কার, ও কয়টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক্, তোমাকে ত চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিস তোমার কাছে থাক্। আর তা ছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না।"

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল ঐ মেয়ে ডাকাত আর কেহ নয় সে তাহার শাশুড়ী—জোহরার মাতা!

দুদিন আগের ঝড়ে ঘরের কতকগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশ-পথে আকাশ-পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্রকিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ী সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোঁটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই

আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে! তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিত এ পৃথিবী!

সে আর উচ্চবাচ্য করিল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। সে দেখিল তাহার শাশুড়ীর পিছু পিছু তরবারিধারী ডাকাত বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন পথে দেখিতে পাইল, ঐ ডাকাত আর কেহ নয়—তাহারই শ্বশুর!

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটী বাটি বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিল! ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতে কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শাশুড়ী তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাঁহাদের সর্বনাশ করিয়াছে।

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া, বিস্ময়বিমূঢ়ার মত চাহিয়া রহিল।

আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার কে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখুনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।"

বলা বাহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ীর ক্রন্দন থামিয়া গেল। শ্বশুর শাশুড়ী দুইজনে পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, "কে বাবা সে চোর? দেখেছ? সত্যিই দেখেছ তাকে?"

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "জি হঁা, দেখেছি! কলিকাল কি না, তাই সব কিছু উল্টে গেছে, যার চুরি গেছে, তারি চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!"

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল এবং ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে, হয়ত এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে!

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল! তাহারও মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর আরিফ বলিল, "সে এখনি এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এ নরকপুরীতে সে আর এক মুহূর্তও থাকিবে না।"

শ্বশুর-শাশুড়ী যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমন কি জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙ্গাইল, পিতা-মাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, "আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোনো অপরাধ করিনি!"

আরিফ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজী হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে।

স্বামীর নির্দেশ মত জোহরা পিতা-মাতাকে আর কিছু প্রশ্ন করিল না।

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জামাতার হাত ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসিমুখে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে না। অন্ততঃ সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়।

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এ বাড়ীর বায়ুতেও যেন কিসের পূঁতিগন্ধ। তবু সে খাইয়া যাইতে রাজী হইল, সে আজ দেখিবে—মানুষের ভণ্ডামীর সীমা কতদূর!

জোহরা যত জিদ্ করিতে লাগিল, সে এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ করিবে না, আরিফ ততই জিদ্ ধরিল, না, সে খাইয়াই যাইবে।

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমির পর বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূছিতা হইয়া পড়িল! সে মূর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটা কথা বলিয়াছিল—"রাক্ষুসী"!

আরিফের বুঝিতে বাকী রহিল না, সে কি খাইয়াছে।

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না। এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতামাতাকে বলিয়া যাইবে। সে উর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই সে ভীষণ রক্ত-বমন করিতে লাগিল। রক্ত-বমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টার চীৎকার করিতে করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবী পোশাক পরা বাঙ্গালী চেঁচাইয়া উঠিলেন, "এটা ফার্ষ্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও!"

আরিফ কোন কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্ত-বমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙ্গালী সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুটস্বরে একবার মাত্র বলিল, "আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার—"

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফঃস্বলে এক বড় জমিদার বাড়ীর "কলে" গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধ-পত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেণ্ট' কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে আরিফকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ইঞ্জেক্শন দিলেন। দুই তিনটা ইঞ্জেক্শন দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার সাহেব গাড়ী থামান নাই। কারণ গাড়ী কলিকাতায় পৌঁছিতে দেরী হইলে হয়ত এ হতভাগাকে আর বাঁচান যাইবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পৌঁছিলে, ডাক্তার সাহেব এ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মত ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতামাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়ীতে ভিড় করিতে পারিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শ করিল না তখন পিতা পাল্কী করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেই দিন সকালে কলিকাতা হাসপাতাল হইতে মোটর যোগে বাড়ী ফিরিয়াছে।

আশ্চর্য! সে বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু পিতামাতাকে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা ত মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে।

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত। সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না। বাহিরেও না, অন্তরেও না।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, "একি, এমন নীল হয়ে গিয়েছিস কেন ? একি চেহারা হয়েছে তোর ?"

আরিফ শান্ত স্বরে বলিল, "কলেরা হয়েছিল, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।"

পিতামাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকাইয়া দান-খয়রাত করিলেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনও সূর্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ীর দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কী থামিল।

জোহরা পাল্কী হইতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তুমি এসেছ—বেঁচে ফিরে এসেছ ?"

বলিতে বলিতে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙ্গিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতামাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোরা দু'জনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি ?"

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, "আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে !"

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, "না না, তুমি শাস্তি দাও ! তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার !"

আরিফ জোহরার পিঠে কিল দিয়া কহিল, "এই নাও শাস্তি।"

দুঃখ-বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখরোর কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়াছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে। কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা ! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে। সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে। সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে।

বাড়ীতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখরোর কথা জিজ্ঞাসা না করায় শ্বশুর-শাশুড়ী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, "মাগো বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি! আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে! একটু দুধ। মা! একটু দুধ! বড় ক্ষিদে!" "খোকা" "খোকা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী! সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী। তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে।

পাগলের মত সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর সম্মুখেই মীর পরিবারের গোরস্তান। ক্ষীণশিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি ছোট্ট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট্ট কবর, যেন দুইটি যমজ ভাই—গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "খোকা! খোকা! কে তোদের এত ফুল দিয়েছে বাবা! খোকা!"

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—জানেনা, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখরো যুগল!

জোহরা উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, "খোকা! আমার খোকা! তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়ল?" জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মত তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

জোহরা দেখিল পদ্ম-গোখরোদ্বয়ের সে দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহারা বারে বারে জিব বাহির করিয়া যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—মা গো, বড় ক্ষিদে! তুমি ত ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে!

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়া ভরা দুগ্ধ।

বাটীতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটী বুভুক্ষের মত বাটীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল! যেন কত যুগ-যুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা!

জোহরার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ী উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মূক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, কি হবে, এ বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমনি তুমি এসেছ আর অমনি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে!"

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!"

শাশুড়ী বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, "সত্যিই ওরা তোমার খোকা বৌমা! তুমি চলে যাবার পর আমরা দু'একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ওমা শুনলে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না! চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে! কলিকালে আরও কত কি দেখব!"

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপান বশতঃই নির্জীবের মত বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল!

সেইদিনই সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ীর একজন দাসী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও মা গো ভূতে ধরলে গো! জিনের বাদশা গো, জিন ভূত!"

বলিয়াই সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়ীময় ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "হঁ্যারে, বৌমা যে আবার পোয়াতি, তা ত বলিস নি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।"

আরিফ বলিতেছিল, "কিন্তু এখন ত ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে ত সাত মাস।"

এমন সময় বাড়ীময় শোর-গোল উঠিল, "ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত!"

বাড়ীর চাকর-চাকরাণী সকলে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে—জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ীর মধ্যে আম গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে!

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই ত কে যেন গাছতলায় প্রেতমূর্তির মত দাঁড়াইয়া!

তাঁহাদের পিছনে পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে সাপে খেল রে!"

জোহরা তখন চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা তুমি!" আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল "য়্যাঁ, বেয়াই?"

জোহরা তখন চীৎকার করিতেছে, "ও সত্যই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত! ওকে মার! মেরে বের করে দাও!"

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, ভূত যেন যষ্টিদ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চীৎকার করিতেছে—"ওরে বাপরে সাপে খেয়ে ফেললে। আমায় সাপে খেয়ে ফেললে!"

জোহরা উন্মাদিনীর মত তাহার শাশুড়ীর হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল—"ওগো আমার খোকাদের মেরে ফেললে! ওকে ধর! ওকে ধর!"

জোহরার সাথে সাথে সকলে আমগাছ-তলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরার পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তুসাপ পদ্ম-গোখরোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মম ভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার "খোকা" এবং একবার "বাবা" বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেল, সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার খোকারা কই? আমার পদ্ম-গোখরো? আমার বাবা?"

আরিফ কাঁদিয়া বলিল, "জোহরা! জোহরা! কেউ নেই! সব গেছে! সকলে গেছে! তোমার বাবা মরেছেন পদ্ম-গোখরোর কামড়ে! তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়ত তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরাণী দেখতে পেয়ে ভূত ব'লে চীৎকার করে! ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখরো তাঁকে তাড়া করে!"

জোহরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা! যাক্। আমার পদ্ম-গোখরো—আমার খোকারা কোথায়, বল!"

আরিফ বলিল, "তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!"

জোহরা ঃ "এ্যাঁ খোকারা নাই?" বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

বনফুল

মানুষের মন

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল—এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ—শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুণী সম্পর্ক বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ান কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বা-গোছের, নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠি; কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠা-সহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের "কমবাইন্‌ড হ্যাণ্ড" চাকর নরেশের জন্য "ফাউল কাটলেট" বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ "থিওরি অব রিলেটিভিটি" লইয়া উন্মত্ত তখন সেই একই বাড়ীতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন, মোটেই তা নয়। ইঁহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এম-এ পাশ—নরেশ কেমিষ্ট্রীতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্বে পিতা দুইজনকেই সমান ভাগে নগদ টাকাও কিছু দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়ীতে ইঁহারা বাস করিতেছেন--ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়ীটি বেশ বড়। এত বড় যে, ইহাতে দুই তিনটি পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন--'কা তব কান্তা'--ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটি'র ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন······নির্মলা সত্যিই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না--এই মাত্র!

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও একই বাড়ীতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পণ্টুকে উভয়ে ভালবাসিতেন। পণ্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের পত্নী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম এই—"আমরা চল্‌লাম। পণ্টুকে তোমরা দেখো।" পণ্টুকে লইয়া নরেশ ও পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন,—"বাকী অর্ধেকটা তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক।" তাহাই হইল। পণ্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পণ্টুর আর ভাবনা কি?

পণ্টু, নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিম্বা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পণ্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পণ্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুর্গী সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন

ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোন নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পণ্টু তাঁহার আদর্শকেই বরণ করিবেই।

পণ্টুর বয়স ষোল বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য—ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ—আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্বান্তঃকরণে পণ্টুকে ভালবাসিতেন! এ-বিষয়ে কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পণ্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন! নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ, তিনি স্বভাবতঃই একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন—"আমার মনে হয় একজন ভাল কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হ'ত?"

"বেশ দেখাও—"

কবিরাজ আসিলেন—সাত দিন চিকিৎসা করিলেন, জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল। পণ্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, "আচ্ছা, একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্টিটা দেখালে কেমন হয়? কি বল?"

"বেশ ত! তবে যাই কর এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তার বলেছেন—টাইফয়েড!"

পণ্টুর কুষ্টি লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ী ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন—"মঙ্গল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।" কি করিলে শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পণ্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন—"কবিরাজি ওষুধে ত বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব না কি?"

"তাই ডাক না হয়—"

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলে পরেশ পণ্টুর শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পণ্টু প্রলাপ বকিতেছে—"মা আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায়?"

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, তারকেশ্বরে গিয়া ধর্ণা দিলে শুনিয়াছি দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক!

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন—"আমি একবার তারকেশ্বর চল্‌লাম, ফিরতে দু-এক দিন দেরী হবে।"

"হঠাৎ তারকেশ্বর কেন?"

"বাবার কাছে ধর্ণা দেব—"

নরেশ কিছু বলিলেন না। ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"বড় খারাপ টার্ণ নিয়েছে।"

ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি মাটির ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন—"বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম। তিনি বলিলেন যে, রোগীকে যেন ইন্‌জেকশন দেওয়া না হয়। আর বলিলেন, চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তাহলেই সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুল বেলপাতা পচা জল কিছুতেই খাওয়ান চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ড হস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পণ্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইন্‌জেক্‌শন দিতে লাগিলেন এবং ইহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পণ্টুকে প্রত্যহ একটু করিয়া চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েকদিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই!

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন! "ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পণ্টু কেমন যেন করছে!"

"অ্যাঁ, বল কি?"

পণ্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মত পরেশ ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাঁহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

"হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার আর ইনজেক্‌শন দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো,—বুঝলেন—আপত্তি নেই—আপনি ইনজেক্‌শন নিয়ে শীগগির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—"

এদিকে নরেশ পাগলের মত চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—"পল্টু খাও—খাও ত বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—"

তাঁহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, চরণামৃত কস বাহিয়া পড়িয়া গেল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পুন্নাম

অসুখ আর কিছুতেই সারে না।

কাসি সর্দি সারে ত খোসে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, খোস গিয়ে লিভার ওঠে ঠেলে—তারপর ন্যাবায় ধরে। চার বছরের ছেলেটাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে ত চলেইছে।

প্যাকাটির মতো সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাসে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি শুধু জুল্-জুল্ করে—সে-চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো।

শিশুর চোখ সে নয়—জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্তমুখে কোনো বৃদ্ধ যেন সে-চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।

সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়না। ছবিও এক এক সময় আর পারে না। হঠাৎ পিঠে এক থাবড় মেরে সে বলে, "মর্, না, মরলে যে হাড় জুড়োয় আমার।"

শিশু আরো জোরে নিশীথগগন বিদীর্ণ করবার আয়োজন করে। পাশের বিছানায় ললিত একবার পাশ ফিরে শোয়, একটু ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু কিছু বলে না। আগে অনেকবার স্ত্রীকে সে এই নিয়ে ধমকেছে। দু'জনের এই নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু আজকাল আর কিছু বলতে পারে না। ছবির এই আকস্মিক অসহিষ্ণুতার পেছনে কি বিপুল বেদনা, হতাশা ও ক্লান্তির ভার যে আছে তা সে বোঝে। কিন্তু তবুও বুকটা যেন টন্‌টন্ ক'রে ওঠে।

কিন্তু উপায় নেই। ডকের মাল-তোলা ও নাবানোর সামান্য সরকার। জাহাজ ডকে ভিড়লে তবে দু'পয়সা আসে। নইলে নিছক ব'সে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণ শোধাই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে কোন ত্রুটি রাখেনি।

শিশু আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে—সে-চিৎকার আর থামতে চায় না। সে-চিৎকারে বেদনা নেই—আছে শুধু যেন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ছবি রাগের মাথায় চাপড় মেরে ফেলে সন্তপ্ত হ'য়ে নানারকম ক'রে ভোলাতে চেষ্টা করে। ভীতভাবে স্বামীর বিছানার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে স্বামীর অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'ল কি না। নিজের দু'চোখ সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমে জড়িয়ে আসে! কিন্তু শিশু কিছুতেই থামে না। আদর নয়, খেলনা নয়, কিছু সে চায় না। শুধু তার অন্তরের অসীম বিদ্বেষ কান্নার আকারে উথলে উথলে ওঠে। কান্না নয়—সে সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ।

ললিত ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকে আর ভাবে হয়তো।

জীবনের অন্ধ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে না, নিজের বিপুল ব্যর্থতার কথা ভাবে না—দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসা করবার চেষ্টা করে না—ভাবে শুধু ডাক্তার বলেছে, ও-ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে না গেলে চলবে না—কিন্তু সে কেমন ক'রে সম্ভব।

শুনতে পায় ছবি কি কাতর ভাবে কতরকম আদর ক'রে শিশুকে ভোলাবার চেষ্টা করছে।

"লখ্‌খি বাবা আমার, কাঁদে না, কাল তোমাকে একটা লাল মটরগাড়ি কিনে দেব, তুমি ব'সে ব'সে চালাবে—"

শিশুর সেই একঘেয়ে অশ্রান্ত চিৎকার—"কেন তুমি আমায় মারলে—"

ছবি আবার আদর ক'রে কোলে নেবার চেষ্টা করে। "শোন না; তুমি মটরগাড়িতে ব'সে ভোঁ ভোঁ করে হর্ন বাজাবে—"

শিশু হাত-পা ছুঁড়ে মাকে ঠেলে দিয়ে সেই একঘেয়ে সুর ধ'রে থাকে—"কেন তুমি আমায় মারলে—?"

হঠাৎ ললিতের মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত হাস্যকর—পরিণত মনের এই শিশু সেজে তাকে ভোলাবার চেষ্টা, শিশুর এই মূঢ় স্বার্থপরতা, এর চেয়ে বিসদৃশ যেন আর কিছু হতে পারে না।

পরক্ষণেই সে নিজের এই মনে-হওয়ার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় ছবির সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শুষ্ক মুখ, নিদ্রাবঞ্চিত কাতর দুটি চোখ দেখতে পায়। মনের এই অসঙ্গত আচরণে নিজের ওপরই তার রাগ হয়।

তাদের দিকে পিছন ফিরে লক্ষ্যহীন ভাবে সে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আবার ভাবতে শুরু করে,—বিশৃঙ্খল অসম্বদ্ধ ভাবনা।

না, বিয়ে ক'রে সে অন্যায় কিছু করেনি। করেছে কি? না, কখ.খনো না। ভগ্নীপতির বাড়িতে আশ্রিত হয়ে থেকে সামান্য পড়াশুনো শেষ ক'রেই তাকে কাজে ঢুকতে হয়েছে, ভগ্নীপতির আশ্রয়দানের ঋণশোধ করতে। বিয়ে ত সে করবে না-ই ঠিক করেছিল। আর সেজন্যে কারুর কোনো চাড় ছিল ব'লেও বোধ হয় না। বাংলা দেশের পুরুষ সাধারণত যে-বয়সে বিয়ে করে তা পেরিয়ে যাবার পরও তার সঙ্কল্প অটুট ছিল কিন্তু টলেনি এমন কথা বলা যায় না। মনে মনে যেন একটা বিপুল অতৃপ্তি দিনরাত তাকে পীড়া দিয়েছে। বিয়ে,--পরিপূর্ণ-জীবন, নারীর সাহচর্য, একটি একান্ত নিজস্ব সংসার রচনার আনন্দ, অস্পষ্টভাবে এই সমস্তর জন্য ক্ষুধা তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে। চির-কৌমার্যের গৌরবে মন তার কোনদিন উল্লসিত হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেনি, কেবলি অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে এই একক জীবন ব্যর্থ, পঙ্গু। দারিদ্র্যের কথা সে ভাবেনি এমন নয়, কিন্তু মন তার বারবার বিদ্রোহ ক'রে বলেছে মানুষের দেওয়া দারিদ্র্যের জন্যে জীবনকে নিষ্ফল ক'রে রাখবার কোনো অধিকার তার নেই।

চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে শুনতে পায় শিশু সেই এক গোঁ ধ'রে চিৎকার করছে, "কেন তুমি আমায় মারলে!"

কিন্তু কোথায় চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া যায়? ললিত সম্ভব-অসম্ভব অনেক জায়গার কথা ভাবে। টাকাও দরকার। ছবির গয়নার আর কিছু নেই, শুধু দুগাছি বালা—হাতে থাকলে ক্ষয়ে যাবার ভয়ে তোলা আছে। তার দাম কতই বা হবে। বড়জোর এক শ' টাকা। তাই নিয়ে কোথায়ই বা চেঞ্জে যাওয়া যায় এবং কদিনই বা থাকা যায়। এ-সব ব্যাপার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কিন্তু শিশুর চিৎকার যে কিছুতেই থামতে চায় না। ললিত হঠাৎ উঠে বসে। ছবি একেবারে অবসন্ন হয়ে প'ড়ে ও চিৎকারের মাঝেই ব'সে ব'সে একটু ঢুলছিল। ললিতের ওঠার শব্দে সে চমকে সজাগ হয়ে ওঠে; তারপর কান্নার ওপরেই ছেলেটার পিঠে সজোরে চাপড় মেরে বলে "হ'ল ত! সকলের ঘুম ভাঙালে ত!—কোথা থেকে এমন রাক্ষস এসেছিল আমার পেটে!"

ললিত এবার ব্যথিত হয়ে বলে, "আঃ, আবার মারো কেন ?"

"না মারবে না! রাত-দুপুরে ডাকাত-পড়া চিৎকার ক'রে পাড়াসুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙালে গা!"

"অসুখে ভুগে ভুগেই না অমন খিট্‌খিটে হয়েছে।" ব'লে ললিত শিশুকে কোলে নেবার চেষ্টা করে। শিশু কিছুতেই কোলে আসতে চায় না। সজোরে ছবির আঁচল মুঠিতে চেপে ধ'রে আরো জোরে চিৎকার সুরু করে।

ঝট্‌কা দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে ছবি উঠে দাঁড়ায়, বলে, "তা মরুক না! মরলে যে বাঁচি।"

"ছিঃ, কি বলছ ছবি!"

এবার ছবি কেঁদে ফেলে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "বলব আবার কি। ও যে বাঁচতে আসেনি সে কি আর আমি বুঝতে পারিনি। এমন ক'রে ভুগে, ভুগিয়ে, হাড়মাস খাখ ক'রে ও যাবে।"

ছবি ললিতের দিকে পিছন ফিরে বোধ হয় আঁচলে চোখ মোছে।

শিশু শীর্ণ রক্তহীন হাত বাড়িয়ে ললিতের কোল থেকে 'মার কাছে যাব' ব'লে অশ্রান্তভাবে চিৎকার করে।

"ডাক্তার ত বলছে চেঞ্জে নিয়ে গেলেই সারবে।" ললিতের মুখ থেকে কথাগুলো ঠিক আশ্বাসের সুরে যেন বেরুতে চায় না। ও-আশায় সে নিজেই যে বিশ্বাস হারিয়েছে।

ছবি উত্তর দেয় না। ছেলেটাকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে বিছানায় জোর ক'রে শুইয়ে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ কর্, শীগ্‌গির, ফের চিৎকার করলে দরজা খুলে ওই রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।" তারপর নিজে তার পাশে শুয়ে প'ড়ে স্বামীকে বলে, "তুমি শোও না গিয়ে। এমন ক'রে সারারাত জাগলে চলবে? সারাদিন আপিসে খাটবে আর সারারাত ছেলের জ্বালায় দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না, এমন করলে শরীর টেঁকে!"

ললিত এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বলে, "তুমি ত একটুও ঘুমোতে পেলে না।"

"এই ত আমি শুয়েছি। এইবার ঘুমোব।"

কিন্তু ঘুমোন তার হয় না। শিশু এবার নতুন বায়না ধরে। একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে মাকে বলে, "তুমি শুলে কেন? এইখানে বোসো না!"

নির্দিষ্ট সেই স্থানটিতে ছবিকে বসতেই হবে। ছবি আদর করে, ধমক দেয়, মিনতি ক'রে বলে, "লখ্‌খি বাবা, বড্ড ঘুম পেয়েছে, একটু-খানি শুই, —আচ্ছা এইখানটাতে শুচ্ছি—এবার ত হ'ল!" কিন্তু তাতে হয় না। সেই-খানটাতে শু'লে হবে না, বসতে হবে।

শিশুর সেই এক পণ, "শুলে কেন, এইখানটাতে বোসো না।"

শুয়ে শুয়ে ললিতের অসহ্য বোধ হয়। আবার উঠে ব'সে বলে, "ওকে নিয়ে একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসব?"

ছবি বিরক্ত হয়ে ওঠে, "তুমি আবার উঠলে কেন বলো ত?"

"ওর বায়না যে কিছুতেই থামছে না।"

"তাই জন্যে রাত-দুপুরে রাস্তায় বেড়াতে যেতে হবে! তুমি শোও দেখি।"

ললিত হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিদ্রালস চোখ দুহাতে রগড়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ব'সে ছবি শিশুর বায়না নিবৃত্ত করে।

ললিত স্ত্রীর সে শ্রান্ত অবসন্ন মূর্তির দিকে চাইতে পারে না। পেছন ফিরে শুয়ে মনে মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।

তারপর কখন বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসে। কিন্তু খানিক বাদেই শিশুর চিৎকারে তন্দ্রা ভেঙে যায়। উঠে দেখে, ব'সে থাকতে থাকতেই কখন্ আর না পারে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে ছবির মাথাটা কাৎ হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। এবং শিশু পা দিয়ে ঠেলে, হাত ধ'রে টেনে, নানা প্রকারে তাকে জাগাবার চেষ্টা ক'রে চিৎকার ক'রে কাঁদছে—"তুমি শুলে কেন! এইখানে বোসো না!"

অমনি চ'লে এসেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!

টিনের চালের একটি বড় ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি নিচু রান্না-ঘর আর একফালি সরু উঠোন—এই নিয়ে সংসার। কলতলার পাশে একটা নামহীন বুনো গাছ বেড়ে উঠেছে; অসময়ে শীতকালে তাতে অপরিচিত অজস্র ফুল ধরে; তার না আছে গন্ধ, না আছে রূপ। তবু সেইটুকু শোভা। ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।

এই ছোট সংসারটির ভেতরেই কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন কাহিনীর একটি ক্ষীণ ধারা শ্রান্তভাবে বয় দিন থেকে রাতে, রাত হতে আবার নতুন

দিনে।—মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনার অসামান্য আত্মবলিদানের কাহিনীর ধারা।

হয়তো বিধাতারও চমক লাগে।

ললিত কিন্তু নিজেকে অন্যরকম বোঝায়। তার কাছে অপরিস্ফুটভাবে এ-সব শুধু আনন্দের ঋণ-শোধ, মনুষ্যত্বের গৌরবের মূল্যদান। তার বেশি কিছু নয়। জীবন শুধু মন্থর স্রোতে হালকা নৌকার মতো অত্যন্ত সহজে ভেসে যাবে ভেবে ত সে বিয়ে করেনি। জীবনের অগ্নিপরীক্ষা, বিবাহের দায়িত্ব—অনেক কথাই সে যে আগে ভেবেছে।

তবু ঋণ যেন আর শোধ হতে চায় না। ছবির দিকে সে ভালো ক'রে আজকাল চাইতে পারে না। গলার কণ্ঠি দেখা যায়, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। পরিশ্রমে দুর্ভাবনায় উনিশ বছরের মেয়ের মুখে যেন উনপঞ্চাশ বছরের ক্লান্তি! খোকা ত' দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ডাক্তার সেদিন হঠাৎ একবার নিজে থেকে এসেছিল। গাড়ি থামিয়ে দরজার কাছে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে ওয়েস্টকোটের দু'পকেটে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে একটু সামনে ঝুঁকে, পরম আত্মীয়ের মতো স্নিগ্ধ অনুযোগের কণ্ঠে ব'লে গেল, "আপনারা এখনো চেঞ্জে নিয়ে যাননি! নাঃ, আপনারা ছেলেটাকে বাঁচতে দিলেন না দেখছি!"

ডাক্তার যেতে ললিত বললে, "কিন্তু ডাক্তার আমাদের একটু ভালোবাসে দেখেছ ছবি? ঠিক ব্যবসাদারি আমাদের সঙ্গে করে না। না?"

ডাক্তারের সহৃদয়তার আলোচনায় খানিকটা সময় বেশ কাটল। ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, দু'এক দিনের মধ্যে যা-হোক-ক'রে টাকার যোগাড় সে করবেই। ছবি অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু স্ফূর্তিভরে "কলের জল বুঝি যাবার সময় হ'ল" বলে কাজে গেলে। সমস্ত সংসারের ওপর যে বেদনার গুরুভার চেপে ছিল, সেটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেল সামান্য একটি মানুষের ক্ষণিকের অভিনয়ে।

কিন্তু সে কতক্ষণ আর।

আবার রাত্রি আসে। ললিত শ্রান্ত হতাশ হ'য়ে ঘরে ফিরে। শিশু নিয়মিত বায়না ধরে। মার আঁচল চেপে শুয়ে থাকে, মাকে সে ছেড়ে দেবে না।

"রান্না-বান্না কিছু করতে হবে না আমার? এমনি ব'সে থাকলে চলবে?" —ছবি জোর করে চলে যাবার চেষ্টা করে।

শিশুর কান্নায় কাতর হয়ে ললিত বলে, "থাক্ না, আমি না-হয় যা হোক বাজার থেকে কিছু কিনে আনছি। তুমি বোসো ওর কাছে।"

হ্যাঁ, এই জল-কাদায় আপিস থেকে দু'কোশ পথ হেঁটে এলে, আবার এখনি যাবে বাজারে! ছেলের অত আদরে কাজ নেই। আর বাজারের খাবার তোমার সয় কোনদিন?"

"একদিন খেলে কিছু হবে না। আর তুমিও একদিন জিরোও না!" ললিত যেন অনুনয় করে।

"না না, আমি রাঁধতে যাচ্ছি। এই বৃষ্টিতে বাজারে যেতে হবে না।" ছবি জোর ক'রে উঠে পড়ে। শিশু কেঁদে হাত-পা ছুঁড়ে একাকার ক'রে তোলে!

ললিত আর কথা না কয়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, পথ কাদায় কাদা। পায়ে পায়ে জুতো সে কাদায় ব'সে যায়; ললিতের শ্রান্ত পা যেন কাদা থেকে উঠতে চায় না।

ওই রুগ্ন পাঁচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র ক'রে এই ছোট সংসারটি ক্লান্তপদে পরম দুঃখের ভার বহন করে নিঃশব্দে আবর্তন করে।

শিশুর অন্ধ অবোধ স্বার্থপরতার কাছে অহরহ বলিদান চলে।

ললিত ভাবে,—শিশু, ভবিষ্যৎ মানব সে, সে যে সব কিছু দাবি করতে পারে, কোনো ত্যাগই তার জন্যে যে যথেষ্ট নয়।

ডাক্তার আর একদিন এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছে—এবার আর সহৃদয়তার সুরে নয়, মুরুব্বিয়ানার চালে; চেয়ারে আলগোছে ব'সে কোলের ওপর টুপি খুলে ডান হাতে ছড়ি দোলাতে দোলাতে, কোমরে বাঁ-হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে অনেক কথা ব'লে গেছে,—শিশুকে সংসারে আনবার দায়িত্বের কথা, ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যের কথা, ইত্যাদি!

যাবার সময় মোটরে উঠেও মুখ বার করে বলেছে—"দেখুন, এমন ক'রে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্যে এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত—ঠিক বলুন, জেল হওয়া উচিত নয় ?"

ললিত তেমনি আপিসে যায়-আসে, কিন্তু তার মুখ যেন কঠিন হয়ে গেছে পাথরের মুখের মতো। তার মনের গোপনে কি সঙ্কল্প জন্ম নিয়েছে কে জানে !

খোকা সেরে উঠছে। স্পষ্ট সেরে উঠছে। খোলা বারান্দায় ডেক চেয়ারে ব'সে ব'সে ললিত খোকার খেলা দেখে। ছবি চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বলে, "কিন্তু কি সুন্দর জায়গা বাপু, আমার যেন আর কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।" তারপর মুখ নামিয়ে ললিতের কানের কাছে চুপি চুপি আনন্দোজ্জল মুখে বলে, "দেখ, কাল খোকাকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত দুটো টন্ টন্ করে উঠল।"

রাঙামাটির দেশের রঙ যেন ছবিরও গালে লেগেছে ; শালবনের সজীবতা যেন তার সারা দেহে ঝলমল করে।

ললিত তার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে চায়, তারপর নীরবে কি যেন ভাবে।

ছবি খানিক বাদে হেঁকে বলে, "ছি খোকা, ছেড়ে দাও, ওর লাগবে।"

খোকা তখন খেলার সাথিটির ঘাড়ের ওপর চেপে তার মাথাটি মাটিতে ঠোকবার চেষ্টা করছে।

অগত্যা ললিত উঠে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়।

উৎপীড়িত ছেলেটি কিন্তু ধুলোমাখা মাথায় উঠে একটুও না কেঁদে ঈষৎ ম্লান হেসে মধুর কণ্ঠে বলে, "দেখুন ত কাকাবাবু, আমি কি ওকে ঘাড়ে করতে পারি !"

নিজের অজ্ঞাতে প্রতিবেশীর এই সুশ্রী সুন্দর মধুরকণ্ঠ ছেলেটির সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনা ক'রে হঠাৎ ললিত মনে মনে অকারণে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে।

ছেলেটি রোগা, মাথায় রেশমের মতো কোমল একমাথা দীর্ঘ চুল—নীলাভ চোখ দুটিতে, ছোট্ট মুখে ম্লান হাসিটি যেন লেগেই আছে।

ললিত খোকার কান ধ'রে, ধমকে জিজ্ঞাসা করে, "কেন ওর মাথা মাটিতে ঠুকে দিচ্ছিলে ? ঝগড়া না করে থাকতে পারো না ?"

খোকা মুখচোখ রাঙা ক'রে নীরব হয়ে থাকে। অপর ছেলেটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, "না, ঝগড়া হয়নি ত ! ও ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বললে কিনা, তাই আমি ওকে তুলতে পারিনি ব'লে আমার মাথাটি একবার মাটিতে ঠুকে দিয়েছিল। আমার ত লাগেনি !"

"না, ওর গায়ে কখ্‌খনো হাত তুলো না !" ব'লে খোকাকে ধমকে ললিত আবার ফিরে এসে বারান্দায় বসে।

ছবি একবার বলে, "খোকার সঙ্গে ওদের টুনু কিন্তু পারে না।" তারপর ললিতের গম্ভীর মুখ দেখে চুপ করে যায়।

খোকা ও টুনুর খেলা কিন্তু জমে না। টুনুর সমস্ত সাধ্যসাধনা, মিনতি-অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে খোকা ক্রুদ্ধমুখে গুম হয়ে ব'সে থাকে। তারপর হঠাৎ অকারণে প্রাণপণ শক্তিতে টুনুকে চিম্‌টি কেটে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

টুনু ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

ছবি গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে খোকাকে বকতে সুরু করে।

শুধু ললিত চেয়ার থেকে ওঠে না, সমস্ত মুখ তার অকস্মাৎ বেদনায় কালো হয়ে যায়। টুনু শান্ত হয়ে খানিক বাদে যখন এসে বলে, "কাকাবাবু, খোকা আমায় মেরেছে, আর আমি খেলতে আসব না।" তখন পর্যন্ত ললিত কথা কয় না, সামনের দিকে চেয়ে নীরবে কি ভাবে সে-ই জানে !

টুনু কিন্তু বিকালবেলা আবার এল।

খোকাকে নিয়ে তখন ললিত একটু লেখাপড়ার চেষ্টা করছে, এবং আধ-ঘণ্টা পরিশ্রমেও স্লেটের ওপর খোকাকে দিয়ে অ-কারের যৎসামান্য সাদৃশ্যেরও কোনো অক্ষর লেখাতে না পেরে হতাশ হয়ে উঠেছে।

টুনু এসে একপাশটিতে চুপ ক'রে বসল। ললিত বললে, "তুমি অ লিখতে পারো টুনু ?"

একগাল হেসে টুনু বললে, "পারি কাকাবাবু, আমি বোধোদয় থেকে টানাও লিখতে পারি! লিখব কাকাবাবু ?"

অবাক হয়ে ললিত বললে, "তুমি বোধোদয় পড়ো !"

"বোধোদয় আমার শেষ হয়ে গেছে । "অ লিখে দেখাব কাকাবাবু ?" ব'লে আগ্রহভরে টুনু স্লেটের দিকে হাত বাড়াল ।

খোকা কিন্তু স্লেট দিল না । দৃঢ়মুষ্টিতে স্লেট আঁকড়ে ধ'রে রইল ।

"ওকে স্লেট্টা দিতে বলুন না কাকাবাবু"—টুনু অনুনয় ক'রে বললে, "আমি খুব ভালো ক'রে অ লিখে দেখাব ।"

হঠাৎ কঠিন স্বরে ললিত বললে, "থাক্ তোমার লিখতে হবে না, ও এখন পড়ছে, এখন তুমি বাড়ি যাও ।"

টুনু অপ্রত্যাশিত কঠিন স্বরে ভীত হয়ে মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে গেল ।

ললিত কিন্তু আর একমুহূর্তও ব'সে থাকতে পারলে না ; টুনু যেতে না যেতে সে গম্ভীর মুখে উঠে বেরিয়ে গেলে ।

দেখা হতে ছবি জিজ্ঞাসা করলে "আজ এরি মধ্যে পড়াশোনা হয়ে গেল ? বাবা ! ওকে নিয়ে তুমি যে রকম উঠে-প'ড়ে লেগেছ, জজ-মেজিষ্টের না ক'রে আর ছাড়বে না !"

গম্ভীর মুখে ললিত শুধু বললে, "হু ।"

দু'দিন টুনু আর আসে না । ললিতের লজ্জা গ্লানি ও অনুশোচনার আর অন্ত নাই । খোকাকে নিয়ে একবার তাদের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়েও সে মাঝপথ থেকে ফিরে এল । নিজের মাথা তার নিজের কাছে চিরকালের জন্যে হেঁট হয়ে গেছে ।

পরদিন হঠাৎ সকালে বাইরের গেটের কাছে বেরিয়েই সে চম্‌কে ডাক্‌লে, "টুনু !"

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে টুনু উৎসুক দৃষ্টিতে ভেতরের দিকে চাইছিল । ললিতকে দেখতে পেয়ে সে ভীত কুণ্ঠিতভাবে চ'লে যাবার উপক্রম করলে ।

"তুমি আর খোকার সঙ্গে খেলতে আসো না কেন টুনু ?"

সাদর সম্ভাষণে ভরসা পেয়ে টুনু অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি তাহ'লে বকবেন না ত কাকাবাবু ?"

অকারণেই ললিতের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল ; এই ক্ষীণকায়, ফুলের মতো কমনীয় ছেলেটির সমস্ত কথাবার্তা আচরণে এমন একটি করুণ মাধুর্য আছে !

তাড়াতাড়ি তাকে বুকে তুলে নিয়ে ললাটে চুমু খেয়ে ললিত বললে, "না বাবা, কেন আমি তোমায় বকব!"

টুনুর মুখ তৎক্ষণাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বললে, "আমি খেলতে যাই তাহ'লে?"

তাকে নামিয়ে দিয়ে ললিত বললে, "যাও।"

টুনু উল্লসিত হয়ে ছুটে গেল।

দুদিন বাদে আজ প্রথম প্রসন্ন মনে ললিত বেড়াতে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এসে সে-প্রসন্নতা তার রইল না।

দরজার কাছ থেকেই খোকার উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল।

"না, ওকে দুটো দিতে পারবে না মা! কেন, ও নিজের বাড়িতে গিয়ে খেতে পারে না? হ্যাংলা কোথাকার!"

লজ্জায়, বেদনায়, রাগে ললিতের কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। হিংসার এ জঘন্য রূপ ওইটুকু শিশুর মাঝে প্রকাশ পেল কোথা থেকে, ভাবতে ভাবতে সে নিঃশব্দে আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সেখান থেকে শুনতে পেল ছবি বোঝাবার চেষ্টা করছে—"না বাবা, ওরকম হিংসুটে-পনা কি করতে আছে, ও তোমার ভাই হয়; ও দুটো খাক্, তুমিও দুটো খাও।"

টুনুর মিষ্ট গলা শোনা গেল—"আমি ত দুটো সন্দেশ খাব না কাকিমা; আমার অসুখ করেছে কিনা, আমি একটুখানি খাব শুধু।"

"আচ্ছা বাবা, তুমি একটা নাও,—আর খোকন্, এই তোমার দুটো, কেমন হ'ল ত?"

কিন্তু এও খোকার মনঃপূত নয়।

"না, ওকে একটাও দিতে পারবে না, ওকে দাও না দেখি, আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নেব।"

ছবি এবার রেগে বললে, "কেড়ে নে না দেখি! তুই ত দুটো পেয়েছিস। ও একটা খেলে তোর অত হিংসে কেন?"

"কেন ও আমাদের বাড়ি খাবে! বাবা ত তাড়িয়ে দিয়েছিল, ও আবার এসেছে কেন?"

"বেশ করবে আসবে, বেশ করবে খাবে।"

ব্যাপারটা হয়তো সামান্য। কিন্তু ঘরে ব'সে ব'সে শুনতে শুনতে ললিতের অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তার জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সান্ত্বনা কে যেন মাড়িয়ে থেঁৎলে চ'লে গেছে।

সে নীরবে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

ছবি তখন টুনুর হাতে একটি সন্দেশ দিয়েছে। টুনু বলছিল, "আমি ত সবটা খাব না কাকিমা—আমার বড্ড অসুখ করেছে কিনা! আমার ত খেতে নেই।"

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই খোকা সজোরে হাত মুচড়ে সন্দেশটা কেড়ে নিয়ে বললে, "ইস্, সন্দেশ ওকে খেতে দিচ্ছি কিনা!"

হাতের ব্যথায় টুনু কাতর হয়ে কেঁদে উঠল।

ছবি রেগে খোকার পিঠে চড় কসিয়ে দিলে।

ললিত যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি নীরবে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

ছবি এসে বললে, "আহা, ওদের টুনুর বড্ড অসুখ গো!"

ললিত সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় ব'সে ছিল, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কার, টুনুর?"

"হ্যাঁগো, ওর মা তাই কাঁদছিল, ছেলেটা এমন ভালো জায়গায় এসেও সারল না। দিন দিন যেন কেমন শুকিয়ে গেল।"

ললিত আবার মুখ ফিরিয়ে নীরবে দূরে অন্ধকার গিরিশ্রেণীর দিকেই বোধ হয় চেয়ে রইল।

ছবি ঘরে যাবার উদ্যোগ করতেই কিন্তু ললিত হঠাৎ আঁচল ধ'রে টেনে বললে, "শোন!"

"কি?" ব'লে ছবি কাছে এসে দাঁড়াল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ-চাপ।

"কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো বাপু, আমার কাজ আছে!"

চেয়ারটা ছবির দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব'সে ললিত বললে, "খোকা ত বেশ সেরে গেছে, না ছবি?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"তাহ'লে তুমি খুব খুশি হয়েছ ত?"

"কি যে কথা বলো তার মাথামুণ্ডু নেই, একি আবার জিজ্ঞেস করে নাকি মানুষ! আমি খুশি হয়েছি আর তুমি খুশি হওনি?"

ললিত শুধু বললে, "হুঁ।"

ছবি আবার চ'লে যাচ্ছিল। ফের তার আঁচল ধ'রে টেনে রেখে ললিত বললে, "এই খোকা হয়তো বড় হবে, মানুষ হবে, সংসার করবে—কি বলো ছবি?"

গলার স্বরটা ছবির কাছে যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল, বললে, "কি তুমি যা-তা বলছ বলো ত?"

"শোন না, এই খোকা ভবিষ্যতের আশা ; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ করবে, ধন্য করবে, তাই জন্যে আমাদের এই এত আয়োজন, এত ত্যাগ, বুঝেছ?"

"যাও, ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না!" ব'লে জোর ক'রে আঁচল ছাড়িয়ে ছবি চ'লে গেল।

ললিত অন্ধকারে ব'সে বোধ হয় সেই ভবিষ্যতের একটু আভাস কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

ক'দিন বাদে হঠাৎ অর্ধরাতে কান্নার স্বরে ঘুম ভেঙে উঠে ছবি ললিতকে জাগিয়ে বললে, "শুনতে পাচ্ছো?"

ললিত বললে, "হু।"

ছবি ভীত পাংশুমুখে বললে, "কান্নাটা টুনুদের বাড়ি থেকেই আসছে না?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"কাল বড্ড বাড়াবাড়ি গেছে, বোধ হয় মারা গেল।" ব'লে ছবি চোখ মুছলে।

ললিত বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিকৃত স্বরে বললে, "টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল—আশ্চর্য নয় ছবি?"

ছবি একবার শিউরে উঠল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নিচু করে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে ব'লে যেতে লাগল, "আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি,

কাটাকাটি ক'রে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে ; নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্টস্বীকার যে বৃথা ছবি !"—স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক ।

ছবি বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে !"

"বোধ হয় !" বলে হঠাৎ ছবির হাতটা সজোরে ধরে ললিত উগ্রকণ্ঠে বললে, "চেঞ্জে আসবার টাকা কি ক'রে যোগাড় করেছি জানো ছবি ? সন্তানকে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্বে কি করেছি জানো ?"

ছবি সে-মুখের চেহারায় অত্যন্ত ভয় পেয়ে বললে, "কি ?"

"চুরি করেছি, জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করেছি। ভবিষ্যতের মানুষের দাবি মেটাতে অন্যায় করিনি নিশ্চয় ।"

"তাহ'লে কি হবে !"—ছবির স্বর ভয়ে কাঁপছিল ।

ললিত তিক্তমুখে হেসে বললে, কিছু হবে না, ভয় নেই ! সেইটুকুই মজা । এ-চুরি কখনো ধরা পড়বে না । চিরকাল ধ'রে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে ।"

ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা কিন্তু যেমন বেগে এসেছিল, তেমনি বেগে শান্ত হয়ে এল ।

দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় সে বেরিয়ে গেল ।

এবং শীতল স্নিগ্ধ অন্ধকারে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হ'ল এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছুই কারণ নেই ।

বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে । তারই তলায় তার মনে হ'ল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি ।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্রের স্বাদ

সমুদ্র দেখিবার সাধটা নীলার ছেলেবেলার। কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছিল। ভূগোলে পৃথিবীর স্থলভাগ আর জলভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু তার অনেক আগে হইতেই নীলা জানিত পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। সাতবছর বয়সে বাবার মুখে খবরটা শুনিয়া কি আশ্চর্যই সে হইয়া গিয়াছিল! এ কি সম্ভব? কই সে তো রেলে চাপিয়া কত দূরদেশে ঘুরিয়া আসিয়াছে, মামাবাড়ী যাইতে সকাল বেলা রেলে উঠিয়া সেই রাত্রিবেলা পর্যন্ত ক্রমাগত হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতে হয়, কিন্তু নদীনালা খালবিল ছাড়া জল তো তার চোখে পড়ে নাই। চারিদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, আকাশ পর্যন্ত শুধু মাটি আর গাছপালা।

তারপর কত ভাবে কত উপলক্ষে ছাপার অক্ষর, মুখের কথা আর স্বপ্নের বাহনে সমুদ্র তার কাছে আসিয়াছে। বলাইদের বাড়ীর সকলে পুরী গিয়া কেবল সমুদ্র দেখা নয়, সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিল। কলিকাতায় সায়েব-কাকার ছেলে বিনুদা বিলাতে গেল,—সমুদ্রের বুকেই নাকি তার কাটিয়া গেল অনেকগুলি দিন। সমুদ্রের জল মেঘ হইয়া নাকি বৃষ্টি নামে, মাছ-তরকারীতে যে নুন দেওয়া হয় আর থালার পাশে একটুখানি যে নুন দিয়া মা দু'বেলা ভাত বাড়িয়া দেন, সে নুন নাকি তৈরী হয় সমুদ্রের জল শুকাইয়া! সারাদিন গরমে ছটফট করিবার পর সন্ধ্যাবেলা যে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগানোর জন্য তারা ছাদে গিয়া বসে, সে বাতাস নাকি আসে সোজা সমুদ্র হইতে!

'সমুদ্দুর বুঝি দক্ষিণদিকে বাবা?'

'চাদ্দিকেই সমুদ্দুর আছে। দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর—আমাদের খুব কাছে।'

ঠিক। ম্যাপে তাই আঁকা আছে। কিন্তু চারিদিকে সমুদ্র? উত্তর দিকে তো হিমালয় পর্বত, তারপর তিব্বত আর চীন! ম্যাপটা আবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে।

'আমায় সমুদ্দুর দেখাবে বাবা?'

বাবা অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এবারও দিলেন। সমুদ্র দেখার আর হাঙ্গামা কি? একবার তীর্থ করিতে পুরীধামে গেলেই হইল, সুবিধামত একবার বোধ হয় যাইতেও হইবে। নীলার মা'র অনেক দিনের সাধ।

কিন্তু কেরাণীর স্ত্রীর সহজ সাধও কি সহজে মিটিতে চায়! অনেক কষ্টে একরকম মরিয়া হইয়া একটা বিশেষ উপলক্ষে স্ত্রীর সাধটা যদি বা মেটানো চলে, ছেলেমেয়ের সাধ অপূর্ণই থাকিয়া যায়।

রথের সময়ে যে ভীড়টাই হয় পুরীতে, ছেলেমেয়েদের কি সঙ্গে নেওয়া চলে? তাছাড়া, সকলকে সঙ্গে নিলে টাকায়ও কুলায় না। একজনকে নিলে অন্য সকলে কি দোষ করিল? নীলা সঙ্গে গেলে ছোট ভাই-বোনদের দেখা-শোনাই বা করিবে কে?

নীলাকে সঙ্গে না নেওয়ার আরও কারণ আছে।

'না গো, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নিয়ে ওই হট্টগোলের মধ্যে যাবার ভরসা আমার নেই।'

বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কিন্তু বিয়ের অযুগ্যি অবুঝ মেয়ের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। কয়েকদিন চোখের জলের নোন্‌তা স্বাদ ছাড়া জিভ যেন তার ভুলিয়া গেল অন্য কিছুর স্বাদ। মা-বাবা তীর্থ সারিয়া ফিরিয়া আসিলে কোথায় হাসিমুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করিবে, তীর্থযাত্রার গল্প শুনিবার অন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, একটি প্রশ্ন করিয়াই নীলা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

'সমুদ্দুরে চান করেছ বাবা?'

গাড়ী হইতে নামিয়া সবে ঘরে পা দিয়াছেন, নীলার বাবা বসিয়া বলিলেন, 'করেছি রে, করেছি। একটু দাঁড়া জিরিয়ে নিই, বলব'খন সব।'

কি বলিবেন? কি প্রয়োজন আছে বলিবার? নীলা কি পুরীর সমুদ্র-স্নানের বর্ণনা শোনে নাই? বলাইদের বাড়ীর তিনতলার ছাতে উঠিয়া

চারিদিকে যেমন আকাশ পর্যন্ত ছড়ানো স্থির অনড় রাশি-রাশি বাড়ী দেখিতে পায়, তেমনি সীমাহীন জলরাশিতে বাড়ীর সমান উঁচু ঢেউ উঠিতেছে নামিতেছে, আর তীরের কাছে বালির উপর আছড়াইয়া পড়িয়া সাদা ফেনা হইয়া যাইতেছে, এ কল্পনায় কোথাও কি এতটুকু ফাঁকি আছে নীলার ? কেবল চোখে দেখা এই যা। বাপের আদুরে মেয়ে সে, অন্তত সকলে তাই বলে, তার সমুদ্র দেখা হইল না, কিন্তু বাপ তার সমুদ্র দেখিয়া, স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নীলা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবা তাড়াতাড়ি আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'পূজোর সময় যেমন ক'রে পারি তোকে সমুদ্র দেখিয়ে আনব নীলা, ধার করতে হ'লে তাও করব। কাঁদিস নে নীলা, সারারাত গাড়ীতে ঘুমোতে পাইনি, দোহাই তোর কাঁদিসনে।'

সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার বদলে পূজার সময় নীলাকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বলাই বাহুল্য যে, এবার সমুদ্র দেখা হইল না বলিয়া নীলা কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া চোখের জলের নোন্‌তা স্বাদে আর সবকিছুর স্বাদ ডুবাইয়া দিল না, কাঁদিল সে বাপের শোকেই। কেবল সে একা নয় বাড়ীর সকলেই কাঁদিল। কিছু দিনের জন্য মনে হইল, একটা মানুষ বিশেষ অবস্থার বিশেষ বয়সের বিশেষ একটা মানুষ, চিরদিনের জন্য নীলার মনের সমুদ্রের মত দুর্বোধ্য ও রহস্যময় একটা সীমাহীন কিছুর ওপারে চলিয়া গেলে, সংসারে মানুষের কান্না ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না।

ছেলেবেলা হইতে আরও কতবার নীলা কাঁদিয়াছে ! বাড়ীর শাসনে কাঁদিয়াছে, অভিমানে কাঁদিয়াছে, খেলার সাথীর সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় কাঁদিয়াছে, পেটের ব্যথায়, ফোঁড়ার যাতনায় কাঁদিয়াছে, সমুদ্র দেখার সাধ না মেটায় কাঁদিয়াছে, অকারণেও সে দু'চারবার কাঁদে নাই এমন নয়। এমন কষ্ট হয় কাঁদিতে!—দেহের কষ্ট, মনের কষ্ট। শরীরটা যেন ভারী হইয়া যায়, জ্বর হওয়ার মত সর্বাঙ্গে অস্বস্তিকর ভোঁতা টনটনে যাতনা বোধ হয়, চিন্তাজগৎটা যেন বর্ষাকালের আকাশের মত ঝাপ্‌সা হইয়া যায়, একটা চিরস্থায়ী ভিজা স্যাঁতসেঁতে ভাব থমথম করিতে থাকে। শরীর ও মন দু'রকম কষ্টেরই আবার স্বাদ আছে,—বৈচিত্র্যহীন আলুনি এবং কড়া নোন্‌তা স্বাদ।

স্বাদটা অনুভব করিবার সময় নীলার লাগে একরকম, আবার কল্পনা করিবার সময় লাগে অন্যরকম—রক্তের স্বাদের মত। ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে, বঁটি দিয়া তরকারী কুটিতে, কোন-কিছু দিয়া টিনের মুখ খুলিতে, নিজের অথবা ভাইদের আঙুল কাটিয়া গেলে তার প্রচলিত চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুসারে নীলা কাটাস্থানে মুখ দিয়া চুষিতে আরম্ভ করে—রক্তের স্বাদ তার জানা আছে।

নীলার বাবার মৃত্যুর পর সকলে মামাবাড়ী গেল। বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া অতদূর মফস্বলের ছোট সহরে যাওয়ার ইচ্ছা নীলার মার ছিল না। তিনি বলিলেন, 'আর ক'টা মাস থেকে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে গেলে হ'তনা? একটা ছোটখাট বাড়ী ঠিক করে' নিয়ে—'

মেজমামা বলিলেন, 'মাথা খারাপ নাকি তোর? অরক্ষণীয়া নাকি মেয়ে তোর? বাপ মরেছে, একটা বছর কাটুক না।'

'ও!' বলিয়া নীলার মা চুপ করিয়া গেলেন।

কেবল তাই নয়, সহরে তাদের দেখাশোনা করিবে কে, খরচ চালাইবে কে? মামারা তো রাজা নন। সুতরাং সকলে মামাবাড়ী গেল। সকলে গাড়ীতে উঠিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত হু হু করিয়া চলিলে যেখানে পৌঁছানো যায়। স্থানটির পরিবর্তন হয় নাই, অনেক কালের ভাঙ্গা ঘাট-ওয়ালা পানাভরা পুকুরটার দক্ষিণে ছোট আম-বাগানটির কাছে নীলার দুই মামার বাড়ীটিরও পরিবর্তন হয় নাই। কেবল মামারা, মামীরা, আর মামাতো ভাইবোনেরা এবার যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই মামাবাড়ীর আদর, সকলের আনন্দ-গদগদ ভাব, অফুরন্ত উৎসব? এবার তো একবারও কেউ বলিল না, এটা খা—ওটা খা? তার বাবার জন্য কাঁদাকাটা শেষ করিয়া ফেলিবার পরেও তো বলিল না? একটু কাঁদিবে নাকি নীলা, বাবার জন্য মাঝে মাঝে যেটুকু কাঁদে তারও উপরে মামাবাড়ীর অনাদর অবহেলার জন্য একটু বেশী রকম কান্না?

কিছুকাল কাটিবার পর এ বিষয়ে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিবার প্রয়োজনটা মিটিয়া গেল, আপনা হইতেই যথেষ্ট কাঁদিতে হইল নীলাকে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় তো নীলা জীবনে কখনো পরে নাই, গোবর দিয়া ঘর লেপে নাই, পানাপুকুরে বাসন মাজে নাই, কলসী কাঁখে জল আনে নাই, বিছানা তোলা,

মসলা বাটা, রান্না করা লইয়া দিন কাটায় নাই, এমন ভয়ানক ভয়ানক খারাপ কথার বকুনিও শোনে নাই। হায়, একটু ভাল জিনিস পর্যন্ত সে যে খাইতে পায় না, এমনিই তার শরীরের নাকি এমন পুষ্টি হইয়াছে যে কোন ভদ্রঘরের মেয়ের যা হয় না, হওয়া উচিত নয়! কিন্তু তারই না হয় অভদ্ররকমের দেহের পুষ্টি হইয়াছে, তার ভাইবোনেরা তো রোগা, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে ওরাও একটু দুধ পায় না কেন, পিঠা-পায়েসের ভাগটা ওদের এত কম হয় কেন? এমন ভিখারীর ছেলের মত বেশ করিয়া তার ভাই দু'টিকে স্কুলে যাইতে হয় কেন? মামাদের জন্য ভাইরা যে তার দু'বেলা খাইতে পাইতেছে, স্কুলে পড়িতে পাইতেছে, এটা নীলার খেয়ালও থাকে না, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে নিজের ভাইবোনদের আহারবিহারের স্বাভাবিক পার্থক্যটা তাকে কেবলি কাঁদায়।

বড় মামী বলেন, 'বড় তো ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে তোমার ঠাকুরঝি?' মেজমামী বলেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটি খেয়েছ একেবারে।'

নীলার মা বলেন, 'দাও না তোমরা ওর একটা গতি করে, মেয়ে যে দিন দিন কেমনতরো হয়ে যাচ্ছে?'

পাত্র খোঁজা হইতে থাকে আর নীলা ভাবিতে থাকে, বিবাহ হইয়া গেলে সে কি আবার সহরের সেই বাড়ীর মত একটা বাড়ীতে গিয়া থাকিতে পাইবে, সকলের আদর-যত্ন জুটিবে, অবসর সময়ে বলাইদের মত কোন প্রতিবেশীর তিনতলা ছাতে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ীর সমুদ্র দেখিতে পাইবে, বলাই-এর মত কারও কাছে সমুদ্রের গল্প শোনা চলিবে? ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে নীলার একটি ভাই মরিয়া গেল। নীলার মা কি একটা অজানা অসুখে ভুগিতে ভুগিতে শয্যা গ্রহণ করিলেন। বড়মামার মেজ মেয়ে সন্তান প্রসব করিতে বাপের বাড়ী আসিয়া একখানা চিঠির আঘাতে একেবারে বিধবা হইয়া গেল। পানাভরা পুকুরটার অপর দিকের বাড়ীতেও একটি মেয়ে আরও আগে সন্তানের জন্ম দিতে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল, একদিন রাতভোর চেঁচাইয়া সে নিজেই মরিয়া গেল। আমবাগানের ওপাশে আটদশখানা বাড়ী লইয়া যে পাড়া, সেখানেও পনের দিন আগে-পিছে দু'টি বাড়ী হইতে বিনাইয়া বিনাইয়া শোকের কান্না ভাসিয়া আসিতে শোনা গেল।

তারপর একদিন অনাদি নামে সদর হাসপাতালের এক কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে নীলার বিবাহ হইয়া গেল। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই একরকম স্বীকার করিল যে, ধরিতে গেলে নীলার বিবাহটা মোটামুটি ভালই হইয়াছে বলা যায়। মেয়ের তুলনায় ছেলের চেহারাটাই কেবল একটু যা বেমানান হইয়াছে। কচি ডাল ডাঙিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যেমন হয়, কতকটা সেইরকম শুষ্ক ও শীর্ণ চেহারা অনাদির, ব্রণের দাগ-ভরা মুখের চামড়া কেবল মরা-মরা, চোখ দু'টি নিষ্প্রভ, দাঁতগুলি খারাপ। এদিকে মামাবাড়ীর অনাদর অবহেলা সহিয়া এবং বাবা ও ছোটভাইটির জন্য কাঁদিয়াও নীলার চেহারাটি বেশ একটু জমকালো ছিল, একটু অতিরিক্ত পরিপাট্য ছিল তার নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির গঠন-বিন্যাসে।

কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই, মুখ বুঁজিয়া সব মানিয়া লইতে হইল নীলার। বিশেষ আর এমন কি পরিবর্তন হইয়াছে জীবনের? বাস কেবল করিতে হয় অজানা লোকের মধ্যে, যাদের কথাবার্তা চালচলন নীলা ভাল বুঝিতে পারে না; আর রাত্রে শুইয়া থাকিতে হয় একটি আধ-পাগলা মানুষের কাছে, যার কথাবার্তা চালচলন আরও বেশী দুর্বোধ্য মনে হয় নীলার। কোনদিন রাত্রে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর ছুটি পাইয়া ঘরে আসিবামাত্র অনাদি দরজায় খিল তুলিয়া দেয়, হাত ধরিয়া উধ্ব'শ্বাসে কি যে সে বলিতে আরম্ভ করে, নীলা ভাল বুজিতেই পারে না। কেবল বুঝিতে পারে, আবেগে উত্তেজনায় অনাদি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখের দৃষ্টি তার উদ্‌ভ্রান্ত। মনে হয়, নীলার আসিতে আর একটু দেরী হইলে সে বুঝি বুক ফাটিয়া মরিয়াই যাইত। কোনদিন ঘরে আসিয়া দেখিতে পায় অনাদির মুখে গভীর বিষাদের ছাপ, স্তিমিত চোখে দৃষ্টি আছে কিনা সন্দেহ। ঘুম আসে নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিলেও ঘুম যে আজ তার আসিবে না, নীলা তা জানে, কিন্তু হাই সে তুলিতেছে মিনিটে মিনিটে।

কি বলিবার আছে, কি করিবার আছে? হয় দাঁতের ব্যথা, নয় মাথা ধরা, নয় জ্বরভাব, অথবা আর কিছু অনাদিকে প্রায়ই রাত জাগায়, অন্যদিন সে রাত জাগে নীলার জন্য। সুযোগ পাইলে নীলা চুপি চুপি নিঃশব্দে কাঁদে। সজ্ঞানে মনের মত স্বামীলাভের তপস্যা সে কোনদিন করে নাই, কি রকম স্বামী পাইলে সে সুখী হইবে, কোনদিন এ কল্পনা তার মনে আসে নাই,

সুতরাং আশাভঙ্গের বেদনা তার নাই। আশাই সে করে নাই, তার আবার আশাভঙ্গ কিসের? অনাদির সোহাগেই সোহাগ পাওয়ার সাধ মিটাইয়া নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করিতে পারিত, উত্তেজনা ও অবসাদের নাগর-দোলায় ক্রমাগত স্বর্গ ও নরকে ওঠা-নামা করার যে চিরন্তন প্রথা আছে জীবন যাপনের, তার মধ্যে নরকে নামাকে তুচ্ছ আর বাতিল করিয়া দিয়া সকলের মত সেও একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া নিতে পারিত যে স্বর্গই সত্য, বাকী সব নিছক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু স্বামীই তো মেয়েদের সব নয়, গত জীবনের একটা বড়রকম প্রত্যাবর্তন তো নীলা আশা করিয়াছিল, যে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সহরে তাদের সেই আগেকার বাড়ীতে থাকা, সকলের না হোক অন্ততঃ একজনের কাছে সেইরকম আদর যত্ন পাওয়া, অবসর সময় বলাইদের মত কোন প্রতিবেশীর তিনতলা বাড়ীর ছাতে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ীর সমুদ্র দেখা আর বলাই-এর মত কারো মুখে আসল সমুদ্রের গল্প শোনার মোটামুটি একটা মিল আছে। এখানে নীলাকে বিশেষ অনাদর কেউ করে না, লজ্জায় কম করিয়া খাইলেও মামাবাড়ীর চেয়ে এখানেই তার পেটভরা খাওয়া জোটে, এখানে তাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া হয় নাই, এখানে থাকিবার স্বাভাবিক অধিকারই তার আছে, এটা সকলে যেমন সহজভাবে মানিয়া লইয়াছে, সে নিজেও তেমনি আপনা হইতে সেটা অনুভব করিয়াছে। মামাবাড়ীর চেয়েও এখানকার অজানা অচেনা নরনারীর মধ্যে ঘোমটা দেওয়া বধূজীবন যাপন করিতে আসিয়া নীলা তাই স্বস্তি পাইয়াছে অনেক বেশী। তবু একটা অকথ্য হতাশার তীব্র ঝাঁঝালো স্বাদ সে প্রথম অনুভব করিয়াছে এখানে। গুমরাইয়া গুমরাইয়া এই কথাটাই দিবারাত্রি মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতেছে যে, সব তার শেষ হইয়া গিয়াছে, কিছুই তার করার নাই, বলার নাই; পাওয়ার নাই, দেওয়ার নাই—শানাই বাজাইয়া একদিন তার জীবনের সাধ, সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দের সমস্ত জের মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'কাঁদছ নাকি? কি হয়েছে?'

'কাঁদি নি তো।'

কাঁদিতে কাঁদিতেই নীলা বলে সে কাঁদে নাই। জানুক অনাদি, কি আসিয়া যায়? কাঁদা আর না কাঁদা সব সমান নীলার। নীলার কান্নার মৃতসঞ্জীবনী যেন হঠাৎ মৃতপ্রায় দেহে মনে জীবন আনিয়া দিয়াছে এমনিভাবে

অনাদি তাকে আদর করে, ব্যাকুল হইয়া জানিতে চায়, কেন কাঁদিতেছে নীলা, কি হইয়াছে নীলার ? এখানে কেউ গালমন্দ দিয়াছে ? মা-বোনের জন্য মন কেমন করিতেছে ? অনাদি নিজে না জানিয়া মনে কষ্ট দিয়াছে তার ? একবার শুধু মুখ ফুটিয়া বলুক নীলা, এখনই অনাদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

কিন্তু কি বলিবে নীলা, বলার কি আছে ? সে কি নিজেই জানে, কেন সে কাঁদিতেছে ? আগে প্রত্যেকটি কান্নার কারণ জানা থাকিত, কোন্ কান্না বকুনির, কোন্ কান্না অভিমানের, কোন্ কান্না শোকের, আর কোন্ কান্না সমুদ্র দেখার সাধের মত জোরালো অপূর্ণ সাধের। আজকাল সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নার সমস্ত প্রেরণাগুলি যেন দল বাঁধিয়া চোখের জলের উৎস খুলিয়া দেয়।

সেদিন অনাদি ভাবে, কান্নার কারণ অবশ্যই কিছু আছে, নীলা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। পরদিন আবার তাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে রীতিমত ভড়কাইয়া যায়, কান্নার কারণটা তবে তো নিশ্চয় গুরুতর! আরও বেশী আগ্রহের সঙ্গে সে কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং কিছুই জানিতে না পারিয়া সেদিন তার একটু অভিমান হয়। তারপর দু'দিন নীলা কাঁদে কিনা সেই জানে, দাঁতের ব্যথা আর মাথার যন্ত্রণায় বিব্রত থাকায় অনাদি টের পায় না।

পরদিন আবার নীলার কান্না সুরু হইলে রাগ করিয়া অনাদি বলিল, 'কি হয়েছে, যদি নাই বলবে, বারান্দায় গিয়ে কাঁদো, আমায় জ্বালিও না।'

এতক্ষণ কাঁদিবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিলনা, এবার স্বামীর একটা কড়া ধমক খাইয়া নীলা অনায়াসে আরও বেশী আকুল হইয়া কাঁদিতে পারিত, কিন্তু ধমক খাওয়া মাত্র নীলার কান্না একেবারে থামিয়া গেল।

'দাঁত ব্যথা করছে তোমার ?'

অনাদি বলিল, 'না।'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

'না।'

'তবে ?'—নীলা যেন অবাক হইয়া গিয়াছে। দাঁতও ব্যথা করিতেছে না, মাথারও যন্ত্রণা নাই, কাঁদিবার জন্য তবে তাকে ধমক দেওয়া কেন,

বারান্দায় গিয়া কাঁদিতে বলা কেন ? দাঁতের ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা না থাকিলে তো তার প্রায় নিঃশব্দ কান্নায় অনাদির অসুবিধা হওয়ার কথা নয় !

তারপর ধমক দিয়া কয়েকবার নীলার কান্না বন্ধ করা গেল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে ধমকেও আর কাজ দিল না। মাঝে মাঝে তুচ্ছ উপলক্ষে, মাঝে মাঝে কোন উপলক্ষ ছাড়াই নীলা কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল, তার একটা উদ্ভট ও দুর্নিবার পিপাসা আছে, নিজের নাকের জল চোখের জলের স্রোত অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিরাম পান না করিলে তার পিপাসা মেটে না।

তারপর ক্রমে ক্রমে অনাদি টের পাইতে থাকে, বৌ-এর তার কান্নার কোন কারণ নাই, বৌটাই তার ছিঁচ্‌কাঁদুনে, কাঁদাই তার স্বভাব।

অনাদির মা-ও কথাটায় সায় দিয়া বলেন, 'এদ্দিন বলিনি তোকে, কি জানি হয়তো ভেবে বসবি আমরা যন্ত্রণা দিয়ে বৌকে কাঁদাই, তোর কাছে বানিয়ে মিছে কথা বলছি—বড্ড ছিঁচ্‌কাঁদুনে বৌ তোর। একটু কিছু হ'ল তো কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। আগে ভাবতাম, বৌ বুঝি বড্ড অভিমানী, এখন দেখছি তা তো নয়, এ যে ব্যারাম ! আমাদের কিছু বলতে কইতে হয় না, নিজে নিজেই কাঁদতে জানে। ও বেলা ও-বাড়ীর কানুর মা মহাপ্রসাদ দিতে এলো, বসিয়ে দুটো কথা বলছি, বৌ কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে, বলা নেই কওয়া নেই ভেউ ভেউ ক'রে সে কি কান্না বৌয়ের ! সমুদ্দুরের চান করার গল্প থামিয়ে কানুর মা তো থ বনে' গেল। যাবার সময় চুপি চুপি আমায় বলে গেল, বৌকে মাদুলী তাবিজ ধারণ করাতে। এসব লক্ষণ নাকি ভাল নয়।'

অনাদির মা কান পাতিয়া শোনে, দরজার আড়াল হইতে অস্ফুট একটা শব্দ আসিতেছে।

'ঐ শোন্। শুনলি ?'

বাহিরে গিয়া অনাদি দেখতে পায়, দরজার কাছে বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া নীলা বঁটিতে তরকারী কুটিতেছে। একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।

সুবোধ ঘোষ

ফসিল

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড় ; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন ; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। এক কুড়ির উপর মহারাজার উপাধি। তিনি ত্রিভুবন পতি ; তিনি নরপাল, ধর্মপাল এবং অরাতিদমন। দু'পুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হ'তো ; এখন সেটা আর সম্ভব নয়।

তার বদলে আজকাল অপরাধীকে শুধু উলঙ্গ ক'রে নিয়ে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতির জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভিতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে ; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ি আর তরবারির ঘটা ; দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মতো তামা আর লোহার ঢাল।

সচিব আছে, সেরেস্তাদারও আছে। ক্ষত্রিয় তিলক আর মোগল তকমার অদ্ভুত মিলন দেখা যায় দপ্তরে। যেন দুই যুগের দুই জাতের আমলাদের যৌথ-প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করছেন। সেই অপূর্ব অদ্ভুত শাসনের তাপে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানার কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল অঞ্জনগড়—শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসার ছাওয়া রুক্ষ কাঁকরে মাটির ডাঙা আর নেড়া পাহাড়। কুর্মি আর ভীলেরা

দু'ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসিল বিভাগ আর ভীল ও কুর্মি প্রজাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায়না। কিন্তু অর্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টিম আছে। হয়শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ আস্তাবল সতত মুখরিত। সিড্‌নির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির উপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল-ভুষি খাওয়ানো চলে না, ভুট্টা যব জনার চাই-ই।

তসিলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ক্ষাত্রবীর্যের স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ, সব বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে সোজা গিয়ে ভর্তি হয় কোন ধাঙর-রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায়না কুর্মি প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাত পুরুষের বাস। ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ; সালসার মতো সুগন্ধ মাটিতে। তাদের যেন নাড়ির টানে বেঁধে রেখেছে এই মাটি। বেহায়ার মতো চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়। ঋতুচক্রের মতো এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিন সন্ধ্যার মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড় থেকে দয়াধর্ম একেবারে নির্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের উপর দুস্থ জমায়েত হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে-আল্পনা আঁকা হাতির পিঠে চড়ে জুলুস নিয়ে পথে বের হন প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তাঁর জন্ম দিনে কেল্লার আঙিনায়

রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই, আর দুচারটে অভাগার মাথা ফাটবেই।

চিঁড়ে আশীর্বাদ বা রামলীলা—সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়। প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন আদায় উসুল আর তসিল চলছিল বটে, কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব অটুট রাখা যায় না। নরেন্দ্র মণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টিমের খরচ। রাজবাড়ীর বাপের কালের সিন্দুকের রুপো আর সোনার গাদিতে ক্রমে ক্রমে হাত দিতে হয়; আর সিন্দুকও খালি হতে থাকে।

অঞ্জনগড়ের এই উদ্বিগ্ন অদৃষ্টের এক সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেণ্টের পদে নিযুক্ত হয়ে এল নতুন একজন আইন নবীশ উপদেষ্টা। আমাদের মুখার্জিই এল ল-এজেণ্ট হয়ে। মুখার্জির চওড়া বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে মুখার্জিই হয়ে গেল 'ডি ফ্যাক্টো' সচিবোত্তম আর সচিবোত্তম রইল শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জি আদর্শবাদী। ছেলেবেলার ইতিহাস-পড়া মার্কিনী ডেমোক্রেসির স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে—যে সৎসাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না। যে কল্যাণ কৃৎ, তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জি তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিলে স্টেটের উন্নতির সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেণ্ট সাহেবকে—একদিকে যেমন কট্টর অন্য দিকে তেমনি হমদরদ। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিও করে। মুখার্জির নির্দেশে বন্ধ হল লাঠিবাজি, সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করা হলো। স্টেটের জরিপ হলো নতুন করে, সেন্সাস নেওয়া হলো। এমনকি মরচে-পড়া কামান দুটোকেও পালিশ দিয়ে চকচকে করে ফেলা হলো।

ল-এজেণ্ট মুখার্জিই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। কলকাতা থেকে জিওলজিষ্ট আনিয়ে, সার্ভে ও সন্ধান করিয়ে একদিন বুঝতে পারে মুখার্জি, এই অঞ্জনগড় রত্নগর্ভ, এর গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেষ্টসের স্তূপ। কলকাতার মার্চেণ্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল মুখার্জি। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালয়রী ষ্টাইলের প্যালেস। মার্বেল, মোজেয়িক, কংক্রিট আর ভেনিসিয়ান শার্শির বিচিত্র পরিসজ্জা! সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জার্মান লিমুজিন, সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানি আইরিশ পনির অবিরাম লাথালাথি, প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবারাত্র ধক্ ধক্ শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেণ্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করছে মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়া বাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পাম্প বসানো ইঁদারা; বাংলো, কেয়ারি-করা ফুলের বাগিচা, ক্লাব আর জিমখানা। কুর্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরি পায়, মুর্গি বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যার মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন—দুটো নতুন পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী করতে হবে; আরো এক শ' বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে করা ইটালিয়ান ব্যাণ্ড মাষ্টার হ'লেই ভাল।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের উপর ছড়িয়ে মুখার্জি বিভোর হয়ে ভাবে তার ইরিগেশন স্কিমটার কথা।—উত্তর থেকে দক্ষিণ, সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে খিলান-করা কড়া গাঁথুনির স্লুস্ বসানো বড় বড় ডাম, অঞ্জনা নদীর সমস্ত জলের ঢল কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভিতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মতো। প্রত্যেক কুর্মি প্রজাকে মাথাপিছু এক বিঘা জমি দিতে হবে বিনা সেলামিতে আর

পাঁচ বছরের মত বিনা খাজনায়। আউশ আর আমন, তা ছাড়া একটা রবি, বছরের এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক ; দক্ষিণে আখ, যব আর গম। তার পর—

তারপর ধীরে ধীরে একটা ব্যাঙ্ক ; ক্রমে একঠা ট্যানারি আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ। শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটি পরিকল্পনায় সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয় ; এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল, এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব—কভি নেহি! মুখার্জি উঠল। দেখা যাক্, বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তিটা টলাতে পারে কিনা।

মহারাজার কাছে মুখার্জি এগিয়ে যেতেই মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির গোছাটাকে একটা নির্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জির সামনে এগিয়ে দিলেন দুটো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ! আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ বছর ভূট্টা, যব, জনার যা ফলবে তার উপর যেন তসিলদারের জুলুম না হয়। আমরা নগদ টাকায় খাজনা দেব। আইনসঙ্গত ভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য ঃ কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো, বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভিতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গিয়েছে আর তাদের ঘরের মেয়েলোককেও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছে। আমরা মনে করি পেয়াদারা অন্যায় আর বে-আইনী কাজ করেছে এবং দাবি করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে। ইতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন।

মহারাজ বললেন,—দেখছ তো মুখার্জি, শালাদের সাহস।

—হাঁ, দেখছি।

টেবিলে ঘুষি মেরে বিকট চীৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়লেন—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি ; দু'দিন দু'রাত দেখি।

মুখার্জি মহারাজাকে শান্ত করে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভিতরে ভিতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি ?

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকি জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তবু তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা—একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরি কি জিনিস। ফয়জাবাদ ষ্টেশনে কোন বাবু সাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেনের কামরায় তুলে দাও। ব্যস্‌,—নগদ একটি আনা, হাতে হাতে।

দুলাল বলেছে—ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় য'টা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে, এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিণ্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরির রেট, হপ্তা পেমেণ্ট, ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ সবই দুলাল কুর্মিদের মুখ-পাত্র হয়ে আলোচনা করছে ; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিণ্ডিকেটও দুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে এস দুলাল। বল তো রাতারাতি বিশ ওজন ধাওড়া করে দিচ্ছি। তোমার সব কুর্মিদের ভর্তি করে নেব।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাতত কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক।

—আচ্ছা তাই হবে, সিণ্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দেয়।

দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মি একত্রিত হলো ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকা চুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়াল—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হলো। এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দেখ, কে আমাদের দুশমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জত-এর উপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোন মতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙ্গা শঙ্খের মত দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ে—ভাইসব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ……।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দেয়—মাহাতোর জয়।

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তার পর যে যার ঘরে গেল ফিরে।

ঘটনাটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন মুখার্জির কিছু জানতে বাকি রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘেই বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু মহারাজা যেন ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে না পারেন। ফিউডল দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ কমপ্লেক্সে জর্জের এই সব নরপালদের তা হ'লে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয়তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজেই এক হাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক।

পেয়াদারা এসে মহারাজাকে জানাল—কুর্মিরা রাজবাড়ীর বাগানে আর পলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে—বিনা মজুরিতে খাটলে পাপ হবে, রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়ল মুখার্জির। দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হলো। জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়াল। মেষশিশুর মত ভীরু, দুলাল যেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

—তুমিই এ-সব শয়তানি করছ? মহারাজা বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধুলো আমি।

—চুপ।

—জি সরকার।

—চুপ! মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

মহারাজা বললেন—ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্মি খনিতে কুলি হয়ে খাটতে পারবে না।

– জি সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হল মুখার্জির উপর।—সিণ্ডিকেটকে এখুনি নোটিশ দাও, যেন আমার অনুমতি না নিয়ে আমার কোন কুর্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র—যেহেতু আমরা নগদ মজুরি পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনির সাহেবদের কথা মান্য করতে বাধ্য। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না।···আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে।···রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকরি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিণ্ডিকেটেরও একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হবে—নিরানব্বই বছর পরে।

—কি রকম বুঝছ মুখার্জি? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

মহারাজ আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভিতর ছটফট করছে।

মুখার্জি সবিনয়ে নিবেদন করে—মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জি বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা? সিণ্ডিকেটের দুষ্ট উৎসাহেই কুর্মি সমাজের নাচানাচি। এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়!

দুলাল মাহাতোর কুঁড়েঘরের কাছে মুখার্জি এসে দাঁড়াল। ব্যস্তভাবে দুলাল বের হয়ে একটা চৌকি এনে মুখার্জিকে বসতে দিল। মাথার পাগড়িটা খুলে মুখার্জির পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসল মাটির উপর। মুখার্জি এক এক করে সব বুঝিয়ে বলে। শেষে যেন একটা অভিমানের সুরে ভেঙ্গে পড়ে মুখার্জির কণ্ঠস্বর—একি করছ মাহাতো! দরবারের ছেলে তোমরা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিণ্ডিকেট আজ না হয় তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন

তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।

মুখার্জির পায়ে হাত রেখে দুলাল বলে—কসম এজেণ্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজা, তাঁর জন্য আমরা প্রাণ দিতে তৈরী। তবে ঐ দরখাস্তটি একটু জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জি দুলালের কুঁড়েঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেক দিন, এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান, আহার আর পোশাক বদলাবার কথা মুখার্জিকে ভুলতে হলো আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামলো এসে সিণ্ডিকেটের অফিসে।

—দেখুন মিষ্টার গিবসন, রাজা-প্রজা সম্পর্কের মধ্যে দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের জন্য যে কোন সুবিধা দরবারের কাছে আবেদন করলেই পেয়ে যাবেন। গিবসন বলে—মিষ্টার মুখার্জি, আমরা মণিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে আরো লড়ব। —সব কুর্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলছেন! স্টেটের এগ্রিকালচার তাহ'লে কি করে বাঁচে বলুন তো? ঝোঁকের মাথায় মুখার্জি তার ক্ষোভের আসল কারণটি ব্যক্ত করে ফেলল।

—এগ্রিকালচার না বাঁচুক, ওয়েলথ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন? গিবসন বিদ্রূপের সুরে উত্তর দেয়।

তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন মিষ্টার গিবসন। কুলি ভর্তির সময় দরবার থেকে একটু অনুমোদন করিয়ে নেবেন এইমাত্র। মহারাজাও খুশী হবেন এবং তাতে আপনাদেরও অন্যদিকে নিশ্চয়ই ভাল হবে।

—সরি, মিষ্টার মুখার্জি! গিবসন বাঁকা হাসি হাসে।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলো মুখার্জির কর্ণমূল। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে অফিস ছেড়ে চলে গেল।

ম্যাককেনা এসে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার হে গিবসন?

—মুখার্জি, ছ্যাট মংকি অব অ্যান এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার, মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোন টার্মই গ্রাহ্য করিনি।

—ঠিক করেছে। শুনেছ তো, ওর ঐ ইরিগেশন স্কিমটার কথা! সময় থাকতে ভণ্ডুল করে দিতে হবে, নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন বাড়তির মুখে, খুব সাবধান।

—কোন চিন্তা নেই! পোষা বিড়াল মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করব।

পরস্পর হাস্য বিনিময় করে ম্যাককেনা বলে—

—মাহাতো এসে দাঁড়িয়ে আছে যে, ওকে ডেকে নিয়ে এস, আর সে কাজটা এবার সেরে ফেল।

সিণ্ডিকেটের অফিসের পিছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল মাহাতো। অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলে—এই যে দরখাস্ত তৈরী। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল; আজই দিল্লীর ডাকে পাঠিয়ে দেব।

সই করে মাহাতো। মাহাতোর পিঠ থাবড়ে ম্যাককেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মাৎ মাহাতো, আমরা আছি। যদি ভিটে মাটি উৎখাত করে, তবে চলে এস সব, আমাদের ধাওড়া খোলা রয়েছে তোমাদের জন্য, সব সময়, ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জি শুধু আকাশ পাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মতো সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলির মাথার ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গিয়েছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সে নিজেই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান; খাস কামরায়।

সচিবোত্তম ও ফৌজদার শুষ্ক মুখে বসে আছে। মহারাজা কৌচের চারিদিকে পায়চারি করছেন ছটফট করে। মুখার্জি ঢুকতেই একেবারে অগ্ন্যুদ্গার করলেন।

—নাও, এবার গদিতে থু থু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বস তার উপর আর স্টেট চালাও।

হতভম্ব মুখার্জি সচিবোত্তমের দিকে তাকায়। সচিবোত্তম তার হাতে তুলে দিল একটা চিঠি। পলিটিক্যাল এজেণ্টের নোট।—স্টেটের ইণ্টার্ন'ল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করেই বলল—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেণ্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চিৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্য কথা। আমি সব জানি মুখার্জি। আমি অন্ধ নই।

মুখার্জি—সব জানেন আপনি, এ কথার অর্থ কি সরকার ?

—থাম, সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধুলো মাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায় তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে? কে তাদের ভিতর ভিতর সাহস দেয় ?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের উপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যজন করে তাঁকে সুস্থ করতে লাগল। সচিবোত্তম ফৌজদার আর মুখার্জি ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।

—ফৌজদার সাহেব, এবার আপনিই আমার ইজ্জৎ বাঁচান।

সচিবোত্তম বলল—তাই হোক, কুর্মিদের আপনি শায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব, আর আমি সিণ্ডিকেটকে একটা সিভিল সুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কণ্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জির দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জি এরি মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজার চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পিছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে, তা স্বভাবতঃ শশক হলেও মুখার্জি আন্দাজ করে নিল। সত্যই তো, এ দিকটা তার এত দিন চোখে পড়েনি! তার ভুল হয়েছে। মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা জানাল:—আমার ভুল

হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি নিশ্চয়ই আসব।

মহারাজা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না, মুখার্জি, কি যে বল! তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনা। তবে পলিসি বদলাতেই হবে; একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না মুখার্জি।

শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জির হাত পায়ের গাটগুলিকে শিথিল করে দিয়েছে, দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু বিকাল হলে, ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে খেপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে বায়ে বেপরোয়া আণ্ডার নেক, হিট চালায়, কড় কড় করে এক একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে।

মুখের ফেনা আর গায়ের ঘামের স্রোতে ভিজে চুপসে যায় কালো ওয়েলারের পায়ের ফ্ল্যানেল, তবুও স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে মুখার্জি চার্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও বিশ্রাম করার নাম করে না মুখার্জি। অকারণে পোলো লনের চারদিকে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভরে যেন স্পীড পান করে।

খেলা শেষে মহারাজা অনুযোগ করেন।—বড় রাফ, খেলা খেলছ মুখার্জি।

সেদিনও সন্ধ্যার আগে নিয়মিত সূর্যাস্ত হলো অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে। মহারাজা সাজগোজ করে লনে যাবার উদ্যোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল।—চৌদ্দ নম্বরের পিট ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ! মহারাজা গলপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন।—সচিবোত্তম কোথায়? শীগগির ডাক। সিণ্ডিকেটের দেমাক এইবার গুঁড়ো করবো। সচিবোত্তম এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের চোখের মতো তাঁর চোখ। বললেন—দুঃসংবাদ।

—কিসের দুঃসংবাদ?

—বিনা টিকিটে কুর্মিরা লকড়ি কাটছিল। জঙ্গলের রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুর্মিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তার পর?—মহারাজের চোয়াল দুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলী চালিয়েছে। ছর্‌রা ব্যবহার করলেই ভাল ছিল! তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশজন আর ঘায়েল পঞ্চাশ জনের উপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাশ এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিক্যাল এজেণ্টের হুঁশিয়ারি চিঠিটা যেন চকচকে সূচীমুখ বর্শার ফলার মতো ভেসে বেড়াতে লাগল।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে? প্রশ্ন করেন মহারাজা।

—অন্তত সিণ্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে।—সচিবোত্তম উত্তর দিল।

মুখার্জিকে ডাকলেন মহারাজা।—এই তো ব্যাপার মুখার্জি। এইবার তোমার বাঙালী ইলম্‌ দেখাও। একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জি বলে—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটক ক'রে ফেলুন।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কি লাঠি ও লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ল দুলালের ঘরের দিকে।

মুখার্জি বলল—আমার শরীর ভাল নয় সরকার; কেমন গা বমি বমি করছে। আমি যাই।

চৌদ্দ নম্বরের পিট ধসেছে। মার্চেণ্টরা খুবই ঘাবড়ে গিয়েছে। তৃতীয় সিমের ছাদটা ভাল করে টিম্বার করা ছিল না, তাতে এই দুর্ঘটনা। উর্ধোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধুলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আসছে—বুম্‌, বুম্‌, বুম্‌। নরম পাথরের পিলারগুলি চাপের চোটে তুবড়ির মতো ধুলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরই মধ্যে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে পিটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝ পথেই দারোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।—কাজে যাও সব, কিছু হয়নি। কেউ ঘায়েল হয়নি, মরেওনি কেউ।

মার্চেণ্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছে। গিবসন বলে—মাটি দিয়ে ভরাট করবার উপায় নেই, এখনো দুদিন ধরে ধসবে। তবে হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরী করে রাখ। অন্তত একশো নাম কমিয়ে দাও।

ম্যাককেনা বলে—তাতে আর লাভ কি হবে? দি মহারাজার কানে পৌঁছে গিয়েছে সব। তা ছাড়া দ্যাট মাহাতো; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? কালকের সকালেই শহরের কাগজগুলি খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তার পর আসবেন একটি এনকোয়ারি কমিটি; একটা গান্ধিয়াইট বদমাশও বোধ হয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার?

সে রাতে ক্লাব ঘরে আর আলো জলল না; এক সঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জলে উঠল প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়ল মুখার্জির।

অভূতপূর্ব দৃশ্য! মহারাজা, সচিবোত্তম আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মূর আর প্যাটার্সন! সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেণ্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিত বদনে মহারাজা মুখার্জিকে অভ্যর্থনা করলেন।—মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জি। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ক্লামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য কি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, ফৌজদার সেটা মুখার্জির কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জি চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ, তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে অবসন্নের মতো বসে থাকে।

গিবসন মুখার্জির পিঠ ঠুকে একবার বলে—এসব কাজে একটু শক্ত হ'তে হয় মুখার্জি, নার্ভাস হবেন না।

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পিটের কাছে মোটর গাড়ী আর মানুষের একটা ভিড়। ফৌজদারের গাড়ির ভিতর থেকে দারোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাশটা টেনে নামাল। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাশ এল আরো। ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরের মুখে মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজিৎ চড়িয়ে দিলে একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছল ছল করছিল মুখার্জির চোখ দুটো। গাড়ির বাম্পারের উপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পিটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা। অনেক দিন পরের একটা কথা।

লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল। আর ছেনি হাতুড়ি গাঁইতা, কতগুলি লোহার ক্রুড ও কিম্ভূত হাতিয়ার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধ হয় একদিন আকস্মিক কোন ভূবিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি শাদা শাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই!

সৈয়দ মুজতবা আলী

পাদটীকা

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তা ব্যক্তিরা ছেলে-ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয় জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যারা কোনোগতিকে সংস্কৃত বা বাংলার শিক্ষক হয়ে হাই স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সব চেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিত মশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন, আমার আর ঠিক মনে নাই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে, পণ্ডিত সমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেন নি—পালপরব, শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাংলা ভাষার প্রতি পণ্ডিত মশাইয়ের ছিল অবিচল অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না। বাংলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজী হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি

এবং সমাস। তাও বাংলা সমাস না। আমি একদিন বাংলা রচনায় 'দোলা লাগা' 'পাখী জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সেদিন কাজে লেগে ছিল। এবং তার পর মুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এই দণ্ডেই তুই ইস্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।

কিন্তু পণ্ডিত মশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশী, এবং টেবিলের উপর পা দুখানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সবচেয়ে বেশী। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাষ্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাষ্টার তার কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গ-নিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিত মশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিত মশাইকে খুশী করার পন্থা দরকার হলে ঐ বিষয়টি নতুন করে উথাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিত মশাই একটু বেশী স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাংলা লেখা ছিল আমার বাই; ঐ 'দোলা লাগা পাখী-জাগাই' আমার বর্ণাশ্রমধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস-ভক্ষণ। পণ্ডিত মশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানাপ্রকার কটুবাক্য বর্ষণ করে। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়-সম্ভূত কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সম্বোধন করতেন না। তাছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে, তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, পণ্ডিত মশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে বলতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তার অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত স্নিগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মন স্থির করতে পারিনি যে, সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি কোন্‌টা বেশি হয়েছে।

পণ্ডিত মশায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোঁকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাচানো

থাকত—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয় চাদর। ক্লাশে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন। আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্রবারের মতন স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্ববান করতেন। তার পর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল নয় কি? তারপর কখন আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড় বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিত মশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এ রকম দিনযামিনী সায়ং প্রাত শিশির-বসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—এ কথা অস্বীকার করার জো নাই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তার যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে পড়া, টিকিতে দোল-লাগা, কাষ্ঠাসন-শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ আবার 'দোলালাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিত মশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে সময়ে আসামের চীফ কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসেন-বেল। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে

বলতেন যে, তাঁর নাম আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন. ডি' তে হয় নন্দদুলাল আর বীট্‌সন বেল অর্থ বাজায় ঘণ্টা—

—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে। ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সেই একদিন খবর দিল লাটসায়েব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর-ক্লার্ক না কি; সে তাঁর কাছ থেকে পাকাখবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল-আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। এক দিক দিয়ে যেমন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাষ্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাষ্টার মশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজাভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাষ্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কী নাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাষ্টার—নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছে, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কি হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাষ্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমনরুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। আমাদের পণ্ডিত মশাই একটা লম্বা হাতা আন্‌কোরা নতুন হলদে রংগের গেন্‌জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাষ্টাররা কলরব করে সে গেন্‌জিটার প্রশংসা করছেন, নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন; কেউ বলছেন পণ্ডিত মশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিত মশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না),

কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে, (হাতী, পণ্ডিত মশাইকে সার্কাসের সংগের মত দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেন্‌জির আবার ফিট আউট কি?) শেষটায় পণ্ডিত মশাইয়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভটচায, এ রকম উমদা গেন্‌জি, স্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল, তারই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানী দেউলে হয়ে গিয়েছে; আর কারো কপালে এ রকম গেন্‌জি নেই।'

চাপরাশী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়ডে বাংলা। পণ্ডিত মশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেন্‌জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে, শাস্ত্রে সেলাই করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিত মশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সাহেব আসছেন শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না, তাই গেন্‌জি পরে এসেছেন। গেন্‌জি বোনা জিনিস, সেলাই করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিত মশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেন্‌জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে, পণ্ডিত মশায়ের গালাগাল, বোয়াল চোখ সব কিছুর জন্য আমরা তখন তৈরী কিন্তু কেন জানিনে তাঁর রুটিন মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিত মশাই গেন্‌জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিত মশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিত মশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান, ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেন্‌জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেন নি, তার উপর গেন্‌জি, সেও আবার একদম নতুন কোরা গেন্‌জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায়, শেষটায় পণ্ডিত মশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্বযন্ত্রণা' কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড় খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সাহেবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, পণ্ডিত মশাই, আপনি গেন্‌জিটা খুলে ফেলুন। লাট সাহেব এলে আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় পরে নেবেন।

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্ত্রণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যাস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যাস হবে না পণ্ডিত মশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিত মশাইয়ের মতলব ছিল গেন্‌জিটা খুলে ফেলারই, শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহভরা চোখে বললেন, 'তুই তো আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পণ্ডিত মশাই গেন্‌জিটা খুলে টেবিলের উপর সেটা রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তার টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশী ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গে খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোন বিপদ ঘটলো না। পণ্ডিত মশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেন্‌জিটার নাম, ধাম, কোন্ দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময় মত ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিত মশাই আবার তার গব্ব-যন্ত্রণাটা উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেক্টার, ইন্‌সপেক্টার, হেডমাষ্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সাহেবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পান্‌ডিট' বলে সাহেব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিত মশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সাহেবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিতশ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কি রকম বিগলিত হতেন, তা তাদের সে সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নাই।

হেডমাষ্টার পণ্ডিত মহাশয়ের কৃৎ-তদ্ধিতের বাই জানতেন, তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্‌ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ।' লাট সাহেব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম প্লিজ।' লাট সাহেব আমাদের বলল, 'প্লীজ এ কী কাণ্ড।' তখন আবার কেউ রা কাড়ে না। হেডমাষ্টার শুধালেন, 'বিহঙ্গ' আমরা চুপ, —তখন প্লীজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁটা যতেটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেলল—আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সাহেব ততক্ষণ হেডমাষ্টারের সঙ্গে পণ্ডিত শব্দের মূল নিয়ে ইংরাজীতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাষ্টার কি বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছেন, যার সব কিছু পণ্ড গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরাজ-শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব-পণ্ডের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সাহেব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিত মশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম, নড করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে

চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু'তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেন্‌জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাংলা ক্লাশ বসেছে, পণ্ডিত মশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন না শুধু চোখ বন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিত মশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগরূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম—'আজ্ঞে।'

পণ্ডিত মশাই শুধালেন, 'লাট সাহেবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল্ তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?' বললুম, ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেন নি।'

পণ্ডিত মশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্নবার বলছিস কেন রে মূর্খ? আমি কালা না তোর মত অমানুষ।'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিত মশাই, জিজ্ঞাসা করুন না কেন পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে।'

পণ্ডিত মশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা দিবান্ধ,—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হঁ্যা, হঁ্যা, দেখেছি। ও তো এক সেকেণ্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিত মশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ এক গৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হু' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরীতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে সেলাম টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা, লাট সায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।

পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট দিতেন।

পণ্ডিত মশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয় সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে খবরটাও গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিত মশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আট জনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহন বাবু আমাদের অঙ্কের মাষ্টার—পণ্ডিত মশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিত মশাই বললেন, বেশ বেশ। তবে শোনো। মিম্বার উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়। এবার দেখি, তুই কি রকম আঁক শিখেছিস। বলতো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয় আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি ঠ্যাং-এর জন্য কত খরচ হয়?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিত মশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মী, বৃদ্ধামাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবন-ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বলতো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাং-এর সমান?' আমি হতবাক।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিত মশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মত একবার পণ্ডিত মশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে-ছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায়, বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায় নি পণ্ডিত মশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিত মশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেংগে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরন্ময়' 'silence golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা পাই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উস্তাদ মেহেরা খাঁ

চার পুরুষ ধরে এঁদের গানবাজনার সখ। প্রথম যিনি, তিনি নাকি ছিলেন অদ্বিতীয় তবলচী। সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি আসরে বসলে বুক দুরু দুরু করত দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ের সব নামজাদা ওস্তাদদের। একবার বেতালা হলে আর রক্ষা ছিলনা, হাতখানা বাঁয়ার ওপরে না নেমে সোজা গিয়ে নামত অসতর্ক গাইয়ের গালে। যখন বাজাতেন তখন আঙ্গুলগুলো তাঁর চোখে পড়তো না, তাঁর তবলা লহরা শুনে মনে হত যেন দ্রুত জলদে সেতারের ঝঙ্কার বেজে চলেছে।

দু'বছরের ছেলেকে কোলে বসিয়ে তবলার পাঠ দিয়েছিলেন তিনি। ছেলে বাপের চাইতেও বড় ওস্তাদ হয়ে উঠলেন। শোনা যায় শেষ বয়সে তিনি আর তবলা বাজাতেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে নিবিড় ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন, সঙ্গত করবার মত একটা গাইয়েই নেই, ও বাজিয়ে আর কি করব।

বোধ হয় সেই দুঃখে নিজের ছেলেকে তিনি আর তবলা ধরালেন না। তবু হয়তো বা রক্তের সংস্কারে নিজের তাগিদেই তৃতীয় পুরুষ ধরলে সেতার আর গান। আর সেই সময়েই আবির্ভাব হল উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের। মেহের আলীর সংক্ষেপ হয়েছে মেহেরা, অতিরিক্ত আকারটার তিনি প্রতিবাদ করেন না, লোকেও নিরঙ্কুশ।

এখন চতুর্থ পুরুষের যুগ চলছে। আগের তিন পুরুষের চাইতে একেবারে আলাদা। বাঁশি বাজায়, বাজায় বিলিতি বাজনা গীটার। আকারে প্রকারে পুরোদস্তুর হাওয়া লেগেছে আধুনিক কালের। পূর্ব পুরুষেরা মাত্র সরস্বতীর বীণাপাণি রূপটাই দেখেছিলেন, কিন্তু বিচিত্র ব্যতিক্রমের মতো চতুর্থ পুরুষ তাঁর জ্ঞানপদ্মের দুটি চারটি পাঁপড়িও সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, যে নরোত্তম চৌধুরী গাড়িতে চেপে বসলে চাকা খসে পড়বার আশঙ্কা হত, তাঁর বংশধর বলে বিশ্বাস করা শক্ত।

শুধু ওস্তাদ মেহেরা খাঁ কোলের কাছে টেনে নেন তানপুরাটা। গুন গুন করে গান করেন দাদুর পদ ঃ

"ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়াল বজাওয়ি,
যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি—"

"যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি না আওয়ি।" যে দিন যায় সে আর ফিরে আসে না। একথা ওস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের চাইতে কে আর বেশি করে জানে!

কোথা থেকে কোথায়! নিজের কাছে নিজেকেই এখন একটা অপরিচিত মানুষের মতো মনে হয় উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের। কপালের ওপরে কতগুলো রেখা ফুটে উঠেছে এলোমেলোভাবে, বাইরে যে চোখ তাঁর ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনের ভেতরে তা যেন ঝলমলিয়ে ওঠে দৃষ্টিপ্রদীপের আলোতে। শুধু তাও নয়। বাইরে ক্রমশ সমস্ত আবছা হয়ে আসছে বলেই বোধহয় মনের নিভৃতে আপাতবিস্মরণগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাস্বর হয়ে উঠেছে অন্তর্মুখিনতার দীপ্তিতে।

ঘরের দাওয়ায় সতরঞ্চ পেতে চুপ করে বসেছিলেন ওস্তাদজী। এক পাশে সেতারটা পড়ে আছে। বাজাবার জন্যে নয়, কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। যখন বাজান না, তখনও অন্যমনস্কভাবে সেতার কিংবা তানপুরার ওপরে একখানা হাত ফেলে রাখেন তিনি। অন্ধের লাঠির মতো ওরা হাতের কাছে না থাকলে কেমন অসহায় মনে হয় নিজেকে, বোধ হয় নিরাশ্রয়। অথবা সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে সুরলক্ষ্মীর কাছ থেকে যে সম্পদ তিনি পেয়েছেন, কৃপণের ধনের মতো সে সঞ্চয়কে তিনি চোখের আড়াল করতে পারেন না।

দূরে কোথায় সানাই বাজছে—বিয়ের আয়োজন চলেছে কোথাও। উস্তাদজী উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। বেহাগ ধরেছে লোকটা। বেশ বাজাচ্ছে—শিক্ষা আছে মনে হয়। কিন্তু একি! মেহেরা খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তাল কাটল। আবার, আবার, আরে আরে এ কি হচ্ছে! উত্তেজনায় হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসলেন তিনি—পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? বেহাগের সঙ্গে খাম্বাজকে মিশিয়ে ফেলল যে!

নৈরাশ্যে এবং ক্ষোভে উস্তাদজী আবার এলিয়ে দিলেন নিজেকে। অস্ফুট স্বরে বললেন, বেকুফ, বেতমিজ !

এটা বাঁধা গালাগালি। যে কোন বিরক্তি আর অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ার মতো ওই দুটি কথা বেরিয়ে আসে উস্তাদজীর মুখ দিয়ে। কথা দুটো শিখেছিলেন গুরুদেব আল্লাবক্সের কাছে, শিষ্যেরা ভুলচুক করলে গর্জে উঠতেন তিনি ঃ বেওকুফ বেতমিজ কাঁহাকা। গুরুর অন্যান্য দোষগুণের সঙ্গে শিষ্যও এ দুটি আয়ত্ত করেছেন উত্তরাধিকার সুত্রে।

সানাইওয়ালার বাজনাটা যেন ছুরির খোঁচার মতো এসে ঘা দিচ্ছে কানে। মেহেরা খাঁ আবার বললেন, বেতমিজ, বেওকুফ !

এরই ভেতরে শঙ্কর কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে গাল দিচ্ছেন ওস্তাদজী ?

মেহেরা খাঁ মুখ ফেরালেন। কথাটার জবাব না দিয়ে বললেন, আও বেটা, বৈঠো।

পাশের সতরঞ্চে বসল শঙ্কর। তারপর আবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু গাল দিচ্ছেন কাকে ?

ভ্রূকুঞ্চিত করলেন উস্তাদজী। বললেন—শুনতে পাচ্ছ ?

—কী ?

—ওই শানাই ?

—ওঃ ! শঙ্কর হাসল—ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। বললে, ভুল বাজাচ্ছে বুঝি ?

—শুধু ভুল ! আর একটা ভয়ঙ্কর ভ্রূ-ভঙ্গি করলেন উস্তাদজী ; যা তা তাল কাটছে, সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু বেহাগের সঙ্গে খাম্বাজ মিশিয়ে বেইজ্জত করে দিয়েছে একেবারে। কান ধরে দুই থাপ্পর দেওয়া উচিত বেকুফের।

শঙ্কর বললে, ভুলটা কিন্তু আপনারই উস্তাদজী।

উস্তাদজী প্রায় সিংহের মতো হুঙ্কার করে উঠলেন ঃ আমার ভুল ? কোন্ বেতমিজ—

হাসিমুখেই শঙ্কর বাধা দিলে। বললে, আপনি বুঝতে পারেন নি।

—আমি বুঝতে পারিনি! এবার আর ক্রোধ নয়, বিস্ময়ে আর বেদনায় মেহেরা খাঁ যেন হতবাক হয়ে গেলেন। এই চল্লিশ বছর ধরে আমি তবে কী করেছি!

উস্তাদজীর বেদনার্ত আহত মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি বোধ করল শঙ্কর। কোমলভাবে বললে, 'আপনি ঠিকই করেছেন। কিন্তু এতো তা নয়। ও লোকটা বেহাগ বাজাচ্ছে না, বাজাচ্ছে আধুনিক একটা গান।'

—ওঃ, আধুনিক গান। মুহূর্তে উস্তাদজী যেন নিভে গেলেন। একবার অসহায় দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে। কিছু একটা বলা উচিত, কোন রকম একটা আশ্বাস দেওয়া উচিত উস্তাদজীকে। কিন্তু কোনো কথা মুখে এলোনা তার; মৃদু একটা নিঃশ্বাস চেপে শঙ্কর চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

আধুনিক! আধুনিক কাল—আধুনিক গান! সেতারের ওপর হাতটা অস্থির হয়ে উঠল মেহেরা খাঁর, ঝনাৎ করে সাড়া দিয়ে উঠল তারগুলো। উস্তাদজীর মনে হল আহত যন্ত্রণার একটা আকস্মিক আর্তনাদ যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে সেতারটা থেকে। এতদিন ধরে ওর তারে তারে জেগেছে বিশুদ্ধ সুরে-লয়ে-বিস্তারে নানা রাগ-রাগিণীর আলাপ; ওর তারে তারে ভৈরোঁ-পূরবীর প্রশান্তি পড়েছে ধ্যানমূছিত হয়ে, ওর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মেঘমেদুর নীলিম দিনের বাদলমৃদং প্রতিধ্বনিত হয়েছে; গভীর রাত্রির স্তব্ধতায় ওর মৃদু করুণ মীড় আহ্বান জানিয়েছে লোকান্তপারের অশরীরীদের—তাদের নিঃশব্দ নিশ্বাস যেন অনুভব করতে পেরেছেন উস্তাদজী; ওর দ্রুত কঠিন ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন বিলসিত হয়ে গেছে সুরের সুতীক্ষ বিদ্যুৎলেখা, ওর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জ্বলেছে সুরের মশাল।

কিন্তু আজ! এই মুহূর্তে উস্তাদজী যেন ওর আহত বুকের ভেতর থেকে অসহায় আর্তনাদ শুনতে পেলেন একটা। ওকি শুধুই আর্তনাদ, না মৃত্যুযন্ত্রণার গোঙ্গানি?

আধুনিক কাল। হ্যাঁ—যুগ বদলেছে বইকি। 'যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি।' যে দিন গেছে সে আর ফিরবে না। প্রবাহিত হয়ে চলে গেল যে সময়, উজানের মুখে সে আর ফিরে আসবে না কোন দিন।

আত্মমগ্ন দৃষ্টিটা তুলে ধরলেন মেহেরা খাঁ। কাল বদলায়, মানুষ বদলায়; কিন্তু যে পৃথিবী, যে প্রকৃতি থেকে তার বিন্দু বিন্দু মাধুর্যের মতো ক্ষরিত হয়েছে সুর আর সঙ্গীত, কই, সে পৃথিবী তো বদলায়নি! আশ্চর্য সবুজ আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে দূরের বনরেখাকে, সকালের রোদে ঝলমল করে উঠেছে সামনে খালের ঘোলা জলটা, ওই শানাইয়ের অস্বস্তিকর ভুল বাজনাটাকে ছাপিয়েও দোয়েলের শিস্ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। চল্লিশ বছর আগে যা দেখেছিলেন আজও তা তেমনিই আছে—কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি তার। শুধু সময় বদলেছে—বদলে গেছে মানুষ।

বদলে গেছে মানুষ। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজেই চমকে উঠলেন উস্তাদজী। বদলাবেই তো—উপায় নেই, রোধ করা যাবেনা তাকে। মেহেরা খাঁ নিজেই কি কম বদলেছেন? চল্লিশ বছর আগেকার একখানা ভুলে যাওয়া মুখ হঠাৎ আলো হয়ে উঠল মনের কালো অন্ধকারের ওপরে। আজকে কি ওই হারানো মানুষটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে আর?

বাইরের দৃষ্টিটা হঠাৎ ফিরে এল নিজের ভেতরে—সন্ধানী আলোর ঝলক ফেলে ফেলে কী যেন খুঁজতে লাগল সেখানে। একটা পোড়ো বাড়ির মতো অসংলগ্ন ধ্বংসস্তূপ—ভাঙ্গা খেলনার টুকরো যেন ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। নানা রং, নানা আকার। ছেলেমানুষি কৌতুক বোধ হয়, অকারণ কৌতুহলে কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে ওই ভাঙ্গা টুকরাগুলোকে, জোড়াতাড়া দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—

সন্ধানী আলোর অর্থহীন সন্ধান এক জাগায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, শিউরে উঠল আলোকবৃত্তটা। জীবনের সব কিছুই খেলনা নয়, সব কিছুই ভাঙ্গা খেলনার টুকরো নয়। ওই আলোকবৃত্তটার ভেতরে ছায়া-বাজীর মতো কতগুলো বিশৃংখল ছবি ফুটে উঠেছে। উস্তাদজী চোখ বুঁজলেন। হ্যাঁ—চেনা যাচ্ছে বইকি। একটা শহর—মস্ত বড় শহর। তার নাম দিল্লী।

হাতীর মতো অতিকায় চেহারা, টুকটুকে রং—ফুলো মস্ত গাল দুটো থেকে যেন ফুটে পড়ছে রক্ত, লাল লাল চোখে নেশার জড়তা। উস্তাদ আল্লাবক্স। প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়ে আছেন পাহা-

আত্মমগ্ন দৃষ্টিটা তুলে ধরলেন মেহেরা খাঁ। কাল বদলায়, মানুষ বদলায়; কিন্তু যে পৃথিবী, যে প্রকৃতি থেকে তার বিন্দু বিন্দু মাধুর্যের মতো ক্ষরিত হয়েছে সুর আর সঙ্গীত, কই, সে পৃথিবী তো বদলায়নি! আশ্চর্য সবুজ আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে দূরের বনরেখাকে, সকালের রোদে ঝলমল করে উঠেছে সামনে খালের ঘোলা জলটা, ওই শানাইয়ের অস্বস্তিকর ভুল বাজনাটাকে ছাপিয়েও দোয়েলের শিস্ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। চল্লিশ বছর আগে যা দেখেছিলেন আজও তা তেমনিই আছে—কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি তার। শুধু সময় বদলেছে—বদলে গেছে মানুষ।

বদলে গেছে মানুষ। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজেই চমকে উঠলেন উস্তাদজী। বদলাবেই তো—উপায় নেই, রোধ করা যাবেনা তাকে। মেহেরা খাঁ নিজেই কি কম বদলেছেন? চল্লিশ বছর আগেকার একখানা ভুলে যাওয়া মুখ হঠাৎ আলো হয়ে উঠল মনের কালো অন্ধকারের ওপরে। আজকে কি ওই হারানো মানুষটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে আর?

বাইরের দৃষ্টিটা হঠাৎ ফিরে এল নিজের ভেতরে—সন্ধানী আলোর ঝলক ফেলে ফেলে কী যেন খুঁজতে লাগল সেখানে। একটা পোড়ো বাড়ির মতো অসংলগ্ন ধ্বংসস্তূপ—ভাঙ্গা খেলনার টুকরো যেন ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। নানা রং, নানা আকার। ছেলেমানুষি কৌতুক বোধ হয়, অকারণ কৌতুহলে কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে ওই ভাঙ্গা টুকরাগুলোকে, জোড়াতাড়া দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—

সন্ধানী আলোর অর্থহীন সন্ধান এক জাগায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, শিউরে উঠল আলোকবৃত্তটা। জীবনের সব কিছুই খেলনা নয়, সব কিছুই ভাঙ্গা খেলনার টুকরো নয়। ওই আলোকবৃত্তটার ভেতরে ছায়াবাজীর মতো কতগুলো বিশৃংখল ছবি ফুটে উঠেছে। উস্তাদজী চোখ বুঁজলেন। হ্যাঁ—চেনা যাচ্ছে বইকি। একটা শহর—মস্ত বড় শহর। তার নাম দিল্লী।

হাতীর মতো অতিকায় চেহারা, টুকটুকে রং—ফুলো মস্ত গাল দুটো থেকে যেন ফুটে পড়ছে রক্ত, লাল লাল চোখে নেশার জড়তা। উস্তাদ আল্লাবক্স। প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়ে আছেন পাহা-

ড়ের মতো। পাঁচটা হীরের আংটি পরা মোটা মোটা আঙুলে ফরাসের ওপরে তাল বাজিয়ে চলেছেন তিনি। হঠাৎ পাহাড়ের মতো অত বড় শরীরটাতে যেন ভূমিকম্পের দোলা লাগল, বিশাল পুরুষ পিঠ খাড়া করে উঠে বসলেন তাকিয়া ছেড়ে। তারপরে মস্ত বড় একখানা হাত সস্নেহে নেমে এল মেহেরা খাঁয়ের কাঁধের ওপরে। আল্লাবক্স বললেন, সাবাস বেটা, সাবাস! তোর জন্যে আজ আমার অহঙ্কার হচ্ছে। আল্লাবক্স খাঁ একদিন থাকবে না, কিন্তু সেদিনও লোকে নাম করে বলবে উস্তাদ মেহেরালী খাঁ তারই শিষ্য।

জীবনের সব চাইতে বড় পুরস্কার সেদিন পেয়েছিলেন মেহেরা খাঁ, চোখে তাঁর ছলছল করে উঠেছিল অশ্রু। আনন্দে, আবেগে যেন বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পাঁচ বছর বয়সে যে সাধনা সুরু করেছিলেন, আজ পঁচিশ বছর বয়সে তা সার্থক হল। তানপুরা ফেলে দিয়ে তিনি উস্তাদজীর পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়েছিলেন, হিন্দু শিষ্যদের মতো তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় মেখেছিলেন তিনি।

গুরু জয়পত্র দিলেন, করলেন আশীর্বাদ। সেদিন মন ভরে গিয়েছিল মেহেরা খাঁয়ের, বুক দুলে উঠেছিল গর্বের উল্লাসে। সামনে পড়ে আছে পৃথিবী। জয় করতে হবে তাকে, নিজেকে প্রমাণিত করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে 'সারে হিন্দুস্তানের' জ্ঞানী-গুণীর দরবারে। গুরু তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন, কেউ আগলে দাঁড়াতে পারবে না তাঁর জয়যাত্রার পথ! কিন্তু—

কিন্তু জীবনে কতবড় পরাজয় যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, সে কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন মেহেরা খাঁ?

হঠাৎ নড়ে চড়ে তিনি নিজেকে সজাগ করে নিলেন। যে স্রোত আর ফিরবে না, কী হবে তাঁর কথা ভেবে? ঠিক কথা, আধুনিক কাল। মনের অন্ধকারে খানিকটা ছায়াবাজীর মতো আকস্মিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা সেই দিল্লী শহর আবার ডুব দিয়েছে অবচেতনার গভীরতায়। যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা হারিয়ে গেছে, চিরদিনের মতোই হারাতে দাও তাকে। এ শহর দিল্লী নয়। বাংলা মুলুকের ছোট একটি গ্রাম—যার নাম নরোত্তমপুর। এখানে বাগবাগিচা নেই, নেই হীরামহল, মোতিমহল, চকবাজার

আর জনতা। এখানে শুধু উজ্জ্বল নীল আকাশ, এখানে দোয়েলের শিস, এখানে জলে ঝলমলে রোদ, এখানে সবুজ বনরেখার সুস্নিগ্ধ নিবিড়তা।

এই ভালো—এরই তো প্রয়োজন ছিল। কাল বদলাচ্ছে—বদলাক। মেহেরা খাঁয়েরও তো বদলাবার প্রয়োজন ছিল, নইলে কি তিনিই বাঁচতে পারতেন ?

সেতারটাকে এবারে কোলের ওপরে তুলে নিলেন তিনি। সযত্নে হাত বোলালেন তারগুলোর ওপরে, যেন পরিচর্যা করতে চাইলেন তাঁর নিভৃত সেই ব্যথার কেন্দ্রলোকটাকে। একে ব্যথা দেওয়া চলবে না, দুঃখ দেওয়া চলবে না একে। এই সেতার মেহেরা খাঁয়ের আশ্রয়, আশ্বাস। পৃথিবীর পথে এই তো তাঁর চিরদিনের সহযাত্রী। তাই সেদিনের সে পরম ব্যথার মুহূর্তেও—

ওস্তাদজী চকিতে সংযত করে নিলেন নিজেকে। বেওকুফ—বেতমিজ মন! একটুখানি ফাঁক পেলেই নিষেধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চায়, সামলানো যায় না! দ্রুত আঙ্গুলে সেতারে ঝঙ্কার দিলেন মেহেরা খাঁ। তারপর গুন গুন করে ধরলেন 'রুইদাসের' পদ ঃ

"নিত প্রভাত ভব তিঁবির ছুটে
অন্তর তিঁবির ছুটত নাহি।
সত্যরূপ প্রেমরূপ রবি
প্রভু, পৈঠহুঁ অন্তর মাহি—"

আধুনিক কালের মানুষ শঙ্কর। বাঁশি বাজায়, বাজায় বিলিতী বাজনা গীটার। কিন্তু এ বাজনার পাঠ সে নেয়নি উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের কাছ থেকে। ছেলেবেলায় কিছুদিন উস্তাদজী তাকে সেতার শিখিয়েছিলেন, তার পরেই সে চলে গেল কলকাতায়। তার শিক্ষা কলকাতাতেই।

কলকাতা। নতুন দিনের নতুন শহর। পুরোনো কালের দিল্লী-আগ্রার মতো বনেদীয়ানা তার নেই ; সোনা রূপোর জরি দিয়ে কাজ করা সেকেলে জাব্বাজোব্বা নেই, তার মাথায় নেই হীরেমুক্তো 'অপহৃত ছিন্নবিচ্ছিন্ন নবাবী তাজ।' তার আমদরবার, দেওয়ান-ই-খাস আর শীশমহলে ঝঙ্কৃত হয় না মিঞাকি মল্লার আর বিলাসখানী টোড়ীর করুণ অনুরণন। তার

আকাশ বাতাসে শোনা যায়না স্বপ্ন-গভীর অতীতের পদসঞ্চার। কলকাতা নতুন, কলকাতা আধুনিক। তার আকাশছোঁয়া লোহায় গাঁথা উদ্ধত নিরলঙ্কার বাড়িগুলোর সঙ্গে কোনো মিল নেই বিস্মৃত দিনের শিল্পীদের কারুকৃতার্থ দেওয়ান-ই-খাস আর চামেলী মহলের। তার নিরাভরণ বিশালতায় আলাপ আর বিস্তারের অলস ধ্যানগভীর ব্যাপ্তি নেই কোনোখানে, সেখানে সংক্ষিপ্ত আধুনিকতা, বাহুল্যহীন অগভীর আধুনিক গান।

তাই শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী যে দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিলেন উস্তাদ মেহেরা খাঁকে, শঙ্কর তা করে না! নবাবী আমলের পুরোনো জাব্বাজোব্বার আতিশয্য কৌতূহল জাগায় কিন্তু আকৃষ্ট করে না শঙ্করকে। মনের দিক দিয়ে এক ধরনের করুণাই আছে তার উস্তাদজী সম্পর্কে। তাই রাগিণী সুরু করবার আগে দেড় ঘণ্টা ধরে তার আলাপ বিলাপের পর্ব খানিকটা অসহ্য প্রলাপের মতো মনে হয় শঙ্করের, মাথা কেমন ঘুরতে থাকে, বোঁ বোঁ করে একটা অস্বস্তিকর শব্দ বাজতে থাকে কানের ভেতরে। তবু ভদ্রতার খাতিরে বসে বসে ওই উৎকট ম্যাও ম্যাও আর 'মারি ঘং' শুনতে হয় তাকে, তারপর বিনীত হাসিতে বলতে হয়, হাঁ উস্তাদজী, গান তো একেই বলে! আজকালকার গান কি আর গান!

উস্তাদজী খুশি হন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। তবে সান্ত্বনা এই যে, সে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে আজকাল, আবছা আর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই শঙ্করের মুখে চোখে অলক্ষ্য প্রায় কৌতুকের ইঙ্গিতটা দেখতে পান না তিনি। সংশয় আর আবেগের মধ্যকেন্দ্রে দুলতে থাকে উস্তাদজীর মন। তানপুরায় একটা মৃদু আঘাত দিয়ে বলেন, আচ্ছা, তবে তোমাকে তুলসীদাসী ভজন শোনাই একখানা।

শঙ্কর আতঙ্কিত হয়ে উঠে। উস্তাদজীকে সে চেনে বিলক্ষণ। তাঁর ভজন আধুনিক ভজন নয়, আলাপ, বিস্তার এবং হা হা করে গিটকিরির সে ভজনের সঙ্গে ধ্রুপদের বিশেষ পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না শঙ্করের। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে বলে, এখন ভজন থাক উস্তাদজী, ভীমপলাশীর পরে ভজন তেমন জমবে না।

পালাবার ছুতোটা বুঝতে কষ্ট হয় না মেহেরা খাঁয়ের। একটা নিশ্বাস চেপে নিয়ে তানপুরাটা সরিয়ে রাখেন তিনি।

বাপের গুরুদেবকে চটানো চলবে না, অন্তত যতটা সম্ভব লোক দেখানো শ্রদ্ধাটাও করতে হয় তাকে। কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করে শঙ্কর। 'আবোল তাবোল' উদ্ধৃত করে বলে "গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা"—মাঝে মাঝে ক্ষীণ প্রতিবাদ করে শঙ্করের স্ত্রী রমা।

—ওঁকে এভাবে ঠাট্টা করা উচিত নয় তোমার। কতবড় ওস্তাদ উনি, বাবা কত শ্রদ্ধা করতেন ওঁকে। সাধনা করে উনি শিখেছেন, তোমাদের মতো ফাঁকির কারবার ওঁর নয়।

তর্ক করবার উৎসাহে পান্‌জাবীর আস্তিনটা গুটিয়ে নেয় শঙ্কর ঃ ওস্তাদ উনি নিশ্চয়, কিন্তু উনি যা করেন তা জিম্‌নাস্টিক, তাকে গান বলে না।

রমা প্রশ্ন করে ঃ তা হলে তুমি গান বলো কাকে ?

—আমি তাকেই গান বলি যা কথা আর সুরের সমাবেশে অধিকার করে মনকে, দুলিয়ে দেয় প্রাণ। জানো এ সম্বন্ধে কী বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কি লিখেছেন দিলীপ রায় ?

রমা জানে না। এবং জানে না বলেই সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে, তবে কী ওঁর গান গানই নয় ?

শঙ্কর হাসে ঃ একটা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, আর একটা রবীন্দ্রনাথের কাব্য।

—তার মানে ?

—মানেটা অত্যন্ত পরিষ্কার। উনি গান শেখেননি, শিখেছেন গানের ব্যাকরণ। সেও অবশ্যি সেকালের ব্যাকরণ, কিন্তু সে কথা থাক। আসল ব্যাপারটা কি জানো ? ব্যাকরণ পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, বাহাদুরী পাওয়া যায়, কিন্তু কাব্য রচনা করা যায় না। ওর জন্যে চাই আলাদা কবি প্রতিভা, আলাদা একটা রসিক মন। সে মন ওঁর নেই।

রমা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, বলে, ও। কিন্তু এই যে তোমাদের সব একঘেয়ে গান ? চাঁদ, রজনীগন্ধা, বিরহের বালুচর, উদাসী পথিকের আকুল বাঁশির ডাক, আমি ভালবাসা ভিখারী, প্রেমের চকোর—এগুলো বুঝি সব উঁচু দরের কবিতা ?

মেয়েমানুষের বেশি তর্ক করাটা শঙ্করের পছন্দ হয় না, অন্তত এদিক থেকে চৌধুরী বংশের ঐতিহ্যটাকে কিছু পরিমাণে বজায় রেখেছে শঙ্কর। বিরক্ত হয়ে বলে, যা বোঝোনো, তা নিয়ে কেন বাজে তর্কে আসো বলতো ?

—তর্ক করতে যাবো কেন? ওস্তাদজীকে তোমরা অসম্মান করো, এইটেই আমার ভালো লাগে না।

শঙ্করের গলার স্বর রূঢ় হয়ে ওঠে এবারে ঃ অসম্মান ওঁকে কে করেছে? এ হল সমালোচনা। আর সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে।

—কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করাকে কি সমালোচনা বলে?

শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়েই রমা বুঝতে পারে বজ্র-বিদ্যুৎ আসন্ন হয়ে এসেছে। সুতরাং ঝড়ের জন্যে আর অপেক্ষা না করে বুদ্ধিমতীর মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় রমা। পেছন থেকে সাপের গর্জনের মতো শঙ্করের চাপা স্বর শুনতে পাওয়া যায় ঃ 'ইডিয়ট!'

ইডিয়ট বলুক শঙ্কর, যা মুখে আসে, যা খুশি তাই বলুক। কিন্তু মনের দিক থেকে গভীর আর নিবিড়ভাবে উস্তাদজীকে শ্রদ্ধা করে রমা, ওঁর সম্বন্ধে একধরনের সস্নেহ দুর্বলতা আছে তার। তাছাড়া পুরুষ বলে যে জিনিসটা এড়িয়ে গেছে শঙ্করের চোখ, ঠিক সেইটেই ধরা পড়ে গেছে রমার দৃষ্টিতে। তার সন্দেহ হয় কোথায় গভীর একটা বেদনার জায়গা আছে উস্তাদজীর—কোথায় একটা—

মনে পড়ে তার বিয়ের সময়ের কথা। মস্ত আসর বসেছিল এ বাড়িতে, বহু জ্ঞানী-গুণীকে কলকাতা থেকে আমদানী করেছিল শঙ্কর। ঝকঝকে আধুনিকের দল, মধুক্ষরা কণ্ঠ, কাব্যসঙ্গীতের চটুল উচ্ছল মায়া বিস্তীর্ণ করে দিয়েছিল তারা। আর সেই নতুনদের মাঝখানে কী বিচিত্র দেখাচ্ছিল উস্তাদজীকে, মনে হচ্ছিল কী অদ্ভুতরকম বেমানান। পাকা চুল, পাকা দাড়ি, ময়লা পাজামা, অতিরিক্ত দীর্ঘ দেহ বলে একটু কোলকুঁজো, মিটমিটে চোখের দৃষ্টি। মাথা নিচু করে গান শুনছিলেন। হঠাৎ শঙ্কর বললে, উস্তাদজী এবারে আপনি আমাদের কিছু গান শোনান।

যেন চমকে উঠলেন উস্তাদজী, যেন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল তাঁর। কেমন ভারী ভারী জড়তাভরা গলায় উস্তাদজী বলেছিলেন, আমি?

—আপনি না গাইলে কি আসর হয়?—তানপুরাটা ঠেলে শঙ্কর এগিয়ে দিয়েছিল উস্তাদজীর দিকে।

অনাসক্তভাবে তানপুরা তুলে নিলেন তিনি, তারপর গান সুরু করলেন। গান তিনি কী গেয়েছিলেন বা কেমন গেয়েছিলেন তা বোঝবার ক্ষমতা সেদিন ছিল না রমার। তবে ঘোমটার আড়াল থেকে সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখেছিল তাঁর ঘন ঘন মাথা নাড়া—আর অবাক হয়ে ভেবেছিল কী অসাধারণ গলার জোর! খানিক পরেই আধুনিকদের মুখে ফুটে উঠেছিল চাপা বাঁকা হাসি, পান চিবুতে চিবুতে একে একে তারা বেরিয়ে গিয়েছিল প্রায় সকলেই। আর তবলচী কয়েক মিনিট পরে সেই যে হাত তুলল, আর বাজায়নি। শুধু নির্নিমেষ চোখে অভিভূত হয়ে তাকিয়েছিল উস্তাদজীর মুখের দিকে।

কিন্তু কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই উস্তাদজীর। কে গেল, কে রইল কোনো কিছু তিনি লক্ষ্য করলেন না, নিজের মনেই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা তিনি গান করে গেলেন। গান যখন শেষ হল, তখন তবলচী এগিয়ে এসে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়েছিল। বিহ্বলভাবে বলেছিল, আপনি এখানে কেন পড়ে আছেন? কলকাতায় চলুন।

উস্তাদজী শুধু মৃদু হেসেছিলেন, উত্তর দেননি।

তবলচী বলেছিল, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার মুখে একখানা টোড়ী শুনতে চাই।

—টোড়ী!—শান্ত ঘুমন্তপ্রায় উস্তাদজী হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন একটা, বলেছিলেন, না, না, টোড়ী নয় টোড়ী নয়!—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যেন ভয় পেয়েছেন তিনি, যেন পালিয়ে যাচ্ছেন।

তবলচী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল—কী আশ্চর্য, এমন একটা রত্ন এই অন্ধকারে পড়ে আছে!

আর ঘোমটার আড়ালে সেই মুহূর্তে রমা একটা কিছু অনুমান করেছিল। যত দিন যাচ্ছে ততই নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস হচ্ছে সে অনুমানটা বোধ করি মিথ্যে নয়। আর সেই থেকেই উস্তাদজী সম্বন্ধে একটা মৃদু সহানুভূতিতে ভরে আছে রমার মন।

দেউড়ির পাশে ছোট একখানি ঘর। আজ পনেরো বছর আগে এই ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি, সেই থেকে আজ পর্যন্ত আর নড়ে বসবার দরকার

হয়নি। অল্প প্রয়োজন, আয়োজন আরো অল্প। একটি ছোট খাট, ছোট বিছানা, টুকিটাকি দু'চারটি জিনিসপত্র। একটি সেতার, তানপুরা। স্তব্ধ শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটি।

কোলের ওপর সেতারটা টেনে নিয়ে টুং টাং করছিলেন উস্তাদজী। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ছায়া ঘনাচ্ছে ঘরের ভেতরে। আলো জ্বালাননি মেহেরা খাঁ, এক একটি সন্ধ্যায় আলো জ্বালাতে ভালো লাগে না তাঁর। অন্ধকারের আড়ালে সমস্ত মনটা যেন কেন্দ্রগামী হওয়ার সুযোগ পায়, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ ঘটে। উস্তাদজী অনুভব করেন, সেতারের প্রতিটি ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মনের গভীরে মণিপদ্ম একটির পর একটি দল মেলেছে তার, আর তাদের ওপর ফুটে উঠেছে একটির পর একটি বিদ্যুৎদীপ্ত রাগ-রাগিণীর মূর্তি, বাজছে কেদারা, ভীমপলশ্রী, সোহিনী, ছায়ানট, নটমল্লার, টোড়ী—

টোড়ী! উস্তাদজীর চমক লাগে। বীণাবাদিনী একটি নারীমূর্তি, তার কণ্ঠ থেকে বিরহের করুণ সঙ্গীত ঝরে পড়ছে আকাশ বাতাস বন-বনান্তকে আচ্ছন্ন বিবশ করে দিয়ে। তার সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছে একটি বনের হরিণী, তারও নীলিম আয়ত চোখ ছলছল করছে অশ্রুতে।

এই তো টোড়ী রাগিণীর রূপ। কিন্তু শুধুই কি রাগিণীর রূপ? শহর দিল্লী নয়—ছায়াবাজীর মতো আর একটা শহরের ছবি মনের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে—যার সামনে নীল সমুদ্রের দোলা চলেছে অশ্রান্ত আনন্দে। তার নাম 'বুম্বই'—লোকে বলে বোম্বাই। খোলা জানালা দিয়ে সেদিনও তো তেমনি চোখে পড়ছিল ওই নীল সমুদ্রের চঞ্চলতা, চাঁপাফুলের মতো ললিত অঙ্গুলি-বিন্যাসে যে "মিঞাকি টোড়ী" বাজিয়ে চলেছিল, তারও চোখে ছিল সমুদ্রের অতলান্ত অশ্রুর ইঙ্গিত; তার নাম—

তার নাম আশিক বাঈ।

কিন্তু ঝুটা, সব মিথ্যে। মিথ্যে আশিক বাঈ, মিথ্যে তার প্রেম। টোরী রাগিণী শুধু কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। যে ভালোবাসে, সে কি ঠকায় কখনো? 'ই দেওয়ানা দুনিয়ামে সব কুছ হ্যায় ঝুটা'—

ঘরের মধ্যে অন্ধকার আরো গভীর হয়ে আসছে। তবু তারই ভেতরে আচমকা উস্তাদজীর মনে হল দরজার কাছে কার যেন ছায়া পড়েছে।

—কে, ওখানে?

মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, আমি উস্তাদজী।

—ওঃ! কিন্তু এভাবে না এলেই ভালো করতি বেটি।

—এ ছাড়া যে উপায় নেই উস্তাদজী।

—কিন্তু বেটি, এ লুকোচুরি বড় খারাপ। এ অন্যায়।

—কিছু অন্যায় নয়। আমি আলোটা জ্বালি।

কেটে যাচ্ছিল অভ্যস্ত দিন। শঙ্কর বাজাচ্ছিল বাঁশি আর গীটার—উস্তাদ মেহেরা খাঁ নিমগ্ন হয়ে ছিলেন তাঁর তানপুরা আর সেতারে। বয়স বাড়ছিল উস্তাদজীর, ক্ষীণ হয়ে আসছিল চোখের দৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে বিস্মরণগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল মনের নেপথ্যলোকে। আজ বিশ বছর আগে উস্তাদ আল্লাবক্স মারা গেছেন, কিন্তু গভীর রাত্রিতে মালকোষ বাজাতে বাজাতে রোমাঞ্চিত মেহেরা খাঁ স্পষ্ট অনুভব করতেন যেন বিশালকায় পুরুষ তাঁর পাশে এসে বসেছেন। গোলাপী রংয়ের ফুলো ফুলো গাল, মেহেদী রঙ্গানো পাকা দাড়ি, দুচোখ নেশায় আরক্ত। সস্নেহে একখানা অশরীরী হাত তিনি রেখেছেন মেহেরা খাঁর কাঁধের ওপরে, জড়িত স্বরে বলছেন, সাবাস বেটা, তোর জন্যে আমার অহঙ্কার হচ্ছে।

"যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি।" যে দিন চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। স্রোতের মুখে যে সময় ভেসে চলে গেল, উজানের ধারায় জীবনে তার প্রত্যাবর্তন হবে না কোনদিন। নাই বা হল, ক্ষতি কী তাতে। দিন বদলাচ্ছে বদলাক, কাল বদলাচ্ছে—তাকে বদলাতে দাও। আজ দাদুর ওই পংক্তিটার একটা নতুন অর্থ যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। যা গেছে তার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই। লাভ নেই অকারণ বেদনায় নিজেকে আহত আর পীড়িত করে!

আশ্চর্য, সেই শহর বোম্বাইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে তেমন করে আর যন্ত্রণায় সমস্ত মনটা আর্তনাদ করে ওঠে না। সেই নীল সমুদ্রের দোলায় আর দুলে ওঠে না অতলান্ত অশ্রুর আভাস। মানুষ বদলায়—আশিক বাঈও বদলে গিয়েছিল—প্রেমের প্রতিদান দিতে সে রাজী হয়নি, দেওয়ানা হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু আজ—এই এতদিন পরে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছেন উস্তাদজী। টোড়ী রাগিণী মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় ভালোবাসা আর বিরহের অশ্রু। এক আশিক বাঈ যদি হারিয়ে গিয়ে

থাকে, হাজার জনের চোখে তার প্রেম সত্য হয়ে রইল। সে প্রেমে উস্তাদজীর হয়তো অধিকার নেই, কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবনে তা তো সার্থক হয়ে উঠবে। একজনের বিরহ-অশ্রু যদি সত্য নাই হয়, তবু আরো হাজার হাজার ভাগ্যবানের জীবনে টোড়ী রাগিণী চিরন্তন হয়ে রইল।

আশিক বাঈকে পান্‌নি উস্তাদজী, কিন্তু আর একজনকে পেয়েছেন। কন্যার মতো নিবিড় স্নেহ দিয়ে তাকে প্রাণ খুলে শেখাচ্ছেন মেহেরা খাঁ, সমস্ত সম্বল দিতে চাইছেন উজাড় করে। যাকে দিতে চেয়েছিলেন সে নিতে পারল না। চোখের সামনে পৃথিবীর আলো যখন দিনের পর দিন নিভে আসছে তখন গভীর ব্যথার সঙ্গে এক কথাই বারে বারে মনে হত—তাঁর এতবড় সুরের ঐশ্বর্যকে কৃপণের সম্পদের মতোই আগলে গেলেন তিনি, কারো কোনো কাজে লাগল না। কিন্তু আজ সে অতৃপ্তি কেটে গেছে। পিয়ারীকে যা দিতে পারেননি, বেটিকেই তা দিয়ে যাবেন।

কদিন থেকে ভারি প্রসন্ন আছে উস্তাদজীর মন। আর ক্ষোভ নেই, বেদনা নেই আর। এতদিন ধরে যেন একটা বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন তিনি, দেবার মানুষ ছিল না। শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী কিছু নিয়েছিলেন, শঙ্কর একেবারেই নিতে পারল না। কিন্তু এমন আশ্চর্যভাবে আর একজন এসে হাত পেতে দাঁড়াবে একি কল্পনাতেও ছিল উস্তাদজীর?

সকালে ঝিলিমিলি রোদ উঠেছে। ঝিলমিল করছে খালের জল। সবুজ অরণ্যে শিস্‌ দিচ্ছে দোয়েল, বসে বসে সেতারের কানে মোচড় দিচ্ছিলেন তিনি।

সকাল বেলাতেই এখানকার পোষ্ট অফিসে ডাক আসে। শঙ্কর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় খবরের কাগজের সন্ধানে। আজও সে কাগজ পড়তে পড়তে ফিরছিল।

উস্তাদজী ডাকলেন, শঙ্কর?

শঙ্কর মুখ তুলল। সে মুখে যেন মেঘের রং। দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কার ভারে থমথম করছে। কিন্তু বয়েস বেড়েছে, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে উস্তাদজীর। শঙ্করের মুখের চেহারা তিনি ভালো করে দেখতে পেলেন না।

উস্তাদজী আবার ডাকলেন, একটা ভৈরো শুনবে শঙ্কর?

—এখন নয় উস্তাদজী, অনেক কাজ—শঙ্কর যেন তাঁকে এড়িয়েই বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

শুধু শঙ্করের মুখেই মেঘের রং ধরেনি—ঝোড়ো মেঘের কালো রং ধরেছে দেশের আকাশেও। কলকাতায় কিছুদিন ধরেই সর্বনাশা দাঙ্গা শুরু হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের। প্রাসাদপুরী কলকাতা, আধুনিক কলকাতা রূপান্তরিত হয়েছে সুন্দর বনে। তার পথে পথে এখন হিংস্র জানোয়ারের ক্ষুধিত পদ-সঞ্চার।

এ খবর উস্তাদজী রাখেন না, এ সমস্ত তাঁর সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের বাইরে। নিজের ছোট ঘরটি—নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন, তাঁর সেতার আর তানপুরা, স্বপ্নের গভীরে শহর বুখই আর শহর দিল্লী। এতদিন এ খবর তাঁকে কেউ দেয়নি, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেই যেন সজাগ ছিল না কেউ। কিন্তু আপাতত তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠবার সুযোগ ঘটেছে।

কাগজ নিয়ে পোষ্ট অফিস থেকে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে শঙ্কর, এমন সময় চারপাঁচটি ছেলে এসে ঘিরে দাঁড়াল তার চারদিকে।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে শঙ্করদা।

—আমার সঙ্গে?

—হাঁ, খুব জরুরী কথা।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

—ব্যাপারটা কিহে?

চাপা গলায় একজন বললে, এখানেও লাগবে।

—সে কী!—শঙ্করের শরীরের ভেতর দিয়ে চমকে গেল একটা শীতল শিহরণ: কী লাগবে?

—দাঙ্গা।

—বলো কী! শঙ্কর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—ঠিকই বলেছি।—বিশ্বস্ত স্বরে ওদেরই আরেকজন বলে গেল, বাইরে থেকে বিস্তর লোকজন এসেছে আশে পাশে। খাল্‌পারের মসজেদে রোজ ওদের গোপন জমায়েৎ হচ্ছে। গভীর রাত্রে মশাল জেলে লাঠি খেলছে সব। কাল দেখেছি নুরু মিয়ার বাঁশ ঝাড় থেকে লাঠি কাটছে।

—শুধু কি তাই?—আর একজন বললে, রাম জেলের কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। বলছে চাঁদা না দিলে ঘরবাড়ি লুটপাট করে নেবে। বিবর্ণ মুখে শঙ্কর বললে, তবে আর কি হবে। তোমরাও তৈরী হয়ে যাও।

তৈরী আমরা আছিই। কত ধানে কত চাল বেরোয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারব। কিন্তু আপনাকে একটু সাবধান থাকতে হবে শঙ্করদা, বিভীষণ রয়েছে আপনার বাড়ীতে।

—আমার বাড়ীতে! আকাশ থেকে পড়ল শঙ্কর ঃ সে আবার কী!

—ওই ওস্তাদজী!

—ওস্তাদজী! শঙ্কর এবারে হো হো করে হেসে উঠল ঃ মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমাদের। আজ পনের বছর ধরে এ বাড়ীতে উনি আছেন—আমাদের একেবারে আপনার জন।

—ও কেউটে সাপের জাত শঙ্করদা। সব সমান। কলকাতায় কী হল জানেন না?

শঙ্কর তবু হাসছিল ঃ উনি গুরুজন, বাবার গুরু। ওঁর সম্বন্ধে এসব কথা ভাবলেও পাপ হয়।

ছেলেরা চটে উঠল ঃ আপনার পাপ পুণ্য নিয়ে তবে আপনি থাকুন। আমাদের কাজ আমরা করলাম, সাবধান করে দিলাম আপনাকে। পরে যদি কিছু একটা হয় আমাদের দোষ দিতে পারবেন না।

হাসিমুখেই শঙ্কর কথাটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে হাসিটা তার শুকিয়ে আসতে লাগল। দিনের পর দিন একই কথা, একই আলোচনা। চারদিকে একটা নিঃশব্দ অনিবার্য প্রস্তুতি যে চলেছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিজের চোখেই শঙ্কর দেখছে খালপারের মস্‌জেদে গভীর রাত্রে মশালের আলো – লাঠির ঠকাঠক শব্দ, দূরে কাছে নানা জায়গা থেকে টুকটাক খবর আসছে সব সময়ে। আর চোখ বুঁজে থাকা চলে না।

এতদিন একটা নতুন সত্য আবিষ্কৃত হল শঙ্করের কাছে, খুলে গেল একটা নতুন দিক। উস্তাদজীর সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে একটি মাত্র পরিচয় মনের

মধ্যে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল ঃ উস্তাদজী গুণী নন, উস্তাদজী আর কিছু নন, তিনি মুসলমান। এবং ফলে তাঁকে বিশ্বাস করা চলে না।

আজকাল তাই শঙ্কর একটা বিচিত্র নতুন চোখে তাকায় উস্তাদজীর দিকে। সে চোখে শ্রদ্ধা নেই, নবাবী আমলের আতিশয্যের প্রতি সকৌতুক কৌতূহল নেই কোথাও। আছে সন্দেহ, আর আছে বিশ্লেষণ।

কিন্তু উস্তাদজীর দৃষ্টি নিষ্প্রভ, তিনি বুঝতে পারেন না। একটা ছেলেমানুষী খুশির অকারণ জোয়ার এসেছে তাঁর ভেতরে, কেটে যাচ্ছে সেই ধ্যানপ্রশান্ত নির্লিপ্ততা। ডাক দিয়ে বলেন, আও বেটা, তোমাকে একখানা জৌনপুরী শুনাই।

শঙ্কর সংক্ষেপে জবাব দেয়, কখনো জবাব দেয় না। নিজের আনন্দে উস্তাদজী একটার পর একটা রাগিণী বাজিয়ে চলেন, যেন বিস্মৃত যৌবন ফিরে এসেছে ত^ঁার। আর কালো মুখ করে শঙ্কর চলে যায় বাড়ির ভেতরে, উস্তাদজীর এই খুশী, এই আনন্দ তাকে আরো বেশী সন্দিগ্ধ করে তোলে।

রমা একদিন জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কী? দিনরাত এত সব কী ভাবো?

ইতস্তত করে শঙ্কর বলে ফেলল।

প্রথম কথাটা শুনে শঙ্কর যেভাবে হেসে উঠেছিল, ঠিক তেমনি করে হেসে ফেলল রমা, বললে, তোমার মাথা খারাপ। এমন অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করলে কেমন করে?

যে জিনিসটা মনের দিক থেকে অবিশ্বাস করতে পারলেই বেঁচে যেতো শঙ্কর, ঠিক সেই কথাটা রমার মুখে শোনা মাত্র একটা ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল তার ভেতরে। ঝন্ঝনিয়ে উঠল চৌধুরী বংশের আভিজাত্য—প্রতিবাদ-অসহিষ্ণুতা, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের প্রতিবাদ।

মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল শঙ্করের, বিতৃষ্ণ-বিকট হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর ঃ তুমি চুপ করো।

—চুপ করব? কেন? তুমি কি পাগল?

—যা জানোনা তা নিয়ে তর্ক করতে এসোনা। বিশ্বাস আছে ওদের? হয়তো এসে ঘুমের মধ্যে ঘ্যাঁচ করে ছোরা বসিয়ে দেবে।

—কিন্তু—

—আর বাজে বোকোনা—নিজের কাজে যাও—

কথাটা বলে দুম দুম করে শঙ্কর নিজেই সরে গেল, আর পাংশু বিশীর্ণ মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমা।

একটা পাশার আড্ডা আছে গ্রামে। সন্ধ্যার দিকে শঙ্কর রোজ যায় সেখানে, ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা বাজে। আপাতত পাশা খেলা বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে লাঠি খেলা শেখানো হচ্ছে।

পাশার ভেতরে তবু নিজেকে ভুলে থাকবার একটা উপায় ছিল, কিন্তু সে পথ এখন বন্ধ। আর ভালো লাগে না, সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। ঘরশত্রু বিভীষণের আশঙ্কাটা একটা ক্ষয় রোগের মতো দিনের পর দিন যেন কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। রাত্রে ঘুম আসে না, উত্তেজনায় আর অস্বস্তিতে যেন তার শিরাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তে থাকে। কিছু একটা করা দরকার, উস্তাদজী সম্পর্কে কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কী করা সম্ভব?

বিদায় করে দেবে বাড়ি থেকে? না, সেও অসম্ভব। পনেরো বছর আগে যে গৌরবে মেহেরা খাঁ এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আজ তাঁকে সেই গৌরব থেকে অপসারিত করা অসাধ্য শঙ্করের পক্ষে। শ্রদ্ধা না করুক—ভয় করে তাঁকে, তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে অত্যন্ত ছোট মনে হয় নিজেকে! তাঁর সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা কিছু তাঁকে বলবে এতবড় স্পর্ধা নেই তার।

ভারি ক্লান্তি লাগছে, অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যাচ্ছে শরীর, পুড়ে যাচ্ছে মন। আজ তাই অসময়ে, সন্ধ্যার পরেই বাড়ির দিকে ফিরছিল শঙ্কর।

কিন্তু দেউড়ির কাছাকাছি আসতেই উৎকর্ণ একটা কুকুরের মতো থমকে দাঁড়ালো শঙ্কর—যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় তার আসন্ন কিছু একটার সংকেত পেয়েছে। উস্তাদজীর ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু সেখানে কারা ফিসফিস করে কথা বলছে না? হ্যাঁ—ঠিক, কোনো ভুল নেই।

শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন পাথর হয়ে গেল, বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল হৃৎপিণ্ড, চোখে মুখে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল রক্তের কণা। আর ভুল নেই।

এগিয়ে এসে শঙ্কর কঠিনভাবে ঘা দিলে দরজায় ঃ উস্তাদজী, উস্তাদজী !

এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপরেই ঘরের ভেতরে টের পাওয়া গেল একটা অস্পষ্ট চঞ্চলতার শব্দ। আর তখনি পেছন দিকের দরজা খুলে কে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল।

শঙ্কর ঘুরে তাকে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই সে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হিংস্র বাঘের মতো মুখ করে উস্তাদজীর ঘরে ঢুকল শঙ্কর।

ঘরে আলো জ্বলছে। বিছানার ওপরে বসে আছেন উস্তাদজী। তাঁর চোখে মুখে শঙ্কার ছাপ। কোলের ওপর পড়ে আছে সেতারটা।

শঙ্কর কঠোর স্বরে বললে, ঘরে কে এসেছিল উস্তাদজী ?

উস্তাদজীর ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠল।

—কে এসেছিল ?

—আমি বলতে পারব না।

ঘৃণায় আর ক্রোধে কুটিল হয়ে উঠল শঙ্করের মুখ ঃ আমি জানতে চাই।

আবহাওয়াটা লঘু করবার চেষ্টা করলেন উস্তাদজী, ম্লানভাবে হাসলেন একটুখানি ঃ তোমার বাপকে আমি হুকুম করতাম আর তুমি কিনা আমাকে হুকুম করতে চাও ?

বীভৎস গলায় শঙ্কর বললে, চালাকি চলবে না। বলতে হবে আপনাকে।

উস্তাদজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমি সত্যবদ্ধ—বলতে পারব না। আর তা ছাড়া সে জেনেও তোমার কোনো দরকার নেই। নিজের কাজে যাও বেটা।

শঙ্কর বললে, বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। দুধ দিয়ে বাবা কাল সাপ পুষেছিলেন। আমার ঘরে বসে আপনি আমারই সর্বনাশ করতে চাইছেন।

তীরের মতো সোজা হয়ে উস্তাদজী দাঁড়িয়ে উঠলেন ঃ বেওকুফ, বেতমিজ, কী বলছ তুমি !

—বলছি আপনি বেইমান। আমার বাড়িতে বেইমানের জায়গা নেই।

বেইমান ! উস্তাদজীর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন সরে গেল, সাদা হয়ে গেল কাগজের টুকরোর মতো। সিংহের মতো চীৎকার করে উঠলেন তিনি ঃ চোপরাও বেতমিজ।

শঙ্কর পাথরের মতো শক্ত স্বরে বললে, 'আমি চুপ করব, কিন্তু আজই আপনাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে উস্তাদজী।'

ক্রোধে অপমানে উস্তাদজী থর থর করে কাঁপতে লাগলেন ঃ তুমি, তুমি আমাকে এমন কথা বললে!

শঙ্কর বললে, বললাম। আপনি বিশ্বাসঘাতক, আপনি বেইমান!

উস্তাদজী বসে পড়লেন। একটা কথা বললেন না, চাইলেন না একটা কৈফিয়ৎ। তার পরের দিন সকালে আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। চল্লিশ বছর আগে আশিক বাঈ যাঁকে দেওয়ানা করে দিয়েছিল, চল্লিশ বছর পরে আবার তিনি 'ই দেওয়ানা দুনিয়ামে' বেরিয়ে পড়লেন বার্ধক্য-শিথিল, ক্লান্ত পদক্ষেপে।

কিন্তু দিওয়ানা হতে চাইলেই কি হওয়া যায়? এতদিন পরে কখন যে নিবিড় হয়ে মনের ভেতরে ফাঁস পড়ে গেছে উস্তাদ মেহেরা খাঁ তা কি ভাবতেও পেরেছিলেন? যাকে তিনি ভেবেছিলেন বুম্বইয়ের নীল সমুদ্র চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তা আবার এমনভাবে ফিরে এল কী করে?

'যো দিন যাওয়ি বাহুড়ি সো আওয়ি।'

যেদিন যায় সে আবার ফিরে আসে। আবার নতুন করে মনের কাছে ফিরে এসেছে আশিক বাঈ। সব রাগ-রাগিণার পাঠ তাকে দিতে চেয়েছিলেন, শুধু দিতে পারেন নি টোড়ী। ব্যথা ছিল, বেদনা ছিল, ছিল নিজের ভেতরে নিভৃত দুঃখ-সম্ভোগের মোহ। কিন্তু আর সে মোহ নেই, সে দুঃখের অবসান হয়ে গেছে। যাকে তিনি সব ধরে দিলেন, আজ তাকে তাঁর শেষ অর্ঘ, তাঁর টোড়ী তুলে না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই দেওয়ানা ফকিরের।

বৃষ্টি পড়ছে দাঙ্গা-কলঙ্কিত কলকাতায়—নেমেছে শোকের মতো শ্রাবণের রাত্রি। তানপুরা কাঁধে পথে পথে ঘুরছেন উস্তাদজী। পা টলছে, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তিনদিন খাওয়া হয় নি। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, ক্লান্তিতে শরীর মন লুটিয়ে পড়ছে তাঁর। এ নরোত্তমপুর নয়, নবাবী আমলের বাগ-বাগিচা আমদরবারের শহর দিল্লী নয়। এ কলকাতা—আধুনিক, উদ্ধত। এখানে উস্তাদজী কোথায় খুঁজে পাবেন তাঁর আশিক বাঈকে—কেমন করে তার হাতে তুলে দেবেন তাঁর শেষ অর্ঘ।

নির্জন পথ—অন্ধকার। হঠাৎ দুদিক থেকে দুজন গুণ্ডা চেহারার লোক এসে তার হাত ধরল।

—এই মিঞা সাহেব, যাবে কোথায় ?

অদ্ভুত আবিষ্ট চোখে উস্তাদজী তাকালেন।

—বলতে পারো ভাই, এখানে শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ি কোথায় ?

—শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ি ?—লোকদুটো হিংস্র জন্তুর মতো হেসে উঠল শব্দ করেঃ খুব কাছেই! পাশের এই অন্ধকার কানা গলিটার ভেতরে। সদর রাস্তাতেই পৌঁছে দিতে পারতাম, কিন্তু কানা গলিই সুবিধে—শর্ট-কাট্। চলে এসো।

নির্জন পথ। শ্রাবণের অশ্রুধারার মতো অশ্রান্ত বৃষ্টি। উস্তাদ মেহেরা খাঁর শেষ অর্ঘ আর পৌঁছুল না কিন্তু বেশিদিন লুকোচুরি তো চলবে না শঙ্করের কাছে। একদিন বুঝতে পারবে শঙ্কর—একদিন জানতে পারবে টোড়ী রাগিণীর পাঠ শেষ না করেও কত ভালো সেতার শিখেছে রমা। নিভৃত অন্ধকার ঘরে তার সেই একনিষ্ঠ সাধনা, তার গুরুর আশীর্বাদ সার্থক হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

রস

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ীর রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছিলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাটিখালির শেখেদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনের আছেই বা কি? বাক্স-সিন্দুক ভরে যেন কত সোনা-দানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত খামার রেখে গেছে যে, তার ওয়ারিশি পাবে মাজুখাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানাকাটা হুরির মত চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজুখাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়!

সিকদার-বাড়ির, কাজী-বাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগী, ধূলা-পড়া দিছে চৌখে।'

মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেবে না? অমন মানুষের চৌখে ধূলাপড়া দেওয়নেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চৌখে। দেখছে তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধূলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ ক'রে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খাপসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মার ধোর করে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশী আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা ক'রে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয় যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দার নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গি পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম সেখের বাড়ীতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গত বার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখে শুনে যার-তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে আসলে তা পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুনাগার দু'এক কুড়ি নয়, পাঁচ কুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজী হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোথেকে।

মুখ ভার ক'রে চলে আসছিল মোতালেফ। আশ্‌শেওড়া আর চোখ-উদানের আগাছার জঙ্গলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে।

কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক ক'রে একটু হাসল ফুলবানু, 'কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি?'

'চলব না? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের!'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি? পছন্দসই জিনিস নেবা, বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান্, পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা সোনা জহরৎ ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝবো ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন ক'রে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মেঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব'?

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা-দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষেরে। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝ্‌ছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙ্গল না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বে-সবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, মুন্সী বাড়ি—কিন্তু কোথাও সুরাহ হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝাক্‌কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশী হোল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনৎ কম নয়, এক একটি করে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুৎসই ক'রে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মোট হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপটুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে, বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হোল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোচে গাছের গোড়া-শুদ্ধ কেটে নিলেই হোল; এর নাম খেজুর গাছ কাটা। কাটতেও হবে আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফারফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে, ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এ-সব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধও তার মুখের। রাজেকের মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়তো আধহাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলাহাঁড়িতে উঠতো। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোন ক্ষতি হোত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু'চারজন আরো ছিল রাজেকের—সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মত হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না, কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না, বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি যোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালি-গুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়ীতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু'বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাঁপ আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি ?'

ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা ?'

'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি ? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনরে। রস

জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজি হবে তো নিতে?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজুখাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ-তামাসা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায়?'

ইসারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট ক'রে খুলে বলল মনের কথা। কোন রকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা ক'রে নিয়ে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘর গেরস্থালির ষোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তার পর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ-তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে!'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল 'সাঁচাই নাকি। আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজুখাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃশঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশুনা দু'জনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হালকা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তার বেশী এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজুখাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাটখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজুখাতুনের উঠানে আর মাজুখাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালি গুড়। হাতের গুণ ছিল মাজুখাতুনের। তার তৈরী গুড়ের সের দু'পয়সা বেশী দরে বিক্রি হত বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশীর ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু'এক হাঁড়ি রস কোন বার ভদ্রতা ক'রে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাস খানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু'আনা করে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি ক'রে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রি করাচ্ছে সেই গুড়, ষোল আনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজুখাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশী বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ান যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথা-

গুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খাপসুরৎ মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হলো দু'এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোনাকী শাড়ি প'রে, রংবেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রীছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর অগোছালো হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপেপুঁছে ঝকঝকে তক্‌তকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরনীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছে গাছে। পাড়ার আরো অনেকের—বোসেদের, বাড়ুয্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ করে দিচ্ছে রস। পাকাটির একখানা চালা উঠানের পশ্চিমদিকে মাজুবানুকে তুলে দিয়েছে মোতালেফ। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জাল দেয় মাজুবানু। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, যোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুবানু এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেক দিন পরে মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুবানু, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে! বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের একেকটি করে চোংগা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোংগা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারা দিনের ময়লা রস চোংগাগুলির মধ্যে জমে থাকে। চোংগা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোংগার ময়লা রস

ফেলা যায়না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ'আনা সের! দু'বেলা দু'বার ক'রে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকাল বেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নীচে দূর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়া-পড়শীরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ। কিন্তু এত বেশী উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মত পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায় নি কোনদিন। ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু'হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হোল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায় নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগে নি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মেঞা? তুমি তো শোনলাম নিকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান্ মেঞা সাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ ক'রে বলল, 'মগজের মধ্যে

তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মেঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকি ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি!'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি ক'রে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি করে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি ক'রে!

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবা কেমনে।'

মনে এলেও মুখ ফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চ'লে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায় জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তা'হলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতরগুনা ঘইসা ঘইসা বদ, গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি?' মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না ত কি মিছা? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইন্ষের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে কেবল, সবুর করে থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুর করতে হোল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার যোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়া-

পড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতি মেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছল-চাতুরী তোমার মনে? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যেই ফুরাইল অমনি দূর দূর।'

কিন্তু এত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রংগের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজু-খাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন, ঘর-গেরস্থালি। কাছে বস আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া!'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সে গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, কিন্তু 'গাছি'র কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদি বা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পাড়াপড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাঃ, বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের! মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। একমাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কম বয়সী ছুঁড়ী-টুড়ীতে দরকার নাই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না কিছু। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউ তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক পঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ, ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান! ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান্ বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহ'লে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হোলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফাঁৎ ফাঁৎ নিঃশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাত থিকা তো বাঁচলাম, কি কও ফুলজান।'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না; পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন উরাল দেয় তার ঠিক কি!'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই ঘর পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইনষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চোখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমি তো বেশী ভক্ত না পানের। দিনরাতই খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর একজনের পান খাওয়া ঠোঁটের রস লাগে।'

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভাল কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মত নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কৃষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, কাটে, জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রং রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশী ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘে চারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা-কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে! কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ীর জাগ দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়, সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তা'হলে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে। অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউশ ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পার না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়ীতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুণ লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় ক'রে পৈঁকায় ক'রে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় ক'রে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে, 'ভারি কষ্ট হয় বউ, না?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি!'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন-কাতিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বছরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশী দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নাম-ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা! এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটবার ধূম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ যোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মত দিন ভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙ্গে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয়না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ।

ফুলবানুকে বলে, 'রস জ্বাল দেও,—যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু'এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়ীতে, কিন্তু এত রস এক সঙ্গে সে কোনদিন দেখেনি, কোনকালে জ্বাল দেয় নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন ক'রে টগবগ করে না জালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমত। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইয়া কইয়া দেই, বুঝাইলে বুঝ না। এই গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া ?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে 'কেনবে না ক্যান্। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুসি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খাপসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু'চারদিনের মধ্যেই কোনরকম চলনসই গুড় তৈরী করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুসি হয় না দেখে।

পুরোন খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মেঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জেহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার

তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশী হচ্ছে না, খেয়ে হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে ?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কিনা, ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে 'হ হ, চিনছি। আর বক বক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইন্‌ষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন করে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্‌থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় ক'রে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাকাটির চালার দোরের কাছে, 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান ?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড় ? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণ-কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি ক'রে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে

জ্বালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চীৎকার বেরুল,—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী ?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধ'রে স্নান করতে পারে নি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড় চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চীৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি ক'রে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী। এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার অপবাদ হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে !'

ফুলবানু বলতে লাগলো, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার ?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটকঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইন্‌ষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু

গৃহস্থঘরের অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ করল মোতালেফ। সেধে-ভজে মান ভাঙ্গাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু! দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান!'

ফুলবানু বলল 'কষ্ট আবার কি!'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে! সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা, তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। সে কথা ওরা বলেও জানে, শুনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বছর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ী এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ ক'রে ব'সে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব।'

'আলেকম আসলাম,!'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো, সব ছাওয়ালপান ভালো তো—?'

মাজুখাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারলে না মোতালেফ! নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোন রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'ছওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা—। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস ক'রে কথাটা মুখ থেকে বেনিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারী। গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কি? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানের খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে!'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যান আইজ। খাইয়া ছাখেন। দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলাকওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকি দু'সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর ক'রে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াতে চাও খাওয়াও, আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া। তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ ক'রে দিয়েছে নাদিরকে, খবরদার, ওই মাইন্‌ষের সাথে যদি ফের খাতির নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজে কর্মে সরেশ, কথায় বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু'হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপ্‌টানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে; 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা?'

হুকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'কেডা? ও' আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান্ মেঞাসাব?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে? কোন মুখে ওঠল আইসা এখানে?'

নাদির ফিস ফিস ক'রে বলে, 'আস্তে, আস্তে,—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইন্‌ষে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে—একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজসরম নাই ?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে, মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহতা বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দু'টি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু !'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন ! ধরেন, তামাক খান !'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই ক'ন না, দোষ কি তাতে।'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। কন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুক্ বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতরে থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে ?'

নাদিরের দিকে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মেঞা ! নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর এক ছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হয়েছে তার।'

গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে। চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হোল নাদির শেখের ডাকে, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুন যে নিবা গেল কইলকার।'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞা ভাই, নেবে নাই।'

শওকত ওসমান

নতুন জন্ম

গোমতী নদী এইখানে হঠাৎ মোচড় মেরে আবার সোজা এগিয়ে গেছে।

পাশে বন্যারোধী চওড়া বাঁধ, মনে হয়, যেন একখানা সুদীর্ঘ বাহু জলা-খাদ মাঠ গোঠ বনানী-শীর্ষ সবুজ-নীল গ্রামের ভিতর দিয়ে সুদূরে মিশে গেছে। দিগন্তের সরু রেখা ঐ বাহু-প্রান্তে উপুড় করা কর-তালু-লগ্ন রাঙা আঙুলের সমষ্টি। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তারই নীচে গোমতীর নেশা-ছলছল চোখ। দূরে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে গোমতী কারো প্রতীক্ষায়। অনুভূতির ঝঞ্ঝা স্রোত-রূপে উদ্বেলিত বুকের সমতলে ফুঁসে উঠছে।

বর্ষার অবেলায় ঝিরিঝিরি বাতাসের পিঠে সওয়াড় পাহাড়ী মেঘ আকাশ-বিজয়ে তাঁবু তুললো এইমাত্র।

নিচে গহ্‌নার নৌকা, মাছ-ধরা জেলে-ডিঙি, সাদা গাং-চিল ছন্দের সমতা বজায় রাখছে।

—হালী আইজ ক্ষেপ্‌ছে।

ডিঙি থেকে একজন মন্তব্য করল! হালী অর্থাৎ শালী।

গোমতীর এই মুহূর্তের ভগ্নিপতি ফরাজ আলি ছোট ডিঙির উপর হাল ধরে দাঁড়িয়েছিল। বাঁশের লগী ঠেলছে তারই বছর এগারো বয়সের পুত্র আক্কাস।

আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে একবার দেখল ফরাজ আলি। ঝড়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পলকে অন্য চিন্তার ঢেউ ওঠে। ঝড়ের কথা আর মনে থাকে না। হাল বগলে দাবিয়ে গলুইয়ের মুখ থেকে সে বিড়ি বের করে, মাটির হাঁড়ি-জীয়ানো আগুনে ধরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

গোমতীর বুক, মুখ কালো হয়ে এলো। মেঘের ওপারে সূর্যের অস্তিত্ব এখন অনুমানের ব্যাপার।

বড় আরামে বিড়ি টানে ফরাজ আলি।

স্রোত একটু খর! দুই পাড়ে আছড়ে-পড়া পানির গর্জন-শব্দে অস্বাভাবিকতা। তা ফরাজ আলির কান এড়ায় না।

দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় শব্দ উচ্চারণ করল সে, "হালী…।"

আব্বাস লগী ঠেলছে। শীতার্ত বৃদ্ধের দাঁতের মত ডিঙির গায়ে লগীর ঠক্‌ঠক্ শব্দ হয়। উজানের তোড় খুদে কিশোরের কাছে সহজে হার মানতে চায় না।

ফরাজ আলি উৎসাহ দিতে থাকে, সাবাস বেটা।

আব্বাস দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে লগী ফেলে আর পা টিপে-টিপে অগ্রসর হয়। শেষে সে ডাকে, বা-জান!

কণ্ঠে অসহায়তার আবেদন। বা-জান, অর্থাৎ আমি হাল ধরি, তুমি লগী চালাও।

জবাব আসে একটু পরে। জবাব নয়, অনুরোধ।

গোমতীর স্রোত ঘূর্ণি-তোড়ে চীৎকার করে উঠল।

—হালী আইজ ক্ষেপছে।

ফরাজ আলি গোমতীর সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতিয়াছে বহুদিন!

চেহারাখানা কালো, আঁট-সাট গাট্টা-বাঁধন, খাটো কদ্। তার উপর সে যা' পীচ-রং, দেখতে ঠিক নধর শিশুকের মত! নদীর সঙ্গে রিস্তা থাক্‌বে না কেন?

ফরাজ আলির কালো ভুরুর উপর খোঁচা-খোঁচা চুল এসে পড়ে। চোখে দয়া-মায়ার দাগ পর্যন্ত নেই। চোখ নয় ত, গোল কোটরের ভেতর দুটো কালো কাঁচ বসিয়ে মাঝখানে কেউ অতি ছোট্ট পিদিম জ্বালিয়ে দিয়েছে। কথা বলার সময় ফরাজ আলির দৃষ্টি জ্বালা ছড়ায়। বেঁটে শরীর। আরো বেঁটে, মাংসল, পেশী-খাড়া হাত। থুতনীর দু-পাশে রুক্ষ চোয়াল থেবড়ে বসে গেছে গৃহস্থের দাওয়ায় কাবুলীওয়ালার মত—দেনা-শোধ অথবা সুদ ছাড়া উঠবে না।

দম্ভের প্রতিমূর্তি ফরাজ আলির মুখাবয়ব।

এক হাতে পালের দড়ি ধরেছিল সে। কাফ্রি-সম্রাট যেন স্যাল্যুট নিচ্ছে তাঁবেদার ফৌজ মহলে!

কিন্তু ইতিমধ্যে বাতাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আকাশের প্রাঙ্গণে ধুনুরী নেমেছে। মেঘ-মহল্লা গোষ্ঠি-সুখ চায় না আর।

ফরাজ আলি তাড়াতাড়ি পাল নামিয়ে ফেলল; এত বাতাসে ছিঁড়ে যেতে পারে। গণ্ডা দশেক তালি বাদামের পাঁজরায়।

—বা-জান, আইস্তা লগি চলাইস্।

—ক্যান? পুত্রের জবাব।

—আমাগো ভিটা ছিল এহানে। তোঁয়ার চাচার কবর আছে।

—চাচা?

—হ। তারে দেখস নাই। হে এক জোয়ান ছিল। ফরাজ আলি উৎসাহে অগ্রজের কাহিনী বয়ান করে। আকাশের দিকে খেয়াল থাকে না। 'তুফানে ডুইব্যা মরছিল।' কথা শেষ করে ফরাজ আলি পুত্রের মুখের দিকে তাকায়। ভয়ের ছায়া কচি মুখে।

—ডর করস, বা-জান? ডরের কি আছে? 'এই হালী…' ফরাজ গোমতীর শ্রাদ্ধ-শেষে অন্য কাহিনী পাড়ে। বড় জোর স্রোত। হাল বাগ মানে না। রুক্ষ কণ্ঠে বিড়বিড় করে সে, 'হালী…।'

আবার অস্পষ্ট গলায় পুত্রের আবেদন ঃ বা-জান।

আবেদনের দিকে লক্ষ্য নেই ফরাজ আলির। নিজের মনে আউড়ে চলে, "হালী, তরে দ্যাখমু একদিন। বা জান?"

বা-জান তখন লগির সঙ্গে কুস্তিরত। পলিমাটি ছিল নীচে, লগি পুঁতে গেছে। আক্কাসও শক্ত ছেলে। লগি তুলে ডিঙির কিনারে-কিনারে এগিয়ে যায়।

—বা-জান, ডর কির লেইগ্যা?

আবেদন-মাখা কণ্ঠে আক্কাস বলে, "বা-জান, আসমানের দিকে চাইয়া দ্যাহেন।"

আকাশ কালো হোয়ে গেছে। বেলা বেশী নেই। ফরাজ আলি চেয়ে দেখল। তবু কোন বিকার নেই মুখে।

পুত্র লগি ঠেলে নিঃশব্দে। পিতার মুখের দিকে আর তাকায় না।

গোমতী যেখানে বাইজীর মত কোমর বাঁকায় নৃত্য-ছন্দে, তারই কোলে কোলে ঘর আছে। জোর একখানা, দু'খানা। বন্যারোধী বাঁধ আর

নদী-তট—মাঝখানে দশ-বারো হাত জায়গা কি আরো কম ফাঁক থাকে। সেখানে ফরাজ আলির মত আরো যারা আলি আছে তারা আস্তানা বাঁধে। শনে ছাওয়া কুঁড়ে। বাঁধের উপর থেকে মনে হয় ঝড়ে উড়ে এসে কারো ঘর জমিনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু বাঁধের গায়ে পায়ে-চলা সরু দাগ পথে নেমে গেলে দেখা যায়, আর এক জগৎ। আস্ত ঘর। ঘরের মুখ আছে। কান নেই, চোখ নেই। সম্মুখে বালি চিকচিকে উঠান! কলা গাছের ঝাড় আছে, বান-ভাসি কলকে ফুলের গাছ আছে। কেউ কেউ চারা ফুলগাছ লাগিয়ে রাখে। ফরাজ আলির চালের সঙ্গে পাখীর খাঁচা ও পাখী ঝুলছে, বুনো লতা কঞ্চির দেওয়াল বয়ে চালে উঠে গেছে। শুচিতার স্পর্শ চৌদিকে। ঘর, ঐ ঘরের ভেতর রহস্য-পুরী। বাইরের মানুষের কাছে জানার কথা নয়, এখানে আছে বাঁশের তক্ত-পোষ। সোনার পাথর বাটির নবতম সংস্করণ। বাঁশের পায়া, উপরে বাখারি বিছানো—মাদুর পেতে শোয়ার কাজ চলে। কিন্তু আরো অভিনবত্ব আছে মায়া-পুরীর ভেতর। তক্তপোষ, ঐ তক্তপোষের নানা সাইজের পায়া জড়ো করা থাকে এক কোণে। বর্ষা ও কোটালের জোয়ারে গোমতী একটু গৃহ-সুখ চায়, তখন জলের পরিমাপ অনুযায়ী পায়া বদল চলে। মাঝে মাঝে তক্তপোষ আভিজাত্যে ফুলে মটকায় গিয়ে ঠেকে, কারণ খুব লম্বা বংশ-পায়ার উপর আসীন থাকেন কিনা! পানির সঙ্গে সঙ্গে আবার খাড়াই ছোট হয়ে আসে।

ফরাজ আলির ছোট উঠানের পাশে দু'ঝাড় কলা গাছ দু-দিকে। মাঝখানে বাঁশের পৈঠা। গ্রীষ্মের সময় নদীর পানি সরে যায়। তখন পৈঠা বয়ে নীচে নেমে থালা-বাসন ধোয়া, গোসলের কাজ চলে। অঢেল ভাদ্রের সময় মাচাং-পোষ (মাচাং ও তক্তপোষ) থেকে আর নামতে হয় না কোন কাজের জন্যে। কলাগাছ খুব বাড়ে পলিমাটির উপরে। তলায় দাঁড়িয়ে এইখান থেকে পাতার ফাঁক দিয়ে ফরাজ আলির স্ত্রী দেখত, দূরের আকাশ আর সূর্যোদয়। দু-বছর আগে সে মরে গেছে। এখন সেই জায়গায় মাঝে মাঝে আনমনা হোয়ে দাঁড়ায় আক্কাস।

বসুন্ধরা কত কৃপণা, এখানে এলে বোঝা যায়। দিগন্ত-বিস্তার কত ছোট হোয়ে গেছে! এক ফালি জায়গার বেশী ধরিত্রী তার শিশুদের আর

কিছু গুণ দিতে বিমুখ। ওভারসিয়ার সাহেব এসে বলেছিল, 'ফরাজ আলি বে-আইনী ঘর তুলেছো।' 'হুজুর নদীর লগে হব গাছে গ্যা।' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিলেন ওভারসিয়ার সাহেব, "জমিনটুকু শুধু বাকী। তা ঠিক। কিন্তু কিছু দিতে হয় যে—"

—বে-আইনি করতাছি দিমুনা ক্যান?

—ঠিক বুঝেছো। ওভারসিয়ার সাহেব তখন পরিতৃপ্ত মুখে বিড়ি গুঁজে বলতেন, "জানো ফরাজ আলি, আমাদের আবার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দিতে হয়। এই দেয়া-নেওয়ার খেলা চল্‌ছে দুনিয়ায়। দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে···"। পাঠ্য-পুস্তকের স্কেুর তুলছিলেন তারপর। সে দিকে ফরাজ আলির কোন কৌতুহল থাকার কথা নয়। দেওয়ার ব্যাপারেই উৎসাহ বেশী। নদীর কোল ছাড়া মন টেকে না। যাক্‌, কিছু যাক্‌।

ফরাজ আলির এক প্রতিবেশী প্রায় বল্‌ত, "চলেন মিয়া বাই, চইলা যাই এহান থেইক্যা।"

—যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীড়িত, আর কোথাও মন লয় না। স্থাহো, চুলের লাহান সোতের গেরো।

চুলের মত স্রোতের গ্রন্থি।

কণ্ঠস্বরে ফরাজ আলির অনুভূতি রূপ পায়। অবয়বে সে পাষাণের মত অনড়।

প্রতিবেশী হাসত। "বড় জবর পীড়িত, মিয়া বাই। শাদী করেন এবার। ভাবি-সাব ত বহুত জমানা এন্তাকাল করেছেন।"

—না। আর সাদী করমু না। এই হালী লগ ছাড়ে কৈ। কিন্তু আমার লগে এত পীড়িত ক্যা?

—পছন্দ অইছে!

—হালীরে কৈ, হালী—আর কি আছে। ক্ষেইপ্যা উঠস্‌, ক্ষেইপ্যা ওঠ। যা' হালী বাঁধ ভাইঙ্গা কুমিল্লা শহরৎ—ওহানে বড় বড় সা'ব আছে—পীড়িত মজাসে করতা পারবি। সা'ব মটোর চড়াইবো, শরাব পিলাইবো। যা, হালী যা'—ওহানে ইমারত মিল্‌বো—পাতার ঘরৎ আসস ক্যা—হালী ছন্‌ল কৈ—

কিছু ঋণ দিতে বিমুখ। ওভারসিয়ার সাহেব এসে বলেছিল, 'ফরাজ আলি বে-আইনী ঘর তুলেছো।' 'হুজুর নদীর লগে হব গাছে গ্যা।' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিলেন ওভারসিয়ার সাহেব, "জমিনটুকু শুধু বাকী। তা ঠিক। কিন্তু কিছু দিতে হয় যে—"

—বে-আইনি করতাছি দিমুনা ক্যান?

—ঠিক বুঝেছো। ওভারসিয়ার সাহেব তখন পরিতৃপ্ত মুখে বিড়ি গুঁজে বলতেন, "জানো ফরাজ আলি, আমাদের আবার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দিতে হয়। এই দেয়া-নেওয়ার খেলা চল্ছে দুনিয়ায়। দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে···"। পাঠ্য-পুস্তকের ঢেকুর তুলছিলেন তারপর। সে দিকে ফরাজ আলির কোন কৌতুহল থাকার কথা নয়। দেওয়ার ব্যাপারেই উৎসাহ বেশী। নদীর কোল ছাড়া মন টেকে না। যাক্, কিছু যাক্।

ফরাজ আলির এক প্রতিবেশী প্রায় বল্ত, "চলেন মিয়া বাই, চইলা যাই এহান থেইক্যা।"

—যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীড়িত, আর কোথাও মন লয় না। ত্থাহো, চুলের লাহান সোতের গেরো।

চুলের মত স্রোতের গ্রন্থি।

কণ্ঠস্বরে ফরাজ আলির অনুভূতি রূপ পায়। অবয়বে সে পাষাণের মত অনড়।

প্রতিবেশী হাসত। "বড় জবর পীড়িত, মিয়া বাই। শাদী করেন এবার। ভাবি-সাব ত বহুত জমানা এন্তাকাল করেছেন।"

—না। আর সাদী করমু না। এই হালী লগ ছাড়ে কৈ। কিন্তু আমার লগে এত পীড়িত ক্যা?

—পছন্দ অইছে!

—হালীরে কৈ, হালী—আর কি আছে। ক্ষেইপ্যা উঠস্, ক্ষেইপ্যা ওঠ। যা' হালী বাঁধ ভাইঙ্যা কুমিল্লা শহরৎ—ওহানে বড় বড় সা'ব আছে—পীড়িত মজাসে করতা পারবি। সা'ব মটোর চড়াইবো, শরাব পিলাইবো। যা, হালী যা'—ওহানে ইমারত মিল্বো—পাতার ঘরৎ আসস ক্যা—হালী হুন্ল কৈ—

অবিকৃত মুখে ফরাজ আলি শ্যালিকার উপর অভিসম্পাত ঝাড়ত।

আজও স্ত্রীর সহোদরা নির্বিকার।

বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গোমতীর স্রোত দ্রুত শুরু হয়। বাঁশের লগির গায়ে খলখল কল-হাস্যে আছড়ে পড়ে।

আকাশে হুঙ্কার-রত পুরু মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন কালো গো-পালের মত গুঁতো-গুতি শুরু করে।

আব্বাস এবার দাবি-দৃঢ়কণ্ঠে কথা চালায়, "বা-জান। অঁাই আর পারতাম নঅ। লগি ধরেন আপনে!"

এতক্ষণে হুঁশ হয় ফরাজ আলির, আরো জোরে ঝড় উঠতে পারে।

সমস্ত আকাশ ঝুলে পড়েছে। গোমতীর দূর-বিস্তার-বক্ষ মেঘের অন্ধকারে লুপ্ত। আশে-পাশে কোন নৌকা নেই। পিতা-পুত্র কালো পটভূমির গহ্বরে যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

—বা-জান, জলদি করেন।

আশঙ্কা-ক্লিষ্ট চীৎকারে পুত্র হুঁশিয়ারী ছাড়ে। শন্‌শন্‌ বাতাসের আওয়াজ মৃদু-ভাষের কোন দাম নেই আর! ফরাজ আলির চীৎকারে জবাব দিতে হয়ঃ আইতেছি।

পিতার জায়গায় পুত্রের সমাসীন হোতে কয়েক মুহূর্তের অপচয়। তারই ভেতর নৌকা চর্কির মত তিন পাক খেয়ে গেল।

জোর চীৎকার করে ফরাজ আলি, 'হাইল জুরসে কোলের দিকে টান্‌তে লাগ, বা-জান।"

অঁারে কওয়া লাগব না।

এম্নি আব্বাস শান্ত ছেলে। এখন তেজী গলায় বিরক্তি ষোল আনা জানান দেয়।

নৌকা সায়েস্তা হোয়ে গেছে। লগি ফেলছে ঝপঝপ ফরাজ আলি।

নিমিষে চারিদিক সীসার খাপে যেন ঢুকে গেল। ঝড় উঠল জোরে।

চীৎকারে এখন সাধারণ বাক্য বিনিময় হয়। ফরাজ আলি বলে "ডর না করস, বা-জান। হাইল ঝিক্যা দে। ঝিক্যা দে!"

……দিতাছি। বালকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

—হালা ক্ষেপছিস, হালী। তোরে ডরাই না। তরে ডরাই না! বাচ্চা লগে। হালী আর সময় পাইলি না মস্করার। তরে দ্যাহামু, ছিনাল···

আপন মনে চীৎকার করে আর লগি ঠেলে ফরাজ আলি। কুঁজো হয়ে যাচ্ছে সে। লগি বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত! দরদর ঘাম ছুটছে গা থেকে।

আব্বাস আন্দাজে হাল চালায়।

শন্‌শন বাতাসের সঙ্গে এবার বৃষ্টি শুরু হলো। শব্দে কান পাতা দায়। চতুর্দিক মুছে গেছে। আকা-বাঁকা নানা কোনে বৃষ্টির ফোঁটা তীর বেগে ছুটে আসছে।

ফরাজ আলির ডিঙি থামে না। অাঁকছে, বাঁকছে—ঢেউ-এর দোলায় নেচে নেচে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার মাথা ফুঁড়ে উঠছে। হাতের পেশীর কাছে প্রাকৃতিক আক্রোশ বৃথাই ফোঁস চালায় বিষ-শূন্য নাগিনীর মত!

টোকা মাথায় দিতে যায় ফরাজ আলি, উড়ে পড়ে গেল নদীর ভিতর।

—যা হালী লিয়া যা, শরীফ খান্দানের মাইয়ার লাহান বুকে কাঁচুলি বাঁধবি। বা-জান, তর টোকা ফেইলা দে—ফেইল্যা দে! একখান কাঁচুলি তোমার খালা আম্মার বুকে বেঢপ দ্যাহাইবো—ফেইল্যা দে—।

বাতাসের রন্ধ্রে ফরাজ আলির চিৎকার দাপটের পথ পায়।

আব্বাস পিতার অনুরোধ রাখে না। চুপ-চাপ নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে।

হেসে উঠল ফরাজ আলি। দাঁত বেরোয় না, ঠোট কাঁপে না, গালে টোল পড়ে না। তবু হাসে সে। আজব ধরন। বুক ধুধু গুরগুর করে ওঠে, দোলা খায় বার-বার।

ফরাজ আলির মুখ বন্ধ হয় না। "দুলা বাইয়ের লগে মস্করা করতাছস? অাঁই মরদ। বুজছনি হালী? মহাজনের কেরায়া নাউ, নইলে দ্যাহাইতাম হালী নাউ চালান্ কারে কয়।"

ফরাজ আলির স্বগতোক্তি কেউ শোনে নাঃ শোনে, সে হয়ত শোনে উন্মাদিনী গোমতী।

গাছ-পালার মেরুদণ্ড রবারের মত কুঁচকে আবার সটান হোচ্ছে। ঝাপসা বৃষ্টি-শীকরে বোঝা যায় না, ওইগুলো গ্রামান্তের গাছপালা।

পুঞ্জীভূত কালির পাহাড় যেন ভূমিকম্পে কাঁপছে। তারই আর্তনাদ, ছলাৎছল পাগল ঢেউ-এর অট্টরবে, বাতাসের গলা টেপা গোঙানির শব্দ-পটে।

হাজার লক্‌লকে জিভ নিয়ে বিজলীর সাপ আকাশের আলকাৎরা গা চেটে নিচ্ছে।

ফরাজ আলি এই চকিত ইশারার ফাঁকেই দেখতে পায় ঃ নিকটে ঘর ও ঘাট। বাঁকের মুখে এসে পড়েছে তারা।

আর একবার ভেংচি দিল সে শ্যালিকার উদ্দেশে!

বৃষ্টি থেমে এলো ইল্‌সে-ফোঁটায়। ঝড়ের আক্রোশ অবিরাম-গতি তেমনই চলছে।

ঘাটে নৌকা বেঁধে ফরাজ আলি চুটিয়ে ঝাল নিংড়ে দিল, "আয় হালী, দেহী তরে। বা-জান টোকা ফেইল্যা দে— ।"

শেষ সম্বোধন পুত্রের উদ্দেশ্যে।

আব্বাস কোন কথা না কানে তুলেই জাল কাঁধে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঝড়ের জুলুমে মাছ ধরা মাটি। আব্বাসের বড় খারাপ লাগে।

পৈঠার নৌকা বেঁধে পেছন পেছন এলো ফরাজ আলি।

আগেই ডিপা জেলে দিয়েছে আব্বাস।

ভিজে গামছা খুলে ফালি লুঙ্গি পরছিল, ফরাজ আলি তখন জিজ্ঞেস করে, "সালন পাক করতা চাস, বা-জান?"

মাথা দোলায় আব্বাস। নঅ।

—আব্বা। ছাড়ান দিন। দুফরের বা'তে অইব।

আর কথা বলতে পারে না সে। হি হি করে শীতে কাঁপতে থাকে।

অনেক বৃষ্টি গেছে কচি মাথার উপর দিয়ে।

বাঁশের আলনা থেকে কাঁথা টেনে গায়ে দিল আব্বাস।

ফরাজ আলিরও খুব শীত পেয়েছে। এখন প্রয়োজন সামান্য তামাক। নৌকায় সব ভিজে গেছে। বাঁধের উপর, আরো দক্ষিণে রহম মুদীর দোকান আছে। যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না এমন দুর্বিপাকে।

দুইজনে ক্লান্ত।

আক্কাস বেশী কথা বলে না। চুপচাপ থাকে। কিন্তু মনে মনে সংলাপ চলে সে অবিকল পিতার সংস্করণ। খেলাধূলায় খুব পটু ছিল। আজকাল বাপ সঙ্গী হিসেবে তার মর্যাদা দিয়েছে। মৃত পত্নীর স্মৃতি অথবা জীবিকার জুটি-রূপে। তাই আরো চুপ করে থাকে আক্কাস। অনেক দিন ঘরে বসে বা ডিঙির লগি ঠেলার সময় নদীর পাড়ে ছেলেদের কোলাহলে তার মেজাজ তেতে, মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু মুখে সরব কিছু শোনা যেত না।

বাইরে অন্ধকার নদী আর ঝড়ের গর্জন একাকার মিশে গেছে।

পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসে আছে। দুইজনে নীরব। সামান্য নড়া-চড়ার ইচ্ছা-টুকুও অন্তর্হিত।

আক্কাস মাঝে মাঝে কান খাড়া করে।

পৈঠার উপর গোমতী মাথা কুটছে। পাড় ভেঙ্গে পড়ছে ঝপঝপ শব্দে।

কলাগাছের জন্য আক্কাসের দুঃখ হয়। হয়ত নদীতে ভেঙ্গে পড়বে কাঁদি সহ।

—বা-জান, নদী যা' গরজাইতাছে কেলা গাছ হব পইড়া যাবো, চলেন কাঁচা কাইট্যা আনি।

—আইজ ঠিক থাইক্‌ব।

জনক অভয় দিল সংক্ষেপে।

আক্কাস তবু উসখুস করে। তার মন সরে না। সামান্য গড়িমসির ফলে এমন তৈরী জিনিস নষ্ট হবে। এক সপ্তাহ থাকলে পাকা কলা বাজারে বিক্রি করে আসতে পারত।

ঘরের প্রবেশ-পথে সে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। জোরে ঝড় দিচ্ছে অন্ধকারে আন্দাজেই সে দেখতে পায় যেন, কলাগাছ জোরে নাড়া খাচ্ছে। শিকড়ে বেশী মাটি নেই। রাত্রি কাবার হোতে-হোতে গাছের আয়ুও কাবার হবে।

কিন্তু নিকটে কি যেন সাদা সাদা দেখা যায়। দমকা বাতাসে ছলাৎ শব্দ হয় পৈঠার নিকট। পানি কি বাড়ছে তবে?

আশঙ্কিত ডাকে আক্কাস, অ বা-জান। বা-জানের খোয়ারী লেগেছিল। আক্কাসের গলা অতদূর পৌঁছায় না

আরো জোরে ডাকল সে, অ বা-জান !

কি ক'। সুপ্তোত্থিত কণ্ঠ।

—হ্যাহেন। পানি বাড়তাছে। বান আইতা পারে।

গোমতীর রগ চেনে ফরাজ আলি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। মাটির বাসন আড়াল দিয়ে পিদিম হাতে এগিয়ে এলো। ফিকে আলো নদীর ধারে পোঁছায়।

ফরাজ আলি চেয়ে দেখে, নূতন ফেনা পৈঠার গায়ে। আক্কাসের আশঙ্কা মিথ্যা নয়।

আশঙ্কায় ফরাজ আলির বুকও হয়ত কাঁপল। সে বিড় বিড় শুরু করে, "হালী, এহন-ই জ্বালাইতা লাগছস।"

গালি দেওয়ার বেশী অবসর নেই। ঘরে ফিরে এলো সে। এক কোণে স্তূপীকৃত বংশ-পায়া ঠিক আছে কিনা, পরীক্ষা করল। বান বাড়লে, মাচান-পোষই একমাত্র আশ্রয়।

বাইরে চড়চড় ধ্বঅস-স শব্দ হোলো। আবার স্রোতের হুট্‌পাট। যেন কুমীর কোন জংলা হাতী শিকার ধরেছে।

আক্কাস বলে, "বা-জান। নদী গাছ নিতাছে, নদী ! চলেন···"

—না, আন্দারে যাওনের কাম নাই।

পিতার কণ্ঠ রুক্ষ। সমস্ত নদীর গায়ে কত ফাটল। এখন যাওয়া সমীচীন নয় মোটে। আক্কাস বোঝে না কেন ?

বাঁশের পায়া ঠিক করে, দুইজনে প্রতীক্ষায় থাকে। হুড়মুড় শব্দ হচ্ছে। ষাঁড়ের পাল গাঁ-গাঁ রবে মাঠের সড়ক ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ঝড়ের দাপট পূর্ববৎ।

আধ ঘণ্টার ভেতর বন্যার জল হু হু বাড়তে থাকে। পৈঠা কবে পার হোয়ে, এখন ঘরে ঢুক্‌ছে।

ওসব দুর্বিপাক ফরাজ আলির গা সওয়া। কিন্তু আরো কত বাড়ে বন্যা, সেখানেই সমস্যা।

সে আরো কয়েক ইঞ্চি লম্বা পায়া লাগালো মাচাং-পোষে।

আক্কাস চুপচাপ হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে থাকে। বাবা একবার খাওয়ার তাড়া দিল। কিন্তু ক্ষুধা তার মিটে গেছে। ক্রূর কালো অন্ধকার

পটে দৃষ্টি মেলে সে এক-একবার তাকায়। তার কিশোর মনে হাজার রকমের প্রশ্ন অর্থহীন জিজ্ঞাসায় ভিড় করে।

দু-ঘণ্টায় বানের জল হু হু করে ঢুকে পড়ল চারিদিকের রন্ধ্র পথে। মাচাং এবার দ্বীপ। পিতা-পুত্র দ্বীপের অধীশ্বর। এখনও জলছে টিম্ টিম্ প্রদীপ। ঝড়ের দমকে ঘরখানা মচ্ মচ্ শব্দে কাঁপছে। থুবড়ে পড়বে না তো সব নিয়ে! ফরাজ আলি একবার ভাবল।

নীচে হাঁটুর বেশী পানি। দড়ির শিকের হাঁড়ি-কুড়ি ঝুলছে। পাখীর খাঁচা ঘরে তোলা হয়েছিল। ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে আছে পাখীটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে! হঠাৎ খাঁচা নড়ে উঠল। ডানার ঝট্‌পটানি ওঠে।

সান্ত্বনার স্বরে ফরাজ আলি বলে, "র' র'।" বিষণ্ন খেচর আবার মাথা গুজে ডানার ভেতর।

ঝড় সামান্য কম্‌লো। কিন্তু বন্যার জল মেঝের উপর এক বুক।

এমন বহু রাত্রি কাটিয়েছে ফরাজ আলি স্ত্রীর সঙ্গে। সেও আজ ভয় পায়। নূতন তৈরী ঘর। এই যা' ভরসা।

নেশাগ্রস্ত প্রাণীর মত আব্বাস ঝিমোয়।

চোখে নিদ্রা। বুকে ভয়। দোটানায় ঝড়ের দমকে ঘর কেঁপে ওঠা মাত্র হঠাৎ সে হাউ-মাউ করে উঠল।

—বা·জান'?

—চুপ র'। ডরাস ক্যা?

ধমক দিল ফরাজ আলি। কিন্তু পর মুহূর্তে সে-ও বিবেচনার লাঙল চালায় মনে মনে। বন্যা পড়েছে, বাড়ছে। এমন কালরাত্রি। এখনও সাঁতার দিয়ে বাঁধে উঠা চলে।

কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়া যুক্তিযুক্ত নয়।

সৌভাগ্য তাদের। ঝড় থেমে গেল একটু পরে। কিন্তু আকাশ সাক্ষী যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে আরো জোরে। দমকা বাতাস থামেনি এখনও।

এই সুযোগ।

আব্বাস বাবার ধমক খেয়ে মাচাঙে শুয়ে পড়েছিল কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

ফরাজ আলি তা-কে ঈষৎ ঠেলা-মেরে বলে, "বা-জান' ওড্। এহানে আর না।"

—কুই যামো ?

—কি কস ? এহানে আর না। বাঁধের উপর যামু।

আক্কাস যেন এমনই অনুরোধের প্রতীক্ষা করছিল। এক মুহূর্তে তৈরী সে।

ফরাজ আলির গলা-সই পানি। আক্কাসের সাঁতার ছাড়া উপায় নেই।

ফরাজ আলি ভাতের হাঁড়ি, মাদুর, কাঁথা মাথার উপর চাপিয়ে দিল। শেষে চোখে পড়ে, খাঁচা আর পাখী। তা-ও মাথায় তুলে নিল সে। মনে মনে বলে, "ময়না, এই ঝড়ের রাইত। তোরে ছাড়মু না। জান্ যাবে তোগোর। কাল বিহানে ছাইড়া দিমু। হালী…"

ডিবা নিভে গেল একটু অসাবধানতার ফলে। অন্ধকারে উঠানে নাম্‌ল ফরাজ আলি।

"বা-জান"। পুত্রকে সম্বোধন করে বলে সে, "বা-জান আমার কান্ধার পর হাত রাইখ্যা সাঁতার দিতা র'। ঠিক যামু বান্ধের লগে।"

আকাশে কোন-কোন ঠিকানায় মেঘ সরে গেছে। নিষ্প্রভ চাঁদ ছিল শুক্লা তিথির। এইটুকু বিরাট সান্ত্বনা ফরাজ আলির কাছে। হোক ঝাপসা, বাকীটুকু আন্দাজ পরিপূরক।

আক্কাস পিতার কাঁধ ধরে সাঁতার কাটে। এগিয়ে যায় ফরাজ আলি। খাড়া বাঁধ। সব জায়গা দিয়ে উপরে ওঠা চলে না। পায়ে পায়ে পথ-পড়া দাগ খোঁজা চাই। চাঁদের আলো আর একবার দুই মনুষ্য সন্তানের উপকারে এগিয়ে এলো।

বাঁধের উপর পৌঁছল তারা।

আকাশ আরো পরিষ্কার হয়ে আসে। মেঘ-মুক্তির আস্বাদে জ্যোৎস্না ফুটফুটে রোশনাই ছড়ায়।

কাঠের কয়েকটা মোটা গুঁড়ি পড়েছিল চওড়া বাঁধের এক পাশে। তারই উপর পুনর্বসতির মহড়া। সব গুছিয়ে রাখল ফরাজ আলি।

তার গামছা, লুঙ্গি, পরিধেয় সম্বল দু-ই ভিজে গেছে। । যা' শীত, স্যাঁতসেতে কিছু পরে থাকা অসহ্য। ফরাজ আলির উপস্থিত বুদ্ধি সর্বক্ষণ ঘটে জমা থাকে। সে চট করে ভিজে লুঙ্গি খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে পড়ল কাঠের গুঁড়ির উপর।

আক্কাস মাথায় গামছা বেঁধে সাঁতার দিয়েছিল। তার পরনে কাপড়। শুধু গা শিরশির করে শীতে। সে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফরাজ আলি বলে, বয়, বা-জান।

—অ্াঁই বইতাম ন'।

—ক্যা?

—অ্াঁই আর এহানে থাকুম না।

—যাবি কুই?

—শহরে যামু।

—খাইবি কি ওহানে?

—চুরি করমু, ডাকাইতি করমু, কাম করমু—

—মরদের বাচ্চা, চুরি ডাকাইতি করতা চাস, শরম করে না—শরম করে না?

চিড়-ধরা গলায় জবাব দিল আক্কাস, "মানসে এ্যামনে থাহে? তুমি স্থুস্থুণ্ডের বাচ্চা, না মানুষের বাচ্চা? নদীর লগে লগে থাকার চাও, তোয়ার শরম করে না? স্থুস্থুণ্ডের বাচ্চার লাহান খালি···।" শিশুকের বাচ্চা! বিস্ময়ে তাকায় ফরাজ আলি পুত্রের মুখের দিকে।

তারপর জোর করে রুষ্ট পুত্রকে পাশে বসিয়ে বলে, "বয়। ঠিক কইছস। বিয়ান আইতে দে। আমিও যামু তর লগে। মহাজনের নাউ দিয়া দিমু।"

ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপে আক্কাস।

ফরাজ আলি সস্নেহে তাকে কাঁথার ভিতরে মুড়ি দিয়ে নিতে নিতে অপরাধীর মত বলে, "শরম না করস। অ্াঁই তোয়ার পোলা ন, বা-জান?"

বিবস্ত্র পিতা। পাশে গামছা-পরিহিত পুত্র।

দুইজনে ভোরের প্রতীক্ষা করে।

বিমল মিত্র

মিলনান্ত

বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

সবাইকে হতাশ করতে হলো। বিলাসপুরের রেল-কলোনীর ছেলেরা বড় আশা করে আমার কাছে এসেছিল। তিন দিন ধরে থিয়েটার, নাচ গান। চাঁদাও উঠেছে বহু টাকা। কোলিয়ারীর মালিকরাই দিয়েছে সাতশো। কলকাতা থেকে ড্রেসার পেণ্টার আসছে!

আবার বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ তোমরা, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

কিন্তু ছেলেরা চলে যাবার পর হঠাৎ যেন নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠলাম। তবে কি ছেলেরা অন্তর্যামী! কী করে জানলে ওরা! আমি তো মিথ্যে কথাই বললাম। জানালার বাইরে দেখলাম বুধবারী-বাজারের দিকে ছেলেরা চলে যাচ্ছে। টাউনের রাস্তায় ইলেকট্রিক বাতিগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো। ডাউন বোম্বে মেল আসবার সময় হয়েছে বুঝি। টাঙ্গাগুলো সওয়ারী নিয়ে ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে। নিজের প্রায় অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বসে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। ওদের কাছে আমি মিথ্যে কথাই তো বলেছি। সত্যিই তো অভিনয় করেছি আমি। ছোট এক অঙ্কে সমাপ্ত একখানা নাটক। ষ্টেজ নেই, দৃশ্যপট নেই, ড্রেসার, পেণ্টার, রিহার্সাল কিছুই নেই। তবু তো সেদিন অভিনয় করতে আমার বাধেনি!

ছেলেদের ডাকা হলো না। সেইখানে বসেই যেন মল্লিক মশাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চোখের সামনে। মল্লিক মশাই বললেন—কেমন জামাই দেখলে মুকুল?

বললাম—খাসা, চমৎকার—

মল্লিক মশাই আবার বললেন—আমি জানতুম জয়ন্ত রাজি হবেই, এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এর পর পরীক্ষাটা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে·····কিন্তু তুমি খেয়েছ তো ? পেট ভরেছে ?

এবারও বললাম—হ্যাঁ—

—মাংসটা কেমন হয়েছিল ?

এবারও বললাম—ভালো—কিন্তু এবার আমি আসি মল্লিক মশাই, এর পর গেলে আর ট্রেন পাবো না হয়ত—

কোনও রকমে মল্লিক মশাই-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাইরে আসতেই আদিনাথ ধরেছিল।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না ?

মনে আছে আদিনাথের হাত দু'টো ধরে বলেছিলাম, কিছু মনে করো না তুমি—কিন্তু খেতে আমাকে বোল না ভাই—

—অন্ততঃ গরীবের বাড়ীতে ডালভাত চচ্চড়ী—যা জোটে ?

কিন্তু কুড়ি বছর আগের এ ঘটনা এমন করে মাঝখান থেকে বললেই কি সব বোঝানো যায় ? এখানে এই পাঁচশো মাইল দূরে বিলাসপুর রেল-কলোনীর বি-টাইপ কোয়ার্টারে বসেও ঘনায়মান অন্ধকার অতিক্রম করে যেন শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কুড়ি বছর আগের আওয়াজ এখানে পৌঁছুতে কি এত সময় লাগে ? তারপরে তো কত দেশ, কত নদী, কত পাহাড় নিঃশব্দে পেরিয়ে এসেছি—কিন্তু সে-দিনের সে ঘটনা এমন করে ভুলতেই বা পেরেছিলাম কী করে ?

তবে গোড়া থেকেই বলি—

হঠাৎ ভৈরবগঞ্জে এসে ট্রেনটা থেমে গেল। শুনলাম—ট্রেন আর যাবে না। এখানেই রইল। কালও যেতে পারে, পরশুও যেতে পারে,—কিম্বা তার পরদিনও যেতে পারে। ইছামতীর জল বেড়ে রেলের লাইন ডুবে গেছে! জল না নাবলে কিছু বলা যায় না।

যে যার মালপত্তর নিয়ে নেবে পড়লো।

ভৈরবগঞ্জ ছোট স্টেশন। না আছে ওয়েটিংরুম, না আছে ভালো রকমের প্লাটফরম। না আছে একটা কুলী। টিম টিম করছে এক ফালি

একটা স্টেশন ঘর। কাঁকর বিছানো প্লাটফরমের ওপর রাত কাটানো যায় না।

স্টেশন মাষ্টার টেলিফোন নিয়েই ব্যস্ত। কথা বলবার সময় নেই তাঁর।

হাত নেড়ে বললেন—এখন মরবার সময় নেই স্যার, তিনখানা আপ, দুখানা ডাউন গাড়ি সেকশানে আটকে গেছে—

তারপর পাশের টিফিন ক্যারিয়ারটা দেখিয়ে বললেন—ওই স্বচক্ষে দেখুন বাড়ি থেকে হালুয়া করে পাঠিয়েছে—মুখে দিতে পারিনি—

বলে আবার হ্যালো হ্যালো করতে লাগলেন!

চোখে অন্ধকার দেখলাম। বিকেল হয়েছে। এ জায়গায় রাত কাটাবার কথাটা মনে আসতেই ভয় পেয়ে গেলাম। শনিবারের দুপুর বেলা শেয়ালদা থেকে উঠেছি, আবার সোমবারে ফিরে গিয়ে অফিস করতে হবে।

প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছি। হঠাৎ স্টেশনের এক প্রান্তে পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে "ভৈরবগঞ্জ" লেখাটা চোখে পড়তেই মনে পড়ে গেল।

ভৈরবগঞ্জ!

এই ভৈরবগঞ্জেই তো মল্লিক মশাই-এর বাড়ি। কত দিন যেতে বলেছেন। কিন্তু কখনও আসা হয়ে ওঠেনি। গ্রামের নামটাও মনে আছে ছুটিপুর। এই ছুটিপুর থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতেন মল্লিক মশাই।

বলতেন—একবার তো সময়ই হলো না তোমার মুকুন্দ, কিন্তু মিনুর বিয়ের সময় কোনও ওজর আপত্তি শুনবো না।

বলেছিলাম—নিশ্চয়ই যাবো মল্লিক মশাই, দেখে নেবেন, মিনুর বিয়ের সময় নিশ্চয়ই যাবো।

তারপর মল্লিক মশাই হতাশাভরে আবার কাজে মন দিতেন—হঁ্যা, তুমি আর গিয়েছ।

সত্যিই, কত কাজে অকাজে কত দিকেই গিয়েছি, কিন্তু মল্লিক মশাই-এর ছুটিপুরে যাবার আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি আমার। হঠাৎ ভৈরবগঞ্জ স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আবার মনে পড়ে গেল মল্লিক মশাই-এর কথা বহু দিন পরে।

স্টেশনের পেছনেই একটা পান বিড়ির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে বললে—ছুটিপুর? তা পোয়া তিনেক রাস্তা হবে এখান থেকে—আজ্ঞে—সামনে খাটরের বিল বেরিয়ে সোজা পেঁপুলবেড়ের আল পথ ধরে চলে যান—যাবেন কা'র বাড়ি?

তারপর অবশ্য সেই বিকেল বেলা দশজনকে জিজ্ঞেস করে করে গিয়ে পোঁচেছিলাম শেষ পর্যন্ত ছুটিপুর। চারিদিকে সন্ধ্যে নেবে এসেছে তখন। দু'পাশে ধান বোনা হয়েছে, জলে থই থই করছে ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে পেছল আলের পথ। অনেক উঁচুতে পৃথিবীর ছাদের উপর দিয়ে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাদুড় উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। সামনের আমবাগানের ঢালু জমিটার ওপর দিয়ে শেষ গরু কটা জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে মিশে গেল। ছুটিপুরে গিয়ে যখন পোঁছুলাম, তখন বেশ অন্ধকার।

একজন কৃষাণ গোছের লোক বললে—এ হলো মালো পাড়া, মল্লিক মশাই থাকেন পূব পাড়ায়—এই বাঁশঝাড়ের পাশ বরাবর গিয়ে পড়বেন বারোয়ারীতলায়, তার ডান ধার পানে পূবপাড়া—

চলতে চলতে ভাবছিলাম—বলা নেই, কওয়া নেই, হয়ত মল্লিক মশাই খুব অবাক হয়ে যাবেন। একদিন কত পীড়াপীড়ি করেছেন এখানে আসবার জন্যে। তখন আসা হয়নি। সেই মল্লিক মশাই অফিস থেকে রিটায়ার করলেন, ফেয়ারওয়েল হলো তাঁর তখনও কথা দিয়েছিলাম—যাবো মিনুর বিয়েতে, নিশ্চয় যাবো কথা দিচ্ছি—

মল্লিক মশাই বলতেন—আগের দিন খবর দিও, আমি পুকুরে ঝোরা দিয়ে মাছ ধরিয়ে রাখবো, আর উমেশ ময়রাকে কাঁচাগোল্লার বরাত দিয়ে রাখবো, তাই খাবে- শেষে মিনুর গানও শুনিয়ে দেব—

আশ্চর্য এই এতখানি পথ হেঁটে বত্রিশ বছর ধরে কেমন করে একটানা চাকরী করে এসেছেন মল্লিক মশাই। ভোর বেলা সাতটা বাজতে না বাজতে বেরুতেন বাড়ী থেকে আর ফিরতেন রাত আটটায়! আর তারই মধ্যে ইট পোড়ানো, বাড়ী করা, পুকুর কাটানো—ক্ষেতখামারের তদারক···।

আমার সঙ্গে কেমন করে অমন বন্ধুত্ব হয়েছিল কে জানে। অথচ আমি তো প্রায় তাঁর ছেলের বয়সী।

মনে আছে প্রথম দিন আমাকে বলেছিলেন—এটা ক্যামেরা নাকি মুকুন্দ, তুমি ছবি তুলতে পারো ?

তারপর বলেছিলেন তা দাওনা মিনুর একটা ছবি তুলে ভায়া, ওর ভারি ছবি তোলাবার সখ—একদিন চলো আমাদের দেশে—যা দাম লাগে আমি দেব—

ভূধরবাবু বলতেন—মল্লিক মশাই আপনি যে এতমেয়ে মেয়ে করেন—মেয়ে তো বিয়ে হলেই পর হয়ে গেল—

ওপাশ থেকে সুধীরবাবু বলতেন—এই দেখনা আমার জামাই-এর আক্কেলটা, যতবার ছেলে হবে আমার কাছে পাঠাবে, আর মেয়েও তেমনি হয়েছে—আসে আসুক কিন্তু একেবারে খালি হাতে—আমার তো এই মাইনে—সবদিক সামলাই কী করে ?

সনাতনবাবু বলতেন—কথাতেই তো আছে—জন্-জামাই-ভাগনা তিন নয় আপনা—বুঝতে পারতাম মল্লিক মশাই কথাগুলো শুনে অপ্রসন্ন হতেন। চুপি চুপি বলতেন—জয়ন্ত আমার সেই রকম জামাই নাকি তোমরা ভাবো, অমন ছেলে হাজারে একটা মেলেনা—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে নাকি ?

মল্লিক মশাই বলতেন—তা একরকম হওয়াই বলতে পারো—শুধু দেরি হচ্ছে ওর চাকরীর জন্য—সীতানাথ বাবুকে বলে আমিই তো ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ইছাপুরে, সেখান থেকে বদলি হয়েছে জব্বলপুরে, এইবার একটা প্রমোশন হলেই ফোরম্যান একেবারে—

বললাম—তা বলে বিয়েটা করে রাখলে দোষ কী ?

মল্লিক মশাই বলতেন—আমি তো তাই বলি—সেবার ছুটি নিয়ে সেই কথা বলতেই গিয়েছিলাম জব্বলপুরে, বেশ জায়গা, সাহেবদের বাংলো পেয়েছে, চাকরবাকরে রান্না করে—আমি বললাম—কেন তোমার এ সব হাঙ্গামা করা, মিনু এলে একদিনেই তোমার ঘর-সংসারের শ্রী বদলে যাবে—কেউ নেই তোমার সংসারে, তুমি কার পরোয়া করবে ? তা কী বলে জানো ?

বললাম কী ?

বলে—টাকা জমাচ্ছি আমি, বিয়েতে আপনাকে এক পয়সা খরচ করতে দেব না কাকাবাবু।

—আপনি কী বললেন ?

—আমি আর কী বলবো, আমি চলে এলাম, তা তুমি কী ভাবছো আমি কিছু খরচ না করে পারি ? আমার তো এদিকে সব তৈরী, সেদিন যে ইট পোড়ালাম, সে বাড়ী তো জামাই-এর জন্যেই—সব তৈরী মুকুন্দ, সব তৈরী,—খাট, আলমারী, ড্রেসিং আয়না, ষোল ভরির গয়না পর্যন্ত গড়িয়ে রেখেছি—দানের বাসন কিনেছি এক একটা করে, গায়ে হলুদের কাপড় পর্যন্ত কিনে রেখেছি—মিনুর মা নেই, আমাকেই তো সব করতে হবে—সাধে কি আর বলি, জামাই তো অনেকেরই দেখেছো আর বিয়ের সময়ে আমার জামাইকেও দেখো—খবর দেব তোমাকে—

সুধীর বাবু বলতেন—তুমি ওই বুড়োর কথা বিশ্বাস করো নাকি মুকুন্দ। আজ পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি ওই এক কথা। আমি কতদিন বলেছি—একটা ভাল পাত্র আছে, আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন বিয়ে, আপনার মেয়ে সুন্দরী, একটা পয়সা নেবে না, তা উনি বলেন—না, মেয়ের আমার পাত্র ঠিক হয়ে আছে—

একদিন সরাসরি বলেই ফেলেছিলাম—আচ্ছা মল্লিক মশাই, ভগবান না করুন—যদি জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত বিয়ে না-ই করে—এতদিন হয়ে গেল—

মল্লিক মশাই-এর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস। বলতেন—তুমি বলো কি মুকুন্দ, জয়ন্তকে আমি চিনি না। আমি ওকে মানুষ করলাম, ছোট বেলায় বাপ-মা মারা গিয়েছিল, আমি না দেখলে ও কি বাঁচতো ? ইস্কুলের মাইনে দিয়ে পড়িয়ে চাকরীতে ঢোকানো ইস্তোক—সব যে আমি করেছি—নইলে ধর্মে ওর সইবে—মাথার ওপরে ভগবান বলে একজন আছেন মানো তো ?

সুধীরবাবু সব শুনে বললেন—শুনলে তো, এখন কী জবাব দেবে দাও—

তারপর একটু থেমে বললেন—ওঁর মেয়েটি কিন্তু ভারী সুশ্রী ভাই, লক্ষ্মী প্রতিমার মত চেহারা, এমন চমৎকার তার ব্যবহার, একবার দেশে গিয়ে দেখেছিলাম।

জয়ন্ত গান ভালবাসে বলে মেয়েকে উনি মাষ্টার রেখে গান শিখিয়েছেন,—জয়ন্ত ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসে বলে নানান রকমের রান্না শিখিয়েছেন—

এক একদিন দেখতাম মল্লিক মশাই মনোযোগ সহকারে চিঠি লিখছেন—

আমি কাছে যেতে বললেন—জয়ন্তকে আর একটা চিঠি লিখলাম—

বললাম—আগেকার চিঠির উত্তর পেয়েছেন না কি ?

বললেন—না, সেই জন্যই তো লিখছি আবার—

—আপনার চিঠির উত্তর দেয়না এটাই বা কি রকম ?

—তা ভাই এ তো আর আমাদের মত কেরাণীগিরির চাকরী নয়, অফিসে বড় খাটুনি ওর, সময়ই পায় না—

তবু কখনও মনে পড়ে না জয়ন্ত একটা চিঠিরও উত্তর দিয়েছে।

একদিন এমনি করে রিটায়ার করবার দিনও এল। চাঁদা তুলে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হলো মল্লিক মশাইকে। যাবার দিন মল্লিক মশাই-এর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বত্রিশ বছরের সম্পর্ক ছাড়তে কষ্ট হয় বৈকি ! আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—মিনুর বিয়েতে তোমার যাওয়া চাই কিন্তু ভাই—

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—দিন স্থির হয়ে গেছে নাকি ?

—ওই দিন স্থির করাটুকুই যা বাকি—নইলে বিয়ে ওদের একরকম হয়েই গেছে ধরে নিতে পারো, ওদের ছুটি পাওয়া শক্ত কিনা, বিয়ের ছুটি তাও দেবে না বেটারা, তা বলাও যায় না একদিন হয়ত হুট করে এসে বলতে পারে এখুনি বিয়ে হয়ে যাক, একদিনের ছুটি হয়ত মেরে কেটে পেয়েছে।

বললাম—একদিনের মধ্যে সব যোগাড় যন্ত্র করতে পারবেন ?

মল্লিক মশাই এবার হেসে ফেলেছিলেন—যোগাড় তো সব রেখেছি ভায়া, মায় ফুলশয্যার বন্দোবস্তও শেষ—শুধু কাঁচা বাজারটা, তা সে আমার ভাইপো আদিনাথ আছে, সব করে ফেলবে সে।

এ সব পাঁচ বছর আগের ঘটনা। মল্লিক মশাই রিটায়ার করবার পরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। জানি বেঁচে আছেন। এই পর্যন্ত।

ভাবছিলাম—এতদিন পরে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ আমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন কে জানে।

কিন্তু পূবপাড়ায় পৌঁছতে আর বেশী দেরী হলো না। ছাড়া ছাড়া বাড়ি চারদিকে গাছপালার জঙ্গল। বেশ ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। কাছাকাছি কোনও বাড়িতে ঢোল আর শানাই বাজছে। ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজও আসছে। বোধহয় কোনও উৎসব চলেছে কোথাও।

বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই একজন বেরিয়ে এল।

বললে—মল্লিক মশাই? তাঁর তো অসুখ—

—অসুখ—মানে—

ছেলেটি যেন কেমন আমতা আমতা করতে লাগল।

তারপর বললে—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—কলকাতা। বলোগে মুকুন্দ এসেছে। বি-এন-আর অফিস থেকে--

অফিসের নাম শুনে যেন কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ছেলেটি।

জিজ্ঞেস করলাম তোমার নাম কি?

—আদিনাথ।

তুমি কি মল্লিক মশাইয়ের ভাইপো?

আদিনাথ আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে—আপনি জানেন কী করে?

বললাম—আমি জানি সব—কিন্তু মল্লিক মশাইয়ের সঙ্গে আমায় দেখা করতেই হবে—

—কিন্তু—

আদিনাথ তবু যেন কেমন দ্বিধা করতে লাগলো।

বললে—তিনি তো চোখে—দেখতে পান না—

—সে কি? আমার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই।

—হ্যাঁ, আজ চার বছর অন্ধ হয়ে গেছেন, শুধু চুপচাপ বসে থাকেন নিজের ঘরে—

নিজের ঘরে—

বললাম—তা হোক, আমাকে তিনি অনেকবার এখানে আসতে বলেছেন—একবার দেখা না করে যাবো না—

আদিনাথ তবু যেন কোনও উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু এবার অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম তার মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে

এল। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় তার দু'চোখের পাতাগুলো কেমন যেন ছল্ ছল্ করছে।

হঠাৎ কান্নার মতন করে যেন আদিনাথ কঁকিয়ে উঠলো।

বললে—আপনি যেন কিছু বলবেন না তাঁকে, কাকাবাবুর হার্ট বড় দুর্বল। ডাক্তারে কেবল বিশ্রাম নিতে বলেছে—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি……

হঠাৎ ছেলেটির এই ব্যবহারে কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই স্বল্পালোকিত পরিবেশে, চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ আর অদূরের ঢোল আর শানাইয়ের মূর্ছনার সঙ্গে এক মুহূর্তে সমস্ত অতীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

আদিনাথ বললে—চলুন নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু আপনি যেন কিছু বলবেন না—

আমি মন্ত্রচালিতের মত পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ির অন্দর মহলেও কোন লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যেন মৃত্যুপুরীর অলিন্দ দিয়ে আমি কোন অনাবিষ্কৃত অনন্তের সন্ধানে চলেছি।

আমি সামনে এগিয়ে একবার বললাম—বাড়িতে কোন বিপদ চলছে নাকি?

আদিনাথ হাতের সঙ্কেত করে বললে—চুপ, কাকাবাবু শুনতে পাবেন—

তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। গলা নীচু করে বললে, উনি যা বলবেন আপনি হ্যাঁ বলে যাবেন—আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁচাবেন—

বললাম—কী হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না যে—

আদিনাথ তেমনি গলা নীচু করে বললে—আর চেপে রাখা যাচ্ছিল না—আপনাকে সব বলবো পরে—কাকাবাবুর মেয়ের আজকে বিয়ে—

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম, কার—মিনুর?

আদিনাথ কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা পড়লো। ঘরের ভেতর থেকে মল্লিক মশাইয়ের গলা শোনা গেল—কে, কে ওখানে কথা কয়?

আদিনাথ আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—আমি কাকাবাবু।

—সঙ্গে কে, কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

—ইনি এসেছেন মিনুর বিয়েতে কলকাতা থেকে। আপনি বলেছিলেন নেমন্তন্ন করতে—বি. এন. আর অফিসের লোক।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক মশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কে? সুধীর? সনাতন? মুকুন্দ?

এগিয়ে গিয়ে বললাম—মল্লিক মশাই, আমি মুকুন্দ।

আমার উত্তরটা শুনেই মল্লিক মশাই যেন উত্তেজনায় আনন্দে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন—মুকুন্দ? মুকুন্দ, তুমি এসেছ—আর ওরা এল না—সুধীর, সনাতন?

আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে বললে—ইনি বলছিলেন ওঁদের আসবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অফিসে ছুটি পান নি।

এবার ঘরের ভেতর ভাল করে চেয়ে দেখলাম। মল্লিক মশাই একটা খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন। সমস্ত শরীরে চাদর ঢাকা। মাথার পেছনে একটা টেবিলের উপর একটা হারিকেন জ্বলছে। কয়েকটা ঔষধের শিশি, জলের গ্লাস।

আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম—আপনার চোখ খারাপ হয়েছে জানতাম না তো!

মল্লিক মশাই হাসলেন। বললেন—বয়স হয়েছে, যাবারও সময় হয়ে এল মুকুন্দ, কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই, আর মিনুর বিয়েটা যে শেষ পর্যন্ত হলো, তাতেই আমার সব দুঃখ মিটে গেছে ভায়া—

তারপর থেমে বললেন—তুমি যে এসেছ মুকুন্দ, আমি ভারী খুসী হয়েছি, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলে!

আদিনাথ আমার দিকে চাইলো।

আমি বললাম—হ্যাঁ, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম, আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মিনুর বিয়েতে আসবো—

মল্লিক মশাই এবার বললেন—আদিনাথ—মুকুন্দকে তুমি ফার্ষ্ট ব্যাচেই খাইয়ে দেবে। ওর আবার ট্রেনের সময়—

আমি কেন জানি না বলে ফেললাম—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মল্লিক মশাই।

মল্লিক মশাই যেন তৃপ্তি পেলেন, শুনে বললেন—ভালোই করেছ—মাংসটা কেমন খেলে আর উমেশ ময়রার কাঁচাগোল্লা!

বললাম—খাসা–চমৎকার!

মল্লিক মশাই বললেন, আদিনাথ, তুমি নিজে খাবার সময় কাছে ছিলে তো ?

আদিনাথ টপ করে বললে—হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি নিজে দিজে খাইয়েছি ওঁকে—

মল্লিক মশাই অবার বললেন—বর দেখলে মুকুন্দ—জয়ন্তকে দেখলে ? কেমন জামাই করেছি বলো ? তখন তো সবাই তোমরা ঠাট্টা করতে। বলতে জয়ন্ত বিয়ে করবে না। কিন্তু মাথার ওপর একজন ভগবান আছেন এ কথা মানো তো ? তোমরা আজকালকার ছেলে ভগবান টগবান মানো না—কিন্তু আমার অসীম বিশ্বাস ছিল ভাই ছোটবেলা থেকে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—ওইযে যে বাড়িতে বসে তুমি খেলে ওই বাড়িটাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করলাম ভাই, ওটা দিয়ে যাবো মেয়ে জামাইকে, আর এই বাড়িটে হচ্ছে আমার পৈত্রিক, শরীরটা খারাপ বলে ওই সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি আর গেলাম না— আমি আদিনাথকে বললাম—আমি নিরিবিলিতে এখানেই থাকবো—তা আদিনাথ একাই সব করছে—

বললাম—ভালোই করেছেন—

মল্লিক মশাই বললেন—দেখভাই, ভগবানের ওপর অসীম বিশ্বাস ছিল বলে, বরাবর আমি বিশ্বাস করতুম জয়ন্ত রাজি হবেই—এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এবার ফোরম্যান হয়েছে, এরপর একটা পরীক্ষা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে—তা জয়ন্তকে আমি কিছু খরচ করতে দিইনি—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে আমি পনেরো হাজার টাকা পেয়েছিলাম জানো ত, সবই খরচ করলাম মিনুর বিয়েতে—

তারপর আদিনাথকে লক্ষ্য করে বললেন—আদিনাথ, ওদিকে কোনও গোলমাল হচ্ছে না তো? সবদিকে নজর রাখবে, কেউ যেন না খেয়ে চলে যায় না—টাকার জন্য ভেব না—

আদিনাথ বললে—না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকাবাবু, আমি সব দেখছি—

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম—এবার আমি আসি মল্লিক মশাই, এরপর গেলে আর ট্রেন পাবো না হয়ত—

মল্লিক মশাই বললেন—আচ্ছা এসো ভাই—খুব কষ্ট হলো তোমার—আদিনাথ, মুকুন্দর যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিও—

সেই নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে মল্লিক মশাইকে রেখে সোজা উঠে বাইরে এলাম। তারপর অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে একেবারে সদর দরজার কাছে এসে পৌঁছুলাম। আমার যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চেয়ে দেখি আদিনাথও হারিকেনটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

আদিনাথও যেন আমার মত নির্বাক হয়ে গেছে।

তার চোখে চোখ পড়তেই দেখলাম আদিনাথ কাঁদছে।

মুখ দিয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা বেরুল না।

আদিনাথই মুখ খুললে। বললে—আপনি যেন কাউকে কিচ্ছু বলবেন না।

এতক্ষণে রাস্তায় নেমে এসেছি। বাইরে অন্ধকার। চারদিকে বাঁশঝাড় আর জঙ্গল। কোনও দিকে কিছু স্পষ্ট দেখা গেল না। শুধু অদূরের ঢোল শানাই-এর শব্দ ভেসে আসছে। দু'একবার শাঁখও বেজে উঠছে। মনে হলো—শানাইটা বিনিয়ে বিনিয়ে কেবল বুঝি বিসর্জনের সুরই বাজাচ্ছে।

হঠাৎ মুখ ফেরালাম।

আদিনাথও আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না?

মনে আছে আদিনাথের হাত দুটো চেপে ধরেছিলাম। বলেছিলাম—কিছু মনে করো না তুমি—কিন্তু এর পর খেতে আমাকে তুমি বোল না ভাই—

—অন্ততঃ গরীবের বাড়ীতে ডাল ভাত চচ্চড়ি যা জোটে—

সেদিন অভুক্ত অবস্থাতেই চলে এসেছিলাম মনে আছে। বারোয়ারীতলা পর্যন্ত আদিনাথ আমাকে এগিয়ে দিতে আসছিল। কিন্তু আমি বারণ করেছিলাম।

বললাম—তোমাকে আর আসতে হবে না ভাই, তুমি মল্লিক মশাইকে গিয়ে দেখো—

আদিনাথ বলেছিল—কিন্তু কাকাবাবু জানতে পারলে রাগ করবেন—

—কিন্তু জানাবে কেন তাঁকে?

এ কথার উত্তরে আদিনাথ কোনও জবাব দেয়নি। আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন কোনও নতুন প্রশ্নের অপেক্ষা করছিল।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—জয়ন্ত কি চিঠি দিয়েছিল তোমাদের—শেষ পর্যন্ত?

আদিনাথ বললে—না—কাকাবাবুর একখানা চিঠিরও জবাব দেয়নি—

—সে কি জব্বলপুরেই আছে? একবার গেলে না কেন সেখানে?

—গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি—

—কেন?

—তার চাকর ঢুকতেই দিলেনা বাড়ির ভেতর। দুটো কালো কুকুর তাড়া করে এল কামড়াতে—

—তার চাকর কী বললে?

—চাকরটা বললে—মেম সাহেব মানা করে দিয়েছে। আমিও শুনলাম, জয়ন্ত এক মেম সাহেবকে বিয়ে করেছে, ছেলেও হয়েছে—

—তারপর? যেন নিজেও হতবুদ্ধি হয়ে নির্বোধের মত প্রশ্ন করে বসলাম।

আদিনাথ বললে, তারপর আর কি, কাকাবাবুও অবুঝ, তাঁরও হার্ট খারাপ হয়ে গেছে, এ খবর দিতে পারিনি তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবু বারণ করেছিলেন—। কিন্তু আর বেশি দিন চেপে রাখাও যাচ্ছিল না—ওঁকে বাঁচাবার জন্যে এই পথ নিতে বাধ্য হলাম, এ ছাড়া আর গতিও ছিল না—আমার মা এই বুদ্ধিই দিলেন—

বারোয়ারীতলার বিরাট বিরাট বট গাছের তলায় কেমন নির্বোধের মতন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশে পাশে চারদিকে পাকা পাকা ফলগুলো টপ টপ করে পড়ছে। মনে হলো—যেন কারো চোখের

জল পড়ার শব্দ ওটা। তবে কী নির্জীব গাছটাও সব জানে। চেয়ে দেখলাম—আদিনাথ এখনও কাঁদছে। মনে পড়লো—মল্লিক মশাই বলেছিলেন—মাথার ওপর ভগবান বলে একজন আছেন তা মানো তো ?

হঠাৎ বললাম—এবার আসি ভাই—

আদিনাথ হারিকেনটা উঁচু করে ধরলো।

সে আলোয় সামনের পথটা একটু ঘোলাটে হয়ে এল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম। যে মেয়েটিকে নিয়ে এত কিছু কাণ্ড, এত মুখর অভিনয়, তার কথা তো এতক্ষণ একবারও মনে আসেনি। মল্লিক মশাই-এর দিকটাই সবাই দেখেছে। কিন্তু তার কথা তো কেউ ভাবছে না। ওই ঢাক ঢোল শানাই মূর্ছনা আর শাঁখের মঙ্গল ধ্বনির অন্তরালে অন্তরালে সে-ও কি একজন অন্যতম অভিনেত্রী হয়েই আছে ? জয়ন্তর জন্যে তার গান শেখা আর রান্না শেখার কৃচ্ছ্র সাধনের ইতিহাস কি আজ এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত ছিল ? মনে হলো—ও বটফল নয়, ও যেন সেই মেয়েটিরই চোখের জল—আমাদের আশে পাশে চারিদিকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। ওকে শুধু জয়ন্তই উপেক্ষা করেনি—মল্লিক মশাই, আদিনাথ, আদিনাথের মা সকলের কাছেই সে উপেক্ষিতা।

আদিনাথ আলোটা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়েছিল।

কাছে গিয়ে বললাম—আর···আর···

আদিনাথ আমার দ্বিধা ভেঙ্গে দিয়ে বললে—বলুন—

—আর সেই মল্লিক মশাইয়ের মেয়ে ? সে জানে ?

আদিনাথ বললে—মিনুর কথা বলছেন। তার মত আছে, সে তো কাকাবাবুর মত অবুঝ নয়। তা ছাড়া এ পাত্রও তো খারাপ নয়। দেড়শো বিঘে ধানজমি আছে, এক বিঘের ওপর জমিতে বাস্তু বাড়ি, বছরের খাবার ঘরেই হয়, শুধু আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে—তা এত কাণ্ডের পর একজন রাজি হয়েছে এই তো সৌভাগ্য বলতে হবে মিনুর পক্ষে—

আবু রুশদ

……

শাড়ী বাড়ী গাড়ী

খোদা মুনিমকে ছাপ্পর ফুড়ে দিয়েছে। সংশয়ী বন্ধুরা অবশ্য বলে, তার সব কিছুই শ্বশুরের বদৌলতে। এর পেছনে ঈর্ষা আছে। কারণ, মুনিম শ্বশুর তনয়ার প্রেমে পড়েছিল, এখন শ্বশুরের কথা ওঠালে চলবে কি করে।

জবাবে হয়ত মুনিমের বন্ধুরা বলবে, প্রেম করার পেছনেও তাঁর একটা হিসেব ছিল। আরও হয়ত বলবে, প্রেম করাটা পদমর্যাদার মতো একটা ফ্যাশানের জিনিস, যার ধাপে ধাপে আছে শাড়ী আর গাড়ী। প্রথমে অবশ্য রশীদার টানা চোখটাই মুনিমের চোখে পড়েছিল। তখন বিত্ত তার ঘরে আসেনি, প্রথম যৌবনের চমকিয়ে দেওয়া হৃদয়সম্ভার থেকে তখন সে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়নি। তাই রশীদার আয়ত চোখের স্বচ্ছ গভীরতায় সে মিষ্টি এক নীড়েরই স্বপ্ন দেখেছিল, সোনারূপার কথা ততটা ভাবেনি।

রশীদার খেয়াল ছিল কিন্তু অন্য রকম। দু'হাজারী বাপের আদুরে বেটি ব'লে রূপার ঝলক ও টাকার গরমের কথা ভুলবার অবকাশ সে বড় একটা পায়নি। তাই আচম্বিতে সে যখন আবিষ্কার করল যে, তার হিসেব-না-মানা মন এক সাধারণ চাকুরিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তখন মনের কোনে তার এই খেয়ালই ছিল, কি করে সমাজের উপর-কোঠায় মুনিমকে টেনে আনা যায়।

ইচ্ছে যখন আছে—বিশেষ করে দু'হাজারী দুহিতার ইচ্ছে—পথও একটা বেরিয়ে যায়। তার বাপ সি, আই, ই করিম সাহেবের আনাগোনা মোগল-পাঠানদের মহলে। তাই মুনিমের নসীবে বাদশাহী অনুগ্রহের ছিটেফোঁটা সহজেই জুটে যায়। এবং রশীদা মিসেস মুনিম হবার বেশ

কিছু আগেই পুলকিত হয়ে টের পায় যে, তার ভাবী স্বামী একশ' থেকে তিনশ', তিনশ' থেকে সাতশ', সাতশ' থেকে সাড়ে আটশ'তে উঠে গিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের উপরের দিকের ভাঁজে ভাঁজে মিশে গিয়েছে।

মুনিমের চেহারায় আর কিছু থাক বা না থাক্, লোকে যাকে নধর-কান্তি বলে তা আছে। তার উপর খোশ নসীবের দ্রুত আনাগোনায় শরীর তার চর্বি এবং মুখে চিকনাই বেশ এসে জমা হয়েছে। এর মধ্যে চাটগাঁর বরকত আলী থেকে তিনটা স্যুট বানিয়ে এবং কোলকাতা থেকে টাই আর জুতা আনিয়ে শরীরের মসৃণতার সঙ্গে বাইরেরও নিভাঁজ পারিপাট্যের সে এক সংযোগ ঘটিয়েছে। যখন সি, আই, ই সাহেবের (পাকিস্তান হওয়ার পরেও বৃটিশ জমানার মাহাত্ম্যের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি) চোখে ঠোকর-মারা-ভাবে সাজানো ড্রইংরুম-এ মোগল-পাঠানদের জমায়েত হয়, তখন তাদের মধ্যে নধর এক ছাগ-শিশুর আবির্ভাব দেখে তাদের দিল বড় খোশ্ নয়।

অতএব যখন একদিন রোশনাই ও বাজনাইর ভেতর দিয়ে তাদের শাদী মোবারক হয়ে গেল তখন রাত্রে সাজানো উপঢৌকনের সারি দেখে বর ও বধূর মনে মিলনের সুখের চেয়ে রূপা ও সোনার জেহেজগুলিই বেশী দোলা দিল।

অবশ্য তাই ব'লে এ বলা যায় না যে, শাদীর শ্বাসরোধ-করা অনুষ্ঠানগুলির পরে মাঝরাতে রশীদার জানালার বাইরে নিম গাছের উপরে তারাখচিত নীল আসমানের ছোট এক কোনে দুষ্টু হাসির মতো আধবাড়ন্ত চাঁদ চোখে পড়েনি, বা মুনিম যখন পাতলা বেগুনী রঙের বেনারসী শাড়ী-পরা নব পরিণীতার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলো তখন চার বছরের পরিচিতাকে কিছুটা রহস্যময়ী বলে মনে হয়নি।

শাড়ী তো শাদীর পর পরই হ'লো। গণ্ডার পর গণ্ডা, গরীব লোকের ঘরে যেমন ছেলেমেয়ে আসে। শাড়ী পেয়ে যেমন রশীদার তৃপ্তি; শাড়ী দিয়ে তেমনি মুনিমের চিত্তস্ফীতি।

বাড়ী হতে কিন্তু বেশ দেরি হ'লো। তার একটা কারণ অবশ্য রশীদার নিজেরই মনে সংশয় ছিল কোনটা ঠিক আগে দরকারঃ গাড়ী না বাড়ী।

এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের কয়েক মাস পরেই ঘরোয়া কয়েকটা বৈঠক হয়ে যায়, এই দুই জিনিসের সুবিধা অসুবিধার কথা তন্ন তন্ন করে বিচার করে তারা দুজনেই শেষ পর্যন্ত একই সিদ্ধান্তে আসে যে, গাড়ীর আগে বাড়ীই যেন ভালো। সি, আই, ই সাহেবের দৌলতে চাকুরী পারমিটের সমন্বয়ে বাড়ী করবার খায়েশ যখন অনেকটা পূরণ হওয়ার পথে তখন অতর্কিত বাইর থেকে তুচ্ছ একটা বাধা এসে মুনিমের মনকে দু' একদিনের জন্য বেজার করে তুললো। চিঠি লিখেছে শাহেদ আলি, তার কলেজ জীবনের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। এককালে এমন কিছু নেই, যা তারা দু'জনে মিলে তারুণ্যের সদর্প অহমিকায় করেনি।

* * *

সে সব অবশ্য অনেকদিনের কথা, পেছনে ফেলে আসা তারুণ্যের ঝলমলানো বৈভব মোগল-পাঠানের বিক্রমে, রূপা-জহরতের দ্যুতিতে নরম শাড়ীর অগাধ কোমলতায়, বাড়ী করার নিকট খুশীতে নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে গিয়েছে। এবং সেজন্য সাতাশ-বসন্তে ভারাক্রান্ত মুনিমের মনে কোন ক্ষোভ নেই।

আশ্চর্য, শাহেদ চিঠি লিখেছে টাকা চেয়ে। বলেছে, বউয়ের গুরুতর অসুখ, তার নিজের এখন খুব হাত টান, বন্ধু যদি শ' পাঁচেক টাকা পাঠায় তবে বড় সুবিধা হয়। এই টাকা চাওয়ার প্রস্তাবটা মুনিমের কাছে বড় নোংরা মনে হয়, কারণ মোগল-পাঠানদের দুনিয়ায় গরীব স্বামীর বউয়ের অসুখ হওয়ার কথা কেউ ভাবে না।

বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বন্ধুর চিঠির জবাব এই বলে দেয় যে, বাড়ী করবার দরুন তাদের হাত বড়ই টানাটানি, এখন শ' পাঁচ টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে বউ ভালো হয়ে যাবার পর যদি সে এবং শাহেদ দু' এক দিনের জন্য তাদের এখানে এসে বেড়িয়ে যায় তবে তারা খুব খুশী হবে।

তবুও, তাজ্জবের কথা, মন থেকে মুনিম বন্ধু ও তার বউয়ের কথা একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। যখন ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছে গিয়ে সে পুরো একটা সেগুন গাছ কি ভাবে আদায় করবে তার মতলব ভাঁজে তখন কথার ফাঁকে ফাঁকে শাহেদের বউয়ের কথা

তার মনে পড়ে যায়। মেয়েটি শ্যামলী হলেও তন্বী ও হাস্যময়ী ছিল। চোখে লাগতো বেশ। স্পষ্ট মনে পড়ে, বিয়ে করবার পর বন্ধু যখন তার বউকে প্রথম বারের মতো দেখায়, তখন তার নিজের দিলটা বড় বিগড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এ হাস্যময়ী শ্যামলী তন্বী তরুণী যে স্নিগ্ধ শান্তির সম্ভাবনা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তা রশীদার মধ্যে, তার চোখের স্বচ্ছ গভীরতা সত্ত্বেও, হাজার হাতড়ালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন এমন মনে হয়েছিল, তা মুনিমকে এখন কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে না। কি কারণে বন্ধুর বউকে দেখে নিজের পরিণীতার প্রতি সাময়িকভাবে গভীর এক অসন্তোষ বোধ জেগেছিল তাও সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। তবুও তখন এ কথাটাই মনে জেগেছিল যে, শাহেদ তার উপর দিয়ে টেক্কা মেরেছে। কেন মেরেছে কি ভাবে মেরেছে—মনের সে গহন-জটিল প্রশ্নগুলির জবাব সে কোনকালেই দিতে পারত না, এখনও পারবে না।

ফরেষ্ট অফিসারের বাংলো থেকে নিজের আস্তানায় ফিরে গিয়ে প্রথমেই দেখা হয় রশীদার সঙ্গে। অনেক দিন পরে এই প্রথম মুনিম রশীদার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে। সুখী গৃহীণীর সমস্ত চিহ্ন তার সারা শরীর জুড়ে জলজল করছে; কিন্তু কোনো যেন পেলবতা নেই। সহসা এক মুহূর্তের জন্য মুনিমের মনে এই প্রশ্ন জাগেঃ রশীদাকে সে ঠিক কি ভাবে চেয়েছিল? চটুল, কথাবার্তায় নিপুণা, তাস পিটানো, খলখল করে হেসে পড়া, অশুদ্ধ ইংরেজী ঘটা করে বলা ও ঈষৎ মেদাঙ্গিনী, ধন-দর্পিতা গৃহিণী বলে, না-অন্য কিছু হিসাবে? তার দিকে স্বামী যে কিছুটা নূতন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তা রশীদার স্থূল চোখেও ধরা পড়লো, বললো ঃ চেয়ে কি দেখছো?

'কিছু না' মুনিমের স্বর কেমন যেন আড়ষ্ট শোনায়।

তবে বিকেলে যখন সহকারী পুলিশ সুপারের বাসা থেকে আমন্ত্রণ এলো চায়ের, তখন নিজেকে ফিটফাট করতে মুনিম যতটা যত্ন নিলো ততটা তীক্ষ্ণ নজর রাখলো সে, স্ত্রীর শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজের রঙ মিশ খেয়েছে কিনা এবং তার গলায় হারের সঙ্গে নূতন স্যাণ্ডেলের ঢপটা মানিয়েছে কিনা।

বাড়ীটা একদিন সম্পূর্ণ হ'লো। এর পেছনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অজস্র মেহনত করেছে—তাই তৈরী হয়ে যাওয়া বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রশীদার মনে সাময়িক এক দ্বন্দ্বের ভাব জেগেছিল ঃ তোফা বেশী দেখতে কে—বাড়ী না স্বামী ? আর মুনিমেরও একথা মনে হয়েছিল ঃ এখন তার পক্ষে কে বেশী অপরিহার্য ঃ বাড়ী না বউ ? দু'জনের আবার একই কথা মনে হয়েছিল ঃ ছেলে হলে গর্বের ভাবটা - সুখের কথা ত তাদের জানাই নেই—এর চেয়ে বেশী হবে কি ?

মাঝে মাঝে রশীদার এখন একথা অবশ্য মনে হয় যে, একটা ছেলে কি মেয়ে হওয়া ভালো। দুই কারণে তার এ কথা মনে হয়। শাড়ী হ'লো, বাড়ী হ'লো। গাড়ী না হয়ে ছেলে হওয়াই এখন বরং ভালো। তাতে শুধু সংসারেরই পূর্ণতা আসবে না, মুনিমকেও আরও দৃঢ়তর শৃঙ্খলে বাঁধা যাবে। এর দরকার রশীদা এরই মধ্যে টের পেয়েছে। কারণ, মনে তার কোন সূক্ষ্মতা না থাকলেও সে নারীর সহজাত অনুমান শক্তির উপর ভর করে এ কথা স্পষ্ট বুঝেছে যে, কখনও কখনও বিরল ও দুর্লভ-গভীর কোনো অবসর ক্ষণে - মুনিম তার প্রতি যেন কিছুটা অসহিষ্ণু, কিছুটা নারাজ হয়ে উঠে। এই যে এত টাকা ঢালা এত সাধ ও পরিশ্রমের নূতন ইমারত, তাতে এরই মধ্যে কোথায় যেন গভীর এক খাদ আশ্রয় নিয়েছে, কোথায় যেন নোনা ধরেছে।

মাস দুয়েক পরে, রশীদা যখন সন্তান-সম্ভবা এবং গাড়ীর জন্য টাকা যখন বেশ কিছু জমা হয়েছে—তখন টাউন রেশনিং অফিসার-এর বাড়ীতে চায়ের দাওয়াত খেতে গিয়ে এক কোনে শাহেদ ও তার বউকে চুপটি করে বসে থাকতে দেখে মুনিম যেমন তাজ্জব হয় তেমন হয় অপ্রস্তুত। পরে জানতে পারে, বন্ধুর মুখেই, সে এখানে সাবডেপুটি হয়ে এসেছে। অনুযোগ করে মুনিম বলে ঃ তুমি জানো আমি এখানে আছি, তাও এখানে আসবার সময় আমায় কিছু জানালে না !

শাহেদ বেশ ভদ্রভাবেই জওয়াব দিলো ঃ বড় তাড়াহুড়া করে এসেছি, খবর দেবার সময় পাইনি। তারপরে কথাচ্ছলে মুনিম আরও জানতে পারলো যে, শাহেদ এখনও বাসা পায়নি, তার এক প্রফেসর বন্ধুর তিন কামরাওয়ালা বাড়ীর একটা কামরা নিয়ে আপাতত আছে।

আহত হওয়ার ভান করে মুনিম বলে ঃ কেন, আমাদের এখানে এসে উঠতে পারলে না, বন্ধুকে ভুলেই গিয়েছ নাকি ?

মিষ্টি হেসে—কিন্তু সে হাসিতে যেন এক শাণিত বিদ্রূপ ছিল, শাহেদ বলে ঃ না ভাই, ভুলব কেন, বন্ধু হলে কি ভোলা যায় !

কথাটা সহজ তাও মুনিমের মনে হ'লো, সে কথার পেছনে কোথায় বেশ একটা মোলায়েম খোঁচা আছে।

ত্বরিত দৃষ্টিতে একবার মুনিম বন্ধুর বউয়ের দিকে তাকিয়ে নিল। সম্প্রতি তার যে কোনো গুরুতর অসুখ করেছিল তার চেহারা দেখে এখন সে কথা বুঝা ভার। আগেকার মতো তন্বীটিই আছে, বেতসলতার মতো কম্পমান তার দেহের সুষমা মুনিমের মনে এখনও কিছুটা ঘোর ধরিয়ে দেয়। সত্যি কি ওর অসুখ করেছিল, না ধার চাওয়ার বাহানা করে বন্ধু সে কথা লিখেছিল ?

মুনিম বন্ধুর বউয়ের দিকে ত্বরিত দৃষ্টিতে যে একবার তাকিয়ে নিলো তা রশীদা ত্বরিততর চোখে দেখতে পেয়েছিল। মনটা হঠাৎ রশীদার কেঁপে ওঠে। এই যে বাড়ী, এই যে হরেক রংয়ের কত ধরনের শাড়ী, এই যে হবু হবু গাড়ী—এগুলিই কি সত্যিকারভাবে সে চেয়েছিল, না অন্য কোনো কারণে ? তার মনে কখনই ছিল না সূক্ষ্ম কোনো অনুভূতি। সূক্ষ্মতর কোনো চাওয়ার সঙ্গে মুখোমুখি কোনো পরিচয় তার এ পর্যন্ত ঘটেনি। তবে সাড়ে তিনশ' টাকা মাইনে পাওয়া সাবডেপুটির পনেরো টাকা দামের মিলের শাড়ী পরা বউয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার একথাই মনে হ'লো যে, জীবনের কোনো জায়গায় সে যেন বড় এক মার খেয়েছে, অথচ ঠিক বুঝতে পারছে না।

চায়ের যখন জলসা তখন সবসময় এক দম্পতির কথাই ভাবা যায় না। বাধ্য হয়ে মুনিমকে আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়, যদিও বন্ধুজায়াকে গভীরতরভাবে পর্যবেক্ষণ করবার ইচ্ছে তার পুরোমাত্রায় ছিল। রশীদাকেও অন্য অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে হয় এবং সবসময় স্বামীর দিকে নজর রাখবার চেষ্টা তার ফলবতী হয় না।

জলসা যখন খতম হয়, বন্ধুকে মুনিম বলে ঃ আমাদের এখানে সামনের রোববারে খানা খেতে এস। তারপর সবচেয়ে মিষ্টি হাসি হেসে—অন্ততঃ সে

নিজে মনে করে সেটাই তার সবচেয়ে মিষ্টি হাসি, বন্ধুর বউকে বলে ঃ আপনিও আসছেন ত? বন্ধুর বউও মিষ্টি হাসির জবাব দেয় মিষ্টতর হাসি হেসে ঃ আপনি যদি আসতে বলেন আর আপনার বন্ধু যদি নিয়ে যান আসবো। এর মধ্যে রশীদা তাদের সামনে এসে শাহেদ ও তার বউ দু'জনকেই বলে, যেন তারা কত দিনের জানা আপন লোক ঃ যে ক'দিন আপনারা বাসা না পান আমাদের এখানে এসেই থাকুন না কেন। তারপর স্বামীর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলে ঃ তুমি কি বলো? স্তব্ধতার ভাব কৌশলের সঙ্গে গোপন রেখে মুনিম বলে ঃ এতে আমি আর কি বলবো, এলে ত ভালই হয়।

শাহেদ জিনিসটাকে মোলায়েমতার পর্যায়েই রেখে বলে ঃ না ভাই, এখন আর যাওয়া যাবে না, আমার প্রফেসর বন্ধুটি কিছুতেই ছাড়বে না।

ঈষৎ মেদাঙ্গিনী মাতৃত্বের পূর্বাভাস-স্বাক্ষরিতা রশীদার মধ্যেও সাময়িক-ভাবে কেমন করে যেন এক মসৃণতা আসে, তার স্থূল মনেও সূক্ষ্মতার এক ঝিলিক খেলে যায়। স্বামীর বন্ধুর দিকে তার আয়ত চোখের গভীরতা ছুঁড়ে মেরে বলে ঃ ইনিও ত আপনার বন্ধু, এক বন্ধুর এখান থেকে আর এক বন্ধুর ওখানে আসা এমন কি অশোভন? তারপর শাহেদের বউয়ের দিকে সখীর মতো হাত কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে ঃ কি বলেন ভাই, ঠিক না? সে শুধু মুচকি হাসে।

যাবার সময় বন্ধুকে মুনিম বলে ঃ রোববারে তোমার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দেব সাতটা নাগাদ। তারপর বন্ধুপত্নীর দিকে চেয়ে ঃ আপনিও আসবেন কিন্তু। শেষের কথাগুলি রশীদার বুকে কেমন যেন বাজে।

ধার করে আনা জীপে চড়ে যখন তারা বাসায় ফিরে যাচ্ছে, রশীদা স্বামীকে বলে ঃ তুমি যে বললে তাদের জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দেবে, গাড়ী আমাদের কই? তার এক অভাবনীয় জবাব দেয় মুনিম ঃ কেন গাড়ী নেই বলে মনে কি তোমার কোনো ক্ষোভ আছে? প্রশ্নটার ধরন একটু অতর্কিত বলে চট করে রশীদা তার জওয়াব দিতে পারে না। শুধু বলে ঃ কি কথার কি জওয়াব।

সারা পথ ধরে স্বামী-স্ত্রীতে আর কোনো কথা হয় না।

শনিবার বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে মুনিম রশীদাকে বলে ঃ শোনো এক ভালো খবর আছে। একটা আটচল্লিশ মডেলের পুরানো অষ্টিন পাওয়া যায়, দেখবে? তখন স্বামীর এই ব্যস্ততার পেছনে অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা, সে কথা ভাববার মতো অবকাশ রশীদার হয়নি, তাই সহজ স্ফূর্তির সঙ্গে তখনই বলল ঃ চলো এখনই দেখে আসি।

গাড়ীটা এক সাহেবের, দেশে ফিরে যাওয়ার সময় বিক্রি করে যেতে চায়। বলল, শুধু পনেরো হাজার মাইল চলেছে, ইঞ্জিনটা এখনো খাসা রয়েছে, পাঁচ হাজারে দিয়ে দেবে। যদি তারা চায় গাড়ীটা দু'তিনদিন পরখ করে দেখতে পারে, পছন্দ হলে এবং দরে বন্‌লে নেবে, নতুবা কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মোটামুটি গাড়ীটা তাদের পছন্দই হ'লো। তিনদিন চালিয়ে দেখা যাক কেমন কাজ দেয়, যদি বড় রকমের কোনো গোলমাল না করে তবে হাজার পাঁচেক টাকায় এ গাড়ী কেনা অসঙ্গত বোধ হয় হবে না।

গাড়ী অন্ততঃ তিনদিন রাখতে পারায় মস্ত এক সুবিধা হ'লো ঃ কাল সন্ধ্যায় এতে করে শাহেদ ও তার বউকে আনিয়ে নিতে পারবে। তখন শাহেদ ও তার বউ দু'জনেই দেখবে শাড়ী বাড়ী গাড়ী মিলে মুনিম ও রশীদার কি ঠাট-বহর। সেই ঠাট-বহর দেখে বন্ধুর নিভাঁজ তৃপ্তির ভাব ও তার বউয়ের শ্যামলী সুষমা অটুট থাকে কিনা সেও লক্ষ্য করবার জিনিস হবে।

রোববারের বিকেলের দিকে গাড়ীটা কিন্তু ষ্টার্ট নিল না। হাজারো চেষ্টা করেও মুনিম গাড়ীকে যখন চালু করতে পারলো না তখন এই ভেবে হাঁপিয়ে উঠলো, কি করে বন্ধু ও বন্ধুজায়াকে আনানো যায়। তাই শরণাপন্ন হ'লো রশীদার। সে সল্লাহ্ দেয়, সরকারী পুলিশ সুপার খান্‌কে ফোন্ করতে। তার হাতে নাকি দু'টা জীপ আছে। একটা কিছুক্ষণের জন্য হয়তো দিতে পারবে।

খানসাহেব ফোনে বললেন, জীপ পাওয়া যাবে, ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। জীপ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও মুনিমকে তেমন যেন খুশী মনে হ'লো না—তার দিকে এক পলক চেয়ে রশীদা অন্ততঃ তাই আঁচ করলো। বললে ঃ কেন জীপে বন্ধুদের আনতে কোনো

অসুবিধা হবে? কিছুক্ষণ স্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ করার পর মুনিম বলে ঃ নিজের গাড়ী পাঠিয়ে যা সুখ পরের জীপে কি তা হয়!

এবার কিন্তু রশীদা বড় তাড়াতাড়ি জবাব দেয় ঃ আসবে যারা তারাও যখন পর তখন জীপটা পরের হলে কিসের এমন ক্ষতি?

পুরুষ নিজের বন্ধুকে ঠিক পর ভাবতে পারে না। আর বন্ধু-জায়ার কথা পুরুষ কি ভাবে? রশীদার কথায় যে ঝিলিক ছিল তা মুনিমের মনকে কিছুক্ষণের জন্য অবশ করে দেয়, শীগ্‌গিরই সামলিয়ে নিয়ে বলে ঃ পর আপনের অত সূক্ষ্ম বিচারের কথা আজ তোমার মনে হ'লো কেন।

রশীদা আর সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার মনে করে না।

জীপ একাই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত মুনিম বন্ধুদের আনতে যায়। একবার রশীদাকে বলেছিল সঙ্গে আসতে। জবাবে কিন্তু সে, 'ঘরে অনেক কাজ আছে' সে-অজুহাতে আসতে রাজী হয়নি। মুনিম অবশ্য বুঝে উঠতে পারেনি কাজটা ঠিক কি। কারণ রাঁধবে ত রাঁধুনী, পরিবেশন করবে বেয়ারা, এর মধ্যে এমন কি বড় কাজ রশীদার পড়ে গেল? মুহূর্তের জন্য এ-কথাও তার মনে হয়েছিল,- ইচ্ছে করেই রশীদা তাকে একা ছেড়ে দিল, কিছুটা পরখ করবার এবং কিছুটা বাজিয়ে নেবার মতলবে।

অনেকদিন পর এই প্রথম মুনিম সরাসরি নিজের মনের দিকে তাকায়। তাকে অবশ্য জীপ চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হয় না। এটুকু সে বুঝতে পারে যে, বন্ধুকে তার দরকারের সময় পাঁচশ' টাকা দিয়ে সে সাহায্য করেনি বলে শাহেদের মনে তার প্রতি নিশ্চয় গভীর এক বিতৃষ্ণা আছে। এবং এও বোধ হয় ঠিক, সে বিতৃষ্ণা শুধু শাহেদের মনেই আবদ্ধ থাকেনি, তার বধূর মনেও সংক্রামিত হয়েছে। যতই মোলায়েমভাবে শাহেদ তার কথাগুলির জবাব দিক, যতই মিষ্টি হেসে তার বউ মুনিমের দাওয়াত গ্রহণ করুক, তবুও মনে মনে তার সম্বন্ধে কি তারা ভাবে, সেটা তার বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাদের দাওয়াত করবার পেছনে মুনিমের আসল উদ্দেশ্য এই যে, তার প্রতি তাদের মনে কোনো খাদ আছে কিনা সেটা বের করা। চায়ের জলসায় সে সুযোগটা ঠিক হয়নি।

আর যতই এ চিন্তাটা সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, সে বুঝতে পারে যে, বন্ধুর প্রতি অদ্ভুত এক ঈর্ষার ভাব তার মনে ঠাঁই পেয়েছে।

তার সঙ্গে বন্ধু-জায়ার তন্বী পেলবতার কতটা সম্পর্ক সে এখনও নিজের মনে যাচাই করে দেখেনি। তবে গত ক'দিন ধরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে হামেশাই তার মনে হয়েছে যে, শাহেদ ও তার বউ তাকে এবং রশীদাকে জীবনের গভীরতম এক খেলায় হারিয়ে দিয়েছে। সে হারাটা সত্যি কি মিথ্যা, আজ সে যাচাই করে দেখতে বদ্ধপরিকর।

প্রফেসর বন্ধুর বাড়ীর যে কামরায় শাহেদ ও তার বউ থাকে সেখানে তারা মুনিমকে ডেকে নিয়ে এলো। কামরাতে ঢুকেই তার নিরাভরণতাই মুনিমের চোখে প্রথম ধরা পড়ে। একটা তক্তপোষ—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বোধ হয় তাতে শোয়, তিন চারটে পুরনো বেতের চেয়ার, একটা ভাঙা বেতের টেবিল। কামরার এক কোণে ছোট একটা সস্তা দামের বিবর্ণ হয়ে যাওয়া আলনা—সেখানে পাইকারিভাবে শাড়ী তোয়ালে কামিজ মোজা ঝুলছে।

সে কামরায় আসবার আগে স্বামী-স্ত্রী বোধহয় মনের সুখে গল্প করছিল; কেউই যাওয়ার জন্য এখনও তৈরী হয়নি। বন্ধুজায়া হঠাৎ বলেঃ আপনার জন্য একটু সরবৎ নিয়ে আসি? আর মুনিমকে প্রতিবাদ করবার কোনো সুযোগ না দিয়েই সে ভিতরের দিকে চলে গেল।

বন্ধুকে এই প্রথম মুনিম একা পায়। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে বলেঃ আমি তোমাকে দরকারের সময় পাঁচশ' টাকা ধার দেইনি বলে নিশ্চয়ই মনে মনে তুমি আমাকে খুব ছোট ভাবছো।

—তা ছোট ভাববো কেন, টাকা না থাকলে টাকা দেবে কোত্থেকে? শাহেদ কথাটা যথাসম্ভব সহজ করে দিতে চায়।

—তুমি নিশ্চয় সে কথা বিশ্বাস করনি, ভেবেছ, যে-বন্ধু দালান ওঠাতে পারে, সে ইচ্ছা করলে দরকারের সময় তোমাকে নিশ্চয়ই পাঁচশ' টাকা ধার দিতে পারতো।

—থাক ভাই, ওসব কথা, দরকার এখন ত নাই, সে কথা তুলে কি হবে।—শাহেদের গলার স্বরে বিদ্বেষের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

নেবুর সরবৎ নিজের হাতে বয়ে এনে তস্তরীর উপর গ্লাসটা মুনিমের সামনে রেখে দিয়ে সহজ মিষ্টি হেসে বন্ধুজায়া বলেঃ আপনাকে খাতির করবার মতো আমাদের তেমন সামর্থ ত নেই, যদি কিছু মনে না করেন এ নেবুর সরবতটুকু খেয়ে ফেলুন।

তার কথাগুলি শুনে মুনিমের একবার মনে হয়েছিল কিছুটা তাতে যেন ব্যঙ্গের ভাব আছে ; কিন্তু খুশীতে জ্বলজ্বল-করা বন্ধুপত্নীর শ্যামলী পেলবতা লক্ষ্য করে তার মন থেকে সে সংশয় উড়ে যায়। মনে হয়, খুশীর ভরাট স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করে স্বামী-স্ত্রীর কেউই স্রোতস্বিনীর কোনো জায়গায় কোনো পঙ্কিল আবিলতা আছে কিনা, তার খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করে না। মুনিম বরং খুশীই হতো যদি তারা ভাবে-ব্যবহারে এ কথাটা তাকে বুঝিয়ে দিত যে, সে তাদের প্রীতি পাওয়ারও যোগ্য নয়। কিন্তু সরবৎ আনার পেছনে মনের এই যে সহজ অকুণ্ঠিত মাধুর্যতা, উপলব্ধি করে বন্ধুজায়ার দিকে বোবা বেদনায় সে চেয়ে থাকে।

খুব ঘটা করে রশীদা শাহেদ ও তার বউকে গাড়ী থেকে নামিয়ে সোজাসুজি তার ড্রইংরুমে নিয়ে যায়। রশীদার সাজবার মধ্যে বেশ একটা রুচির পরিচয় আছে, সচ্ছলতার আভাস ত থাকবেই। শাহেদের বউয়ের সাজ-গোজ লক্ষ্য করে নিজের প্রতি রশীদা বেশ প্রীতিই বোধ করে। তার তীক্ষ্ণ চোখে এড়ায় না—যে-মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ী শাহেদের বউয়ের পরনে, তা নতুন কেনা নয় ; গলায় একটা হার পরেছে বটে, তবে বড় সরু, হাতে যে কয়গাছি চুড়ি আছে সেগুলিও তাই ; সেগুলোর দামও পনেরো টাকার বেশী হবে না। সব মিলে তাই রশীদা বেশ খুশীই বোধ করে। সে খুশীর ভাব আরও বাড়ে যখন সে লক্ষ্য করে শাহেদ ও তার বউ দু'জনেই রশীদার মহার্ঘ আসবাবে-ভরা ড্রইংরুমের চারদিকে কৌতূহলী ও সপ্রশংসিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

খুশী হয়ে ওঠা মন অবশ্য হঠাৎ বড় দ'মে পড়ে, যখন সে দেখে বার-বারই ড্রইংরুমের আসবাব-পত্র থেকে স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টি পরস্পরের উপর নিবদ্ধ হচ্ছে, চোখে চোখে তারা অন্তরঙ্গ ধরনে কি যেন কথা বলছে। সে কথা বাইর থেকে আঁচ করা রশীদার পক্ষে যদিও মুশকিল, এটুকু সে বুঝতে পারে যে, তাতে তার ড্রইংরুমের আসবাব-পত্রের প্রতি কিছুটা কৃপার ভাব আছে। এ কৃপার ভাবের পিছনে তারা পরস্পরে যে কত খুশী সে কথাটাও যেন নিপুণভাবে উচ্চারিত হচ্ছে।

তার অস্বস্তি গভীরতর হয় যখন মুনিমের দিকে সে আড়চোখে চেয়ে দেখে। তার চেকনাই মুখে কেমন যেন এক স্তব্ধতার ভাব এসেছে।

মনে হয়, মসৃণ কোনো এক বিষাদে মন তার ছেয়ে গেছে। কি তার কারণ সেও রশীদা অনেকটা আঁচ করতে পারে যখন দেখে মুনিম অবকাশ পেলেই বন্ধুজায়ার দিকে কেমন এক বোবা আকুতিভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

স্পষ্ট সে বুঝতে পারে, শাহেদের সঙ্গে আচম্বিতে দেখা হওয়ার পর থেকেই মুনিম মনে মনে তার বউয়ের সঙ্গে রশীদার তুলনা করা আরম্ভ করেছে এবং সে তুলনার প্রতিযোগিতায় রশীদার বারংবার হার হয়েছে। এটা কেমন করে ঘটল সে ঠিক বুঝতে পারে না। রূপসী না হলেও কুরূপা তাকে কেউ বলবে না। কলেজ জীবনে এমনকি তার চোখের প্রশংসা তার বান্ধবীদের ভাইরা অনেকেই করেছে। একথা বান্ধবীদের মুখেই সে শুনেছে। আর মুনিমও ত তাকে দেখেশুনে, যাচাই করে তার প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে।

তারপর তাদের বাড়ী হয়েছে, বিত্তবান না হলেও চিত্তবান অনেক বন্ধু জুটেছে, সমাজের সিঁড়ির অনেক কয়টা ধাপ ডিঙিয়ে তারা এখন বেশ উপরের দিকেই আছে। দু'একদিনের ভেতরেই মোটামুটিভাবে একটা গাড়ীও হয়ে যাবে। তবুও কিনা এ পাঁচ বছর পরে মুনিম তার এক বন্ধুজায়ার দিকে বেদনাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ এ স্থূল সচ্ছলতা-পিয়াসীর মনের আনাচে-কানাচে গভীর এক হতাশা ও সূক্ষ্মতর এক ব্যর্থতার অনুভূতি ঘুরতে ঘুরতে তার সমস্ত অন্তরে অসহনীয় এক জ্বালা ধরিয়ে দেয়। মনে হয়, এ হাল্কা শিফনের শাড়ী তার সারা দেহে বিছুটির মতো হয়ে আছে, কানের হাল্কা দুল এখন যেন বিশমণি বোঝা, নূতন দালানের ভাঁজে ভাঁজে ঘুণ ও ফাটল ধরেছে, সখ করে যে মটর গাড়ী এনেছিল তা বোধ হয় কোনদিন আর ষ্টার্ট নেবে না;

এমন কি তাজ্জব হয়ে রশীদা আবিষ্কার করে পেটে যে ছেলে তার দেহের সমস্ত রস ও প্রাণশক্তি চুষে নিয়ে তাদের আর্থিক সচ্ছলতার মতোই ফেঁপে ফুলে উঠছে, সেও পরে শাড়ী বাড়ী গাড়ীর মতো—আর সেগুলির চেয়েও যা বড়, তার স্বামীর মতো—তাকে অভাবনীয়, অসম্ভব

এক প্রতারণা করবে। আর ধন-মান-দর্পিতা রশীদা এমনি করেই একদিন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বেয়ারা এসে বলে ঃ মেমসাহেব টেবিল লাগ্‌গিয়া। তাই ত, টেবিল যখন লেগে গেছে, তখন মনের সঙ্গে হিসেব নিকেশ করবার অবসর আর কই ?

এতদিনের অভ্যাস ও সংস্কার মুহূর্তের বেদনা-বোধে ভুললে ত চলবে না। তাই নিপুণভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অতি মিষ্টি ধরনে হেসে সে মেহমানদের বলে ঃ চলুন এবার খানা-কামরায় ; খাওয়া তৈরী।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

দুই তীর

প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় ক্যানভাসের ডেক চেয়ারে বসলে পায়ের সামনে আবদুল ঝুঁকে পড়ে তার জুতা-মোজা খোলে। ভৃত্যের এ-সেবায় আফসার উদ্দিন যে আনন্দ বোধ করে, তা নয়। বরঞ্চ, জুতা বাড়াতে গিয়ে প্রতিদিন কেমন জড়তা বোধ করে তার পা-দুটি পাথরের মত ভারী হয়ে উঠে। সে আশা করেছিলো নিত্যকার এ-সাহেবীয়ানা অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু এখনো হয় নাই। ভাবে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটাবে। তা-ও হয়ে ওঠে না।

আজও চাকরটি তার পাথরের মত ভারী পা-দুটি থেকে প্রথমে জুতা খোলে, তারপর মোজা। অন্যদিনের মত আজও আফসার উদ্দিনের দৃষ্টি পড়শীর বাড়ীর ছাদে নূতন করে চুন-দেয়া সিঁড়ি ঘরে নিবদ্ধ হলেও তার সমগ্র সত্তা ব্যস্ত-সমস্ত চাকরটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকে। আবদুলের তেল জবজবে চুলে যত্ন করে কাঁটা সিঁথি। চটপটে স্বল্পভাষী ছেলেটি নিত্যকার এই অনুষ্ঠানে অসাধারণ কিছু দেখতে পায় বলে মনে হয় না। বরঞ্চ, যেমন নিপুণভাবে সে কাজটি সম্পন্ন করে তাতে মনে হয়, কাজটি করে সে তৃপ্তি বোধ করে, হয়তো গৌরবও।

এবার আফসার উদ্দিনের পায়ের পাশে কালো চামড়ার চটি রেখে জুতা-মোজা হাতে আবদুল ক্ষীপ্রগতিতে ভেতরে চলে যায়। আফসার উদ্দিন জানে, জুতা জোড়াটি তুলে রাখার আগে তাতে সে একবার বুরুশ দিবে, মোজাজোড়াটা আলগোছে শুঁকে দেখে পেছনের বারান্দায় ক্লীপ দিয়ে ঝুলিয়ে দেবে। রোজ মোজা বদলাবার মত আর্থিক অবস্থা আফসার উদ্দিনের এখনো হয়নি।

দু-বছর আগে কেউ আফসার উদ্দিনের জুতা খুলতো না। বস্তুত একটি মানুষের দিকে পা বাড়িয়ে দেবে এমন কথা তখন সে কল্পনাও করতে পারতো না। তখন সে মেসবাড়ীর হাওয়াবদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বাস করতো। তার ঘরের দেয়ালে আর্দ্রতাজাত মানচিত্রের মত নক্সাটি এখনো সে স্পষ্ট দেখতে পায়। এমন কী মনে হয়, হাত বাড়ালেই সে যেন দেয়ালটা ছুঁতে পারবে। তারপর নড়বড়ে চৌকিটা, ডালে তেলে-পোকা, খিতখিতে ঠাণ্ডা ভাত, আনোনা তরকারী, পচা মাছ, ঘোলাটে গ্লাসে পানি—কিছুই তার বর্তমান খোলা মেলা উজ্জ্বল জীবনে ম্লান হয়ে যায় নাই। আমাশা রোগগ্রস্ত সঙ্গীটি আজ কোথায় সে জানে না। যে-জীবন আফসার উদ্দিন পশ্চাতে ফেলে এসেছে, হয়ত তার দৃঢ় আলিঙ্গনে এখনো সে আবদ্ধ। কিন্তু মেসবাড়ির জীবনের মত আজ সে অদৃশ্য হয়ে গেলেও আফসার উদ্দিনের মন থেকে সে অদৃশ্য হয়ে যায় নাই। মেসঘরের দেয়ালের আর্দ্রতাজাত নক্সাটির মত তার মুখমণ্ডলের প্রতিটি রেখা, তার প্রতি ভাব-ভঙ্গী বা মুদ্রাদোষ নিয়ে সে-মানুষটি তার মানসপটে প্রখর সুস্পষ্টতায় বিদ্যমান। যে-মানুষের সঙ্গে হয়তো সে আর কখনো একই ঘরে রাত্রি-যাপন করবে না, সে-মানুষ স্বভাবগত ক্ষুদ্র পদক্ষেপে এখনো তার পদানুসরণ করে চলেছে, আত্মীয়তা বন্ধুত্বের দাবী না করেও তার সঙ্গ সে ছাড়ে নাই। তবু মানুষটির যে একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে তা নয়। সে মেসবাড়ির জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। আসবাবপত্রের তুলনায় তার স্মৃতিটা যদি উজ্জ্বলতর মনে হয়, তার কারণ সে মানুষ, প্রাণহীন বস্তু নয়।

আফসার উদ্দিন জানে, যে-জীবন সে ছেড়ে এসেছে, সে-জীবনের প্রতি তার কোন মমতা নাই। থাকার কথা নয়। দারিদ্র-জর্জরিত সে-জীবনে লোভনীয়-আদরনীয় কিছু নাই। তবু বিগত জীবন এখনো ঘনিষ্ঠ মনে হয়। হয়তো সে-জন্যেই দু-বছরব্যাপী প্রচেষ্টার পরেও সে তার নূতন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে নাই। তার আবরনই কেবল গ্রহণ করেছে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় নাই। তার নক্সা অবলম্বন করেছে, আইন-কানুনও অম্লান বদনে মেনে চলেছে, কিন্তু সে-জীবন তার রক্তে মাংসে এখনো বাসা বাঁধে নাই। সে যখন শ্রান্তিতে ডেকচেয়ারে গা এলিয়ে

দেয় তখন সে সত্যি শ্রান্তিবোধ করে না ; তখন সে তার বর্তমান জীবনের আচার-ব্যবহারের একটা নির্দেশই কেবল পালন করে।

তবু এ-সব কথা তাকে বিচলিত করে না। সে জানে জীবনের ধারা পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়। তার বর্তমান জীবন সম্পর্কে সে যে তার সচেতনতা এখনো হারায় নাই, তাও বোধগম্য। কিন্তু একটি ব্যাপার তাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। তার মনে হয়, তার যে-সুদিন এসেছে সে-সুদিন তার মনের গভীর কোন অঞ্চলে কেমন একটা ভয়-শঙ্কার সৃষ্টি করে। সে বোঝে না, তার যথার্থতাও দেখে না। এ-বিষয়ে তার সন্দেহ নাই যে, তার দারিদ্র্যের সত্যি অবসান ঘটেছে। ভাগ্য বশে এবং যোগ্যতা-অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে-জীবনে সে প্রবেশ করেছে সে-জীবন সমস্যা উৎকণ্ঠা-উদ্বেগশূন্য না হলেও আর্থিক অভাব-অনটন দুঃখ-কষ্টের ছায়া নাই। তবে সে অস্ফুট ভয়-শঙ্কার কারণ কী?

আফসার উদ্দিন লম্বা-চওড়া লোক। এবার সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়েই সার্ট-গেঞ্জি খোলে। নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে যেমন রোজ হয়, তার গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে একাকার।

—আবদুল। সে গম্ভীর ভারিক্কি গলায় ডাকে। এ গলাও যেন তার নূতন জীবনের নক্সামাফিক।

ধূসর রঙের মোজা জোড়া ততক্ষণে বারান্দায় ঝোলানো হয়েছে। তাই আবদুল ছুটে আসে। আসবার সময় নিত্যকার মত আলনা থেকে মোটা তোয়ালেটা নিয়ে আসে। সেটা দিয়ে এবার সে তার মনিবের দেহের নগ্ন উপরাংশ সজোরে ঘষতে থাকে। দেহের সে অংশে অশেষ লোমরাশি। তাতে টান পড়লে মাঝে-মাঝে আফসার উদ্দিন নাক দিয়ে আওয়াজ করে।

দেহ শুকালে সে চাকরের দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করে,

বিবি সাহেব উঠেছেন?

জি না।

আফসার উদ্দিন গোসলখানার দিকে রওনা হয়। বারান্দা অতিক্রম করবার সময় শূন্য আকাশে অকস্মাৎ মেঘের আবির্ভাবের মত তার মনে একটা ছায়া জেগে ওঠে। তার মনে হয়, তার স্ত্রী হাসিনাই যেন তার

সে অস্ফুট ভয়-শঙ্কা এবং তার বর্তমান জীবন সম্পর্কে সচেতনতার কারণ। দুই জীবনের মধ্যে যে-পুল, সে-পুলের মধ্যখানে হাত বাড়িয়ে পথরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী।

এমন কথা সে কখনো ভাবে নাই। তাই সে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থাকে।

আফসার উদ্দিনের শ্বশুর আরশাদ আলী এবং তার মরহুম ওয়ালেদ আরবার আলী উভয়ই উচ্চপদস্থ চাকুরে ছিলেন। অবশ্য চাকুরীর কথা তাঁদের জন্যে একটি বড় কথা নয়। তাদের বংশ পূর্ববঙ্গে সুপরিচিত খানদানী বংশ। সে খানদানী আবার অর্থ সম্পদে পোস্তাবন্দি, যে অর্থসম্পদ ইদানীং চা-বাগান কলকারখানায় টাকা খাটানোর ফলে বিশেষভাবে বৃদ্ধিলাভই করেছে।

আরশাদ আলী সাহেবের কখনো আর্থিক দৈন্য না থাকলেও জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি খুশী হতে পারেন নাই। সে-ক্ষেত্র তাঁর পারিবারিক জীবন। তাঁর স্ত্রী মরিয়ম খান নিজেরই খালাতো বোন; বঙ্গদেশে খানদানী মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক বিবাহটা অত্যন্ত সাধারণ। তাঁরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে হোক, বা মরিয়ম খানমের মেজাজ অতিশয় রুক্ষ ধরনের বলেই হোক, তাদের মধ্যে কখনো বনিবনা হয় নাই। তাঁদের একমাত্র ছেলেটির মৃত্যু ঘটলে মরিয়ম সাহেবা আলাদা হয়ে গিয়ে তাঁর বাপের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। আরশাদ আলী তখনও চাকুরীতে নিযুক্ত বলে তার মফস্বল ভ্রমণ শেষ হয় নাই। তাসবাজী করে, কালোয়াতী গানের আসর বসিয়ে এবং শিকার-পিকনিক করেও যখন তাঁর জীবনের নিঃসঙ্গতা কাটলো না তখন তাঁর মরুভূমির মত জীবনে একটা মরুদ্যান সৃষ্টির প্রয়াসে তিনি ছয় বছরের মেয়ে হাসিনাকে তার কার্যস্থলে নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে মরিয়ম খানমের মত পাওয়া সহজ হয় নাই, তাঁকে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়।

ফিরতি পথে ট্রেনের নির্জন কামরায় বসে কতক্ষণ তিনি মেয়ের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটা অকস্মাৎ উদ্বেলিত স্নেহে তাঁর চোখ ছল ছল করে ওঠে। নিজেকে সংযত করে তিনি বলেন,

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসতে নাই। ইঞ্জিনের ছাই চোখে এসে পড়তে পারে।

মেয়েটি নড়ে না; তাঁর কথা শোনে বলেও মনে হয় না। একটু অপেক্ষা করে সজোরে কেশে তিনি বলেন,

এখানে আয়। ইঙ্গিতে তাঁর পাশে একটি স্থান তিনি দেখান।

মেয়েটি জানালায় থুৎনি রেখে তেমনি বসে থাকে, নড়ে না, উত্তর দেয় না। তবে তিনি লক্ষ্য করেন, ছয় বছরের মেয়েটির চোখে কেমন একটা ভাব যেন। একটু উদ্ধত ভাব, কিসের ধারও তাতে।

আরশাদ আলী এবার একটা বই খুলে পড়তে শুরু করেন। হাসিনা জানালাতে মুখ রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে।

হাসিনা তাঁর সঙ্গে বেশীদিন থাকে নাই। আরশাদ আলী ভেবেছিলেন, পাথুরে পাহাড়ে দণ্ডায়মান বৃক্ষ যেমন পাকে-প্রকারে রস সংগ্রহ করে, তেমনি তিনিও তার শূন্য জীবন হতে একটু স্নেহরস আদায় করবেন। তাঁর সে-বাসনা পূর্ণ হয় না। ক-দিন যেতেই তিনি বুঝলেন, মেয়েটির মধ্যে তার মায়ের রক্ত যেন। একটুতে সে রেগে খুন হয়ে যায়, একটু গোঁ ধরলে কারো সাধ্য নাই গোঁ ছাড়ায়। চাকরানী-আয়া হদ্দ হয়ে যায়, তিনিও যে তাকে শাসন করতে বিশেষ সক্ষম তা নয়। তারপর একদিন একটি অব্যক্তব্য কারণে হাসিনা সকাল থেকে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে উৎকট কান্না শুরু করে। সন্ত্রস্ত হয়ে আয়া তাঁকে আপিসে খবর দেয়। তিনি ছুটে আসেন, অসুখ বিসুখ হয়েছে ভয় করে ডাক্তার ডাকেন, রূপকথার বাদশাহের মত মেয়েকে সমগ্র রাজ্য প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু কিছুতেই হাসিনার কান্না ধরেনা। গভীর রাত পর্যন্ত সে থেকে থেকে কাঁদতেই থাকে।

পরদিন মেয়েকে নিয়ে ট্রেন ধরেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছলে তাঁর স্ত্রী মরিয়ম খানমের মুখে বিজয়িনীর ধাঁরালো হাসি জেগে ওঠে। সে-হাসি উপেক্ষা করে আরশাদ আলী বলেন,

আমার অনেক কাজ। হাসিনাকে দেখার সময় হয়না।

মরিয়ম খানম একটা অবিশ্বাসের আওয়াজ করেন। তারপর ক্ষীপ্রগতিতে মাথায় কাপড় তুলে মেয়েকে প্রশ্ন করেন,

এত রোগা হয়েছিস, কেন? তোর বাপ তোকে খেতে দেয় নি?

আরশাদ মেয়ের উত্তরের জন্য সামান্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করেন। আশা করেন, মেয়েটি তাঁর অশেষ আদর যত্নের কথা বলবে। কিন্তু এ সময়ে কি একটা কথা তার মনে পড়ায় সে হঠাৎ একটা নাচন দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। হয়তো প্রশ্নটির উত্তর দিতে চায় না সে।

একটু নীরব থেকে আরশাদ আলী নিম্ন গলায় বলেন,

মায়ের মেজাজ পেয়েছে মেয়ে।

সব মেয়ের দোষ—বলে মরিয়ম খানম আবার ঘোমটা টানেন।

দোষ যারই হোক, আশা করি বড় হলে তার স্বভাবটা বদলাবে।

মরিয়ম খানম অত্যাশ্চর্য ধৈর্যের পরিচয় দেন। অনুত্তেজিত কণ্ঠে কেবল বলেন,

আপনার ট্রেন ক'টায়?

স্বামী সহসা উত্তর দেয় না। মনে হয় তাঁর মুখে একটা ছায়া নাবে। তারপর ঈষৎ চমকে উঠে বলেন,

সাড়ে পাঁচটায়।

তবে চায়ের কথা বলি।

ফিরতি ট্রেনের সময় যে বেশী দূরে নয়, তা দু-জনের কাছেই নিঃসন্দেহে সুখবর বলে মনে হয়।

হাসিনা মায়ের কাছে থেকেই বড় হয়। সে দীর্ঘ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী যুবতীতে রূপান্তরিত হয়। তার স্বভাবের উগ্রতা-রুক্ষতা কমে না, নব-যৌবনের লাবণ্য-কোমলতাও একটি উদ্ধত ভাবে ঢাকা পড়ে থাকে। ততদিনে আরশাদ আলী পেনশন নিয়ে দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ-সময়ে তাঁর স্ত্রী মরিয়ম খানমের মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। সারাজীবন যে-সংগ্রামে তিনি লিপ্ত ছিলেন তা হয়তো অকস্মাৎ অর্থহীন মনে হয় বলেই তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। তবে তাঁদের মধ্যে এবার যে একটা সচ্ছন্দ অনাবিল দাম্পত্য জীবন প্রবাহিত হতে থাকে, তা নয়। একত্রে বসবাস করেও তাঁরা কেমন আলাদা হয়ে থাকেন। সংঘর্ষের হেতু যেমন তাঁরা দেখতে পান না, তেমনি মিলনের প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেন না। একই বাড়িতে থেকে

কী ভাবে পরস্পরকে এড়ানো যায় বা কীভাবে পরস্পরের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকা যায় সে-কলাকৌশল ততদিনে তাঁরা দু'জনেই রপ্ত করেছেন। তাঁদের শোবার ঘর যে আলাদা, শুধু তাই নয়। আরশাদ আলী দিনের অধিকাংশ সময় আপন ঘরে বা প্রশস্ত বারান্দায় হুকার নল হাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন; অভ্যন্তরে মরিয়ম খানমও তাঁর নিজস্ব জীবনে ডুবে থাকেন।

অবসর জীবনের এই অলস, সময়বহুল দিনে আরশাদ আলীর মনে অর্থশালী খানদানী বংশের প্রতি বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা এবং অনাস্থার সৃষ্টি হয়। তিনি ভাবেন, জীবন থেকে তিনি কোনই তৃপ্তি লাভ করেন নাই; জীবন তাঁকে শূন্য পাত্রই ফিরিয়ে দিয়েছে। তার জন্যে তিনি তাঁর পরিবারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তাঁর এই দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, যাদের জীবন-সংগ্রামের কোন অভিজ্ঞতা নাই, প্রভূত অর্থ-সম্পদ আয়েস-বিলাসের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা অন্তঃসারশূন্য। যারা মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত, জীবনের সুধাপান করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এ-সময়ে নানা খানদান পরিবার থেকে হাসিনার সাদির প্রস্তাব আসতে থাকে। তাঁর পরিবার সম্বন্ধে নূতন ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে সে-প্রস্তাবে কান না দিয়ে আরশাদ আলী অন্য কোথাও হাসিনার জন্য দুলা খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে তিনি একদিন আফসার উদ্দিনকে আবিষ্কার করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হয়, তিনি যেন একটি অমূল্য রত্ন খুঁজে পেয়েছেন। ছেলে দেখতে শুনতে ভালো, ভালো চাকুরীও করে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, জীবন যুদ্ধে একাই লড়াই করে সে বড় হয়েছে, শত বাধাবিপত্তি ঠেলে সে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জীবনের মর্ম যদি কেউ বুঝে থাকে, তা এমন মানুষই বোঝে এবং তাদের সামনেই জীবন তার গুপ্তদ্বার উন্মুখ করে! অনতিবিলম্বে তিনি স্থির করেন আফসার উদ্দিনের হাতেই হাসিনাকে সমর্পণ করবেন। বলাবাহুল্য মরিয়ম খানম এ বিয়েতে তাঁর মত দেন নাই। তবে তিনি যতই বিরোধিতা করেন ততই আরশাদ আলীর সংকল্প বজ্রকঠিন হয়। বিরোধিতা বাক-বিতণ্ডে হয়রান হয়ে মরিয়ম খানম অবশেষে নীরব হলে তাঁর নীরবতাকে

সম্মতি বলে গ্রহণ করে আরশাদ আলী শীঘ্র তার সংকল্পকে কার্যে রূপান্তরিত করেন।

বিয়ের দু'দিন পরে আরশাদ আলী নূতন জামাইকে ডেকে পাঠান। আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে যুবক তাঁর পাশে একটি চেয়ারে বসলে তিনি অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকেন। মনে হয় যে কথা তিনি বলবার জন্যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তার বলার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু সবটা বলা সম্ভব নয়। কী বলবেন তিনি ?

অবশেষে গলা সাফ করে তিনি বললেন,

হাসিনার সম্বন্ধে একটা কথা তোমাকে বলা কর্তব্য।

উৎসুক্য না দেখিয়ে ধীর-স্থির দৃষ্টিতে নূতন জামাই শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমার মেয়েটি আদরের মধ্যে বড় হয়েছে। স্নেহ-মমতা বা অর্থের কোনই অভাব সে কখনো বোধ করে নাই। তাই জীবন সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নাই। সে-কথাটা মনে রেখো।

নূতন জামাই চলে গেলে আরশাদ আলী ভাবেন, তিনি পৈতৃক কর্তব্য সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি অসীম তৃপ্তিই বোধ করেন। জামাইকে যা তিনি বলেছেন তা অতিশয় সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর সন্দেহ থাকে না যে, তার মর্ম আফসার উদ্দিন বুঝবে।

বাইরে সান্ধ্য হাওয়া জেগেছে। পেছনের বারান্দায় দড়িতে ধূসর রঙের মোজা জোড়া সে-হাওয়ায় দোলে। গোসলের পর হাওয়াটি অতি স্নিগ্ধ মধুর মনে হয়। নিমীলিত চোখে ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আফসার উদ্দিন ভাবে।

হাসিনাকে ভালোবাসতে তার সময় লাগে নাই। বরঞ্চ কেমন ঝড়ের মতই সে-ভালোবাসাটা জাগে। জাগে কিছুটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, কিছুটা তার অন্তরের প্রেমক্ষুধার গভীর হাহাকারের মধ্যে দিয়ে। তার মনে হয়, সে যেন অকস্মাৎ একটি বিস্ময়কর সুন্দর জগৎ আবিষ্কার করেছে। তবে প্রথম ভাবোচ্ছ্বাসটা কাটলে আফসার উদ্দিন ক্রমশঃ একটি বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠে। সে বুঝতে পারে, যে-ভাবোচ্ছ্বাসটা পৃথিবী গ্রাসী মনে হয়েছিলো, আসলে তা তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুধু তাই নয়,

সে-ভাবোচ্ছ্বাস কেমন একটা শীতল উঠানে সশব্দে আছড়ে পড়ে যেন। কোন প্রতিধ্বনি জাগে তো তার তা কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি। হাসিনা উদাসীন, কেমন শক্ত শীতলও। গভীরভাবে লজ্জিত হয়ে আফসার উদ্দিন নিজেকে সংযত করে। তারপর থেকে সে-সংযম তাদের মধ্যে একটি প্রাচীরেই পরিণত হয়।

বারান্দায় ছায়া অগ্রসর হতে শুরু করেছে। সামনের মাঠে সূর্যের ম্লান আলো, ঘাসের রঙ গাঢ় হয়ে উঠেছে। আফসার উদ্দিন একটি সিগারেট ধরায়। তারপর ডাকে,

আবদুল।

আবদুল যেন দেয়ালের মধ্যে মিলিয়েছিল; তাকে কেবল দৃশ্যমান হতে হয়।

বিবি সাহেব ওঠেন নাই?

চাকরটি উত্তর না দিলে সে বুঝতে পারে, হাসিনার ঘুম এখনো ভাঙে নাই।

আফসার উদ্দিন ঘন ঘন কয়েক বার সিগারেট টানে। তারপর অন্তরের কোথাও ক্রোধের উষ্ণতা বোধ করে।

একটু পরে সে উঠে দাঁড়ায়। সশব্দে বারান্দা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করে। হয়তো আশা করে যে, তার পায়ের শব্দেই হাসিনা জেগে উঠবে; তাকে ডেকে তুলতে হবে না। খাটের সামনে পৌঁছে একটু ইতস্ততঃ করে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাসিনার চুল বালিশে-বিছানায় ছড়িয়ে আছে; গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তার মুখের তৃতীয়াংশ বালিশে ডুবে আছে। যে-অংশটি দেখা যায়, সে-অংশে তার স্বাভাবিক উগ্রতাটি চোখে পড়ে না। শুরুতে বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে হাসিনার উগ্রতার বিষয়ে সে কেমন একটা গর্বই বোধ করতো।

হাসিনাকে ডাকতে হয়।

কত ঘুমাবে? সন্ধ্যা উতরে গেলো। চা খাবে না?

প্রথমে হাসিনার মধ্যে কোন সাড়া দেখা যায় না। কিন্তু একটু পরে তার চোখে যেন একটু কম্পন জাগে। পর মুহূর্তে হঠাৎ সোজা হয়ে উপরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে চোখ খোলে। আফসার উদ্দিন আশা

করে হাসিনা একবার তার দিকে তাকাবে। কিন্তু তার দৃষ্টি তুলে রাখা মশারির উপরই নিবদ্ধ থাকে। তার চোখে একটু অসন্তুষ্টির ভাব।

কেবল রাত দিন ঘুমাও। কথাটি বলে বিরক্তির শব্দ করে পূর্ববৎ সশব্দে আফসার উদ্দিন বেরিয়ে যায়। বারান্দায় পোঁছে হেঁকে বলে,

চা দাও।

অদৃশ্য আবদুল চা আনতে যায়।

চা-পানের সময় আড়চোখে একবার হাসিনার ভাবভঙ্গী দেখে আফসার উদ্দিন সকালের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে মনোনিবেশ করে। চা-পান শেষ হলে ভেতরে গিয়ে মোকাসিন জুতা পরে নেয়। বারান্দায় আবার বেরিয়ে হাসিনার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করে,

ক্লাবে যাবে?

না। শরীরটা কেমন মেজ মেজ করছে।

অত ঘুমালে করবে না?

হাসিনা উত্তর দেয় না। আফসার উদ্দিন অবশ্য কোন উত্তর আশা করে নাই। এবার সে একাকী ক্লাবের দিকে রওনা হয়।

মফস্বল-শহরের ক্লাব; সেখানে তাসের চেয়ে আড্ডাই বেশী জমে। আজ আফসার উদ্দিন কথা বলার কোন ইচ্ছা বোধ করে না বলে তিনজন তাস-বাজী সভ্য পেয়ে খুশীই হয়। বাইরে কেমন মেঘ করে উঠেছে। সে ভাবে, তাসটা আজ জমবে। মাসের শুরু বলে পকেটে টাকার থলেটাও মন্দ ভারী নয়।

কচিৎ-কখনো আফসার উদ্দিন একাকী তাস খেলে বটে তবে বেশী রাত করেনা। আজ তার ব্যতিক্রম হয়। আজ তাসে তার নেশা ধরে। এক সময় উঠবে বলে মনস্থির করলেও শেষ পর্যন্ত ওঠা হয়না, কারণ আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। যখন বৃষ্টি ধরে, তখন তারা নূতন রাবারে মশগুল।

অনেক রাতে খেলা শেষ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে টর্চের আলো ফেলে আফসার উদ্দিন অবশেষে যখন ঘরমুখো হয়, তখন সহসা একটি প্রশ্ন তার মনে জাগে। সে কী এত রাত পর্যন্ত খেলার নেশাতেই এমন মত্ত হয়ে ছিলো।

প্রশ্নটি ঘাঁটিয়ে দেখবার সাহস হয়না বলে তার উত্তর সে পায় না। পিচ্ছিল পথে সে মনোনিবেশ করে।

ক্লাবে দুই দফা চা-কাটলেট হয়েছে। তাই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ছায়ার মত আবদুল দেখা দিলেও সে না খেয়ে কাপড় বদলে সন্তর্পণে মশারি তুলে বিছানায় প্রবেশ করে। ঘরের কোনে মৃদুভাবে একটি লণ্ঠন জ্বলে। তার স্তিমিত আলোয় সে একবার হাসিনার দিকে তাকায়। তার মুখ সে দেখতে পায় না। কিন্তু অন্যদিনের মত তার চুল আজ বালিশ-বিছানায় ছড়িয়ে নাই। মনে হয় সে যেন ঘুমিয়ে নাই। ঘুমিয়ে থাকলেও সবেমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। সে কী আফসার উদ্দিনের জন্যে অপেক্ষা করছিলো? অবশ্য প্রশ্নটি মনে জাগতেই সে বোঝে, তা সত্য হতে পারে না। তবু একটা আশা তার মনের প্রান্তে ভাসা-ভাসা ভাবে জেগে থাকে।

আশাটা ভেঙ্গে চুরমার হতে বেশী দেরী হয়না। শীঘ্র নীরব ঘরে হাসিনার কণ্ঠ শোনা যায়। তার মুখ থেকে যে-শব্দগুলি বের হয়, সে-শব্দগুলি পাথরের মত ভারী, পাথরের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ। সে বলে,

আমার ঘুম নিয়ে কথা বলেন তা আমার ভালো লাগে না।

আফসার উদ্দিন সহসা উত্তর দেয় না। প্রথমে সে মনের নীরবতার মধ্যে অস্পষ্ট আশাটি কাঁচের পাত্রের মত ভেঙ্গে পড়তে শোনে, তারপর হয়তো একখণ্ড কাঁচের ধারালো অংশে খোঁচা লাগলে সে একটু আহতও হয়। একটু পরে সে বলে,

কেন বলি, তা তুমি জানো।

হাসিনা এবার কোন উত্তর দেয় না।

আফসার উদ্দিন বোঝে, সে যে-উক্তিটা করে তার মর্ম হাসিনা ভালো করে বোঝে বলেই নীরব হয়ে থাকা সে সমীচীন মনে করে। বস্তুত, হাসিনা এ-সব কথার ফাঁকে কখনো ধরা পড়তে চায় না। কলহের অবকাশ নাই তাদের এই নিরলম্ব দাম্পত্য জীবনে।

হাসিনা উত্তর দেবেনা জেনেও আফসার উদ্দিন অপেক্ষা করে। নীরবতা অখণ্ড থাকলে তার অন্তরে একটা ক্রোধের সঞ্চার হয়। পাশে সামান্য শব্দ হয়, হাসিনার হাতের চুড়িতে ঝঙ্কার উঠে। তার দিকে না তাকিয়েও আফসার উদ্দিন বুঝতে পারে, হাসিনা একটু নড়েচড়ে একটা আরামদায়ক

অবস্থান আবিষ্কার করে নিদ্রার জন্যে তৈরী হচ্ছে। নিঃসন্দেহে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়বে।

তার মনে ক্রোধ জাগলেও সে-ক্রোধ তার ঘুমের পথে বাধা সৃষ্টি করে না। সে-ক্রোধের পশ্চাতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মান-অভিমান নাই। তাই তার নিদ্রা সম্পর্কে আফসার উদ্দিনের উক্তিটি তার মনে ক্রোধের সৃষ্টি করলেও সংকোচ আনে না।

অকস্মাৎ আফসার উদ্দিন মনস্থির করে, হাসিনা ঘুমিয়ে পড়ার আগেই আজ তাকে কিছু কথা মন খুলে বলবে। কতদিন আর তাদের দাম্পত্য জীবনের এই প্রহসন চলবে ?

এক সময়ে আফসার উদ্দিন বিশ্বাস করতো, সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত নরনারীর মধ্যে বিয়ের পরে একটু প্রেম-ভালোবাসার সঞ্চার না-হওয়াটা প্রকৃতির রীতিবিরুদ্ধ। আজ তার সে-বিশ্বাস আর অবিচল নয়। তার প্রতি যে হাসিনার মনে স্নেহ মমতা ভালোবাসার উদয় হবে, সে-আশা নেহাৎই ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। তার ভাবাবেগ হাসিনার মনে কোন রেখাপাত করে নাই ; ভবিষ্যতে যে করবে সে-কথায় আর ভরসা পায়না। আফসার উদ্দিনের মনেও হাসিনার প্রতি ভাবাবেগে ভাটি পড়েছে, তার স্নেহ-মমতার উৎস কেমন শুকিয়ে উঠেছে। হয়তো শীঘ্র এমন একদিন আসবে যখন সে-উৎস সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যাবে। তখন সে শুষ্ক স্থানে ঘৃণা বিদ্বেষই কী জন্মাবে না ?

বিয়ের পর আফসার উদ্দিন অনেক কিছু আশা করেছিলো। যতটা আশা করেছিলো ততটা যুক্তিসঙ্গত নয় তা সে নিজেই বোঝে। সে-আশায় রঙিন কল্পনার বিন্যাস ছিলো। বস্তুত সে জানে যে, আসল দাম্পত্য জীবন নাটক-নভেল নয় ; সে-জীবন কেবল ভাব প্রবণতার উপরে গড়া যায় না। আদর্শ দাম্পত্য প্রেম অতিশয় গুরুতর ব্যাপার। সেখানে রঙ্গরস বা প্রকাশ্য ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান তো নাই-ই, সে-সব সত্যিকার দাম্পত্য প্রেমের মর্যাদা হানিও করে। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবনে না এসেছে একটু রঙ্গরসের ছিটেফোঁটা, না পড়েছে প্রেমের বন্ধনগ্রন্থী। তাদের এ-দাম্পত্য জীবনের অভ্যন্তরে কিছু নাই। সেখানে ক্ষুদ্রতম বীজও পড়ে

নাই যে কেউ এ-আশা পোষণ করতে পারে একদিন সে-বীজ ফুল-ফলে সমৃদ্ধ ছায়াশীতল বৃক্ষে রূপান্তরিত হবে।

এ সব কথা আফসার উদ্দিনের মনে ক্রমশঃ একটি গভীর নিরাশার সৃষ্টি করে। তবে যে-কথা তাকে সবচেয়ে বেশী বিচলিত করে সে-কথা এই: কেন তার প্রতি হাসিনার মনে সামান্য স্নেহ-মমতার আভাষও দেখা দেয় নাই? এ-প্রশ্নের কোন বোধগম্য উত্তর সে খুঁজে পায় না। তবে একটা সন্দেহ জাগে কেবল। বিয়ের প্রাক্কালে একটা খবর আকারে-ইঙ্গিতে শুনলেও তা তার কানে পোঁছেছিলো। সে-খবরটি এই যে, তাদের বিয়েতে আরশাদ আলী সাহেব ব্যতীত আর কারো মত ছিলো না। এ-ব্যাপারে হাসিনার কী মত তা জানবার প্রয়োজন বাকবিতণ্ডা-বুদ্ধিযুদ্ধে লিপ্ত পারবার বোধ করে নাই। তবু হাসিনার নিশ্চয় একটা মত ছিলো। বিরুদ্ধদলের শীর্ষ ছিলেন মরিয়ম খানম। তাঁরই হাতে হাসিনার শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁরই ঘরে সে প্রতিপালিত। অতএব মেয়ে যদি মায়েরই মত পোষণ করে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তার মতটি সে যদি গোপন রাখে তার কারণ এই যে, মায়ের অমতে বিয়েটা ঘটতে পারে তা সে ভাবতে পারে নাই। অসম্ভবটাই অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যে পরিণত হলে শেষ মুহূর্তে তার বিরোধিতায় কোন লাভ হবে না বুঝে সে হয়তো নীরব থাকা যুক্তি-সঙ্গত মনে করে। তবে সে-মত এখন তার প্রেমশূন্য-তায় প্রকাশ পাচ্ছে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও আজ সে এ কথা জানাতে চায়, মরিয়ম খানমের মেয়েরও এ-বিয়েতে মত ছিলো না।

আরশাদ আলীর বিপক্ষদলের কেন এ-বিয়েতে মত ছিলো না সে-কথাও আফসার উদ্দিন ভাসা-ভাসা শুনতে পেয়েছিলো। যা শুনে নাই তা কল্পনা করে নিতে তার অসুবিধা হয় নাই। বিপক্ষ দলের আপত্তির কারণ ছিলো আফসার উদ্দিনের দারিদ্র্য জর্জরিত অতি সাধারণ পারিবারিক পটভূমি। সে যে কঠোর জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে সে-পটভূমিকে পশ্চাতে ফেলে আসতে সক্ষম হয়েছে, তাতে তাদের আভিজাত্য-সচেতন মন গলে নাই।

তার পূর্বপরিচয়ই কী হাসিনার প্রেমহীনতার কারণ?

আরেকটি কথাও অন্যান্য খবরের মত অস্পষ্টভাবেই আফসার উদ্দিন স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলো। তা আরশাদ আলী মরিয়ম খানমের অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা। তাঁর দাম্পত্য কলহের বা আজীবন মনোমালিন্যের কারণ সে জানে না। তবে কখনো-কখনো তার মনে হয়, যে-দ্বন্দ্ব তাঁদের জীবনকে বিষাক্ত করেছিলো, তার ছায়া তাদের জীবনেও যেন প্রতিফলিত হয়েছে। হাসিনা কী তার মায়ের দ্বন্দ্বই বহন করে চলেছে ?

হয়তো এ-সব আফসার উদ্দিনের খেয়াল মাত্র। হয়তো হাসিনার অক্ষমতার কারণ একটি অতি সোজা উত্তরের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এমনই তার মানসিক গঠন যে তার পক্ষে কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। যে-পরিবারে সে মানুষ হয়েছে সে-পরিবারে কেউ কাউকে ভালোবাসতে শেখায় না, ভালোবাসার প্রয়োজনও কেউ বোধ করেনা। হাসিনা হয়তো দাম্পত্য জীবনকে অন্যান্য সামাজিক প্রথার মতই দেখে; সে জীবন যে স্নেহ-ভালোবাসা আশা-আকাঙ্খার সূত্রে বাঁধা দুটি মানুষের যুগ্ম জীবন, তা সে জানে না। ভালোবাসার প্রয়োজন কী সত্যিই আছে ? কলহ-বিবাদ-শূন্য দাম্পত্য জীবনই কী মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয় ? আফসার উদ্দিন এ-বিষয়ে কী করে নিশ্চিত হতে পারে যে, স্নেহ-মমতা ভালোবাসার জন্যে সে যে অদম্য তীক্ষ্ণ ক্ষুধা বোধ করে সে-ক্ষুধা স্বাভাবিক নয় ? হয়তো অধিকাংশ মানুষ কখনো সে-ক্ষুধা বোধ করে না, দাম্পত্য জীবনে প্রেম, ভালোবাসার প্রয়োজনও কখনো দেখে না। এমন মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে, যশ মান অর্থও অর্জন করে।

আফসার উদ্দিন পিঠে শুয়ে স্থির হয়ে থাকে। সে অনুভব করে, তার পিঠ ঘামে ভিজে সারা। কিন্তু সে নড়ে না। মনে হয়, একটু নড়লে যেন ইট-পাথরের স্তূপের মত তার ভাবনা-চিন্তা সশব্দে ছড়িয়ে পড়বে। গভীর নীরবতার মধ্যে রাত অগ্রসর হয়। কিন্তু তার মনে হয়, রাত্রির কালো-মসৃণ মুহূর্তগুলি কেমন তার ভেতরটা কাঁটার মত বিদ্ধ করে করে যাচ্ছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রাত্রিও সজারুর মত সূচ খুলে আছে। একটু পরে খোলা জানালা দিয়ে হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে মশারি দুলিয়ে যায়, তার কিছু সিক্ত-শীতলতা ভেতরেও প্রবেশ করে।

এ-ক্ষণিক চঞ্চলতার মধ্যে আফসার উদ্দিন একবার মুখ ফিরিয়ে হাসিনার দিকে তাকায়। তার চুলে এখনো শৃঙ্খলতা আসে নাই বটে কিন্তু কোমরের কাছে ঝুলে থাকা হাতটা কেমন অবশ মনে হয়। সে বুঝতে পারে, যে-সব কথা তাকে বলবে বলে মনস্থির করেছিলো, তা আজ আর বলা হবে না।

তাতে তার কিন্তু দুঃখ হয় না। কারণ সে বুঝতে পারে যে, সে-সব কথা বলা সহজ নয়। বলতে গেলে তার অন্তরটাই সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ করতে হবে তাকে। তেমন ভাবে মনকে উলঙ্গ করার সাহস তার আর নাই যেন। যে-মানুষ এত কাছে শুয়েও এত দূরে সে-মানুষকে সে কী করে তার অন্তর দেখায়? যে-মানুষ তার প্রতি এমন গভীরভাবে উদাসীন, তাকে কী করে তার মনের ক্ষুধার কথা বলে, কী করেই বা বলে তার ভয়-শঙ্কার কথা।

তাছাড়া তার ক্ষুধার বা তার ভয়-শঙ্কার অর্থও যেন সে নিজেই আর বোঝে না। বুঝতে হলে স্নেহ-মমতা সমবেদনার প্রয়োজন আছে।

তারপর এক সময়ে কালো রাত্রির অন্ধকার তার অন্তরে প্রবেশ করে, জাগ্রতের সচেতনতা স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়। বিছানার উষ্ণতা, পিঠের তলে ঘাম, ঘরের হাওয়াশূন্যতা সে অনুভব করে, তবু মনে স্বপ্নের বিচরণ শুরু হয়। বাস্তব যখন অবাস্তবে মিলিয়ে যায়, তখন মনের গুপ্ত হাহাকারও নির্বাধায় নিরাবরণে চলাচল শুরু করে। সে-মুহূর্তকে তার বড় ভয়, তবু তাকে এড়াতে সে পারে না। সে কী ঘুমিয়ে? সে-কথা সে জানে না। সারা দেহ অবশ হয়ে থাকে। তবু চিন্তাস্রোতে মনের দুইকূল ভেসে যায়, সমস্ত সংযম ভেঙ্গে পাশে শায়িতা হাসিনাকে আর দেখতে পায় না বটে, তবু হাসিনা তারই চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেন। তার কালো চুলরাশি, তার লাবণ্যময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দীর্ঘকায়া সৌন্দর্য, তার দুর্লভ ক্ষীণ মাধুর্যময় হাসি—সবই সে একই সময় দেখতে পায়, অনুভব করতে সক্ষম হয়। হাসিনা তার দিকে বিশেষ ভাবে না তাকালেও তার দৃষ্টি পাথরের মত নিষ্প্রাণ, নিরাসক্ত নয়। তারপর কালো রাত্রির বন্যা আরো দুর্বার হয়ে উঠে, তার অশ্রান্ত প্রবাহ মুখর হয়ে উঠে সহস্র ভাষায়, তারপর সে-বন্যা মাদকতা আনে, ক্ষমাও আনে। বন্যা অবশেষে নিঃশেষ হলে কেবল একটি সজল

ক্ষমাই ভেসে থাকে আফসার উদ্দিনের বিহ্বল মনে। ক্ষমা ছাড়া মানুষের পক্ষে কী বাঁচা সম্ভব ?

শীঘ্র আফসার উদ্দিনের একটি হাত নক্ষত্রের মত ছিটকে পড়ে, তারপর সে-হাত অধীরভাবে আরেকটি হাতের সন্ধান করে। কালো রাত্রির বন্যা থেমেছে কিন্তু তার মনের নির্মুক্ত হাহাকার অদম্যভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। এখনো সে হাসিনাকে দেখতে পায়। হাসিনার চোখে নূতন দৃষ্টি। সে চোখে আর বিদ্রূপ নাই। আফসার উদ্দিনের মনে যে-ক্ষুধা, সে-ক্ষুধার প্রতি আর বিদ্রূপ নাই। যে-অন্ধকারে কালো রাত্রির জন্ম হয়, যেখানে তার দুর্বার বন্যার সৃষ্টি হয়, সে-ক্ষুধাটির জন্ম হয় বলে কেউ তাকে বিদ্রূপ করতে পারে না। তাছাড়া, হাসিনার চোখেও ক্ষমা। ক্ষমা ছাড়া মানুষ কী করে বাঁচে ? হাসিনার চুলের স্নিগ্ধ-মধুর গন্ধে তার নাসারন্ধ্র ভরে যায়। দুর্দান্ত হাওয়ায় চুলরাশি ওড়ে তার শিশুর মত মুখের চতুর্দিকে। তার মুখেও নির্মল সৌরভ। দূরে শত সহস্র তারা ঝক ঝক করে। আফসার উদ্দিনের কঠোর জীবনযুদ্ধ, তার প্রশংসনীয় অধ্যবসায়, তার দুঃখকষ্ট অকথ্য শ্রম ক্লান্তি, এবং অবশেষে তার কৃতিত্বময় জয়-সাফল্য—কিছুই অর্থহীন নয়। সে-সব মরীচিকার মত শুষ্ক মরুভূমিতে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয় নাই। তার ভয়-শঙ্কার কারণ নেহাৎই ভিত্তিহীন।

কালো রাত্রি আবার বন্যা হয়ে আসে। কিন্তু এবার সে বন্যা ঝরণার মধুর কলতানের মত শোনায়, অশ্রুর মত স্নিগ্ধ সজল মনে হয়।

হাসিনা জানে, সার্থকতার চেয়েও যা মানুষ প্রাণপণে কামনা করে, তা বাঁচবার পথ। মানুষ বাঁচতে চায় কেবল। সে বড় নিঃসঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতায় মানুষ বাঁচতে পারেনা। অদম্য আশা নিয়ে মানুষ যে-নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সে-সংগ্রামে পরাজিত হলে তারপর তার আর কিছু থাকে না।

যখন সে ভাবে পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি অবস্থান-প্রতিপত্তির জন্যে সে সংগ্রাম করছে, তখন বস্তুত তার উদ্দেশ্য কেবল পথহীন সীমাহীন নিঃসঙ্গতার হাত হতে মুক্তি পাওয়া। হাসিনার সুন্দর মুখ সহস্র তারার মত ঝকমক করে। সে-মুখের দিকে তাকাতে আর সঙ্কোচ হয় না আফসার উদ্দিনের।

তারপর গভীর অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠ জাগে। প্রথমে আফসার উদ্দিন কিছু চমকিত হয়। সে চোখ খুলে মশারির উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সেখানে জাল নেই বলে অসচ্ছ কাপড়ে তার দৃষ্টি থেমে যায়। ঘরে হাওয়া নাই। গভীর রাত পূর্ববৎ স্তব্ধ হয়ে আছে। কেবল দূরে কোথাও একটা রাতপাখী বিষণ্নকণ্ঠে ডাকে। সে বুঝতে পারে, তার চোখে নিদ্রার লেশমাত্র নাই, তার মনটাও একটা অকস্মাৎ আঘাতে সম্পূর্ণভাবে সজাগ হয়ে উঠেছে।

ততক্ষণে হাসিনা আবার পাশ ফিরে শুয়েছে। সে-যে বিছানা ত্যাগ করে নাই, সেইটাই আশ্চর্য মনে হয়। গ্রীষ্মরাতের উষ্ণতা সম্পর্কে রুক্ষ কণ্ঠে মন্তব্য করে ঝট্‌কা দিয়ে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলো। তাতে রাতের বুকে যে অদৃশ্য ঢেউ জেগেছিলো, সে ঢেউ এখনো যেন মিলিয়ে যায় নাই।

বড় গরম বৈ কী। আপন মনেই হাসিনার মন্তব্যের পুনরুক্তি করে আফসার উদ্দিন। কিন্তু কথাটা অস্বীকার করতে পারে না।

এবার প্রগাঢ় নিশব্দতার মধ্যে ঘরের কোণে টেবিলের উপর স্থাপিত ঘড়িটির টিক্‌টিক্ আওয়াজটা কানে আসে। দূরে রাতপাখীটি ডেকেই চলে।

আফসার উদ্দিন বোঝে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তবু রাত্রির কালো বন্যার কথা স্মরণ হয় তার। সেটি অসত্য নয়। হয়তো ঘুমটা ছিলো মনের এক প্রকারের কৌশল আচ্ছাদন। হাসিনার কাছে সে ঘুমের দোহাই দেবে কী? না। তা যেন পাপ-স্বীকৃতির মতই শোনাবে। অবশেষে আফসার উদ্দিন কিছুই বলে না। বরঞ্চ দেহ প্রাণে সে নিথর হয়ে থাকে। ভেতরে কোথাও লজ্জা, অনুশোচনা এবং ক্রোধের একটি মিশ্রিত অনুভূতি তাকে নিপীড়িত করে। তারপর সে অপ্রীতিকর অনুভূতিও একটি বিচিত্র কাঠিন্যে জমে যায়।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে আফসার উদ্দিন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে আকাশে স্তরের পর স্তর মেঘ জমে আছে। মশারির জালের মধ্য দিয়ে সে-মেঘসম্ভার বেদনাভরা স্মৃতির মত মনে হয়। তবু তা যেন অতি দূরে। এত দূরে যে তার দিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তাকানো যায়। আজ ঘুম

ভাঙ্গতে দেরী হয়েছে জেনেও সে বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

ক্রমশঃ তার চোখে সব কিছু কেমন অবাস্তব হয়ে ওঠে, মনের অতলে যে-কাঠিন্য এখনো সে বোধ করে, সে-কাঠিন্য ভারশূন্য হয়ে পড়ে। মনে হয়, শুধু তার দাম্পত্য জীবনই নয়, সমগ্র জীবনই নিরলম্ব হয়ে উঠেছে।

হাসিনা আজ সকালেই শয্যা ত্যাগ করেছে। আফসার উদ্দিনকে খুশী করার জন্যই যে হাসিনা আজ সকালে উঠেছে, সে-কথা সে অন্যদিন ভাবতে পারতো, আজ আর পারে না। বস্তুত বিছানার পাশে শূন্যতাটি আজ তাকে স্পর্শই করেনা। তাদের মধ্যে শেষ সূত্রটি যখন ছিন্ন হয়েছে তখন হাসিনার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি তার কার্যকলাপ ভাব অনুভূতির আর কোন অর্থ নাই।

বিশেষ কলহ-বিবাদ ছাড়া বাকবিতণ্ড প্রকাশ্য মনোমালিন্য ছাড়া অতি নিঃশব্দে সে সূত্রটি ছিন্ন হয়েছে।

হাসিনা একটু পরে ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে শোবার ঘরে প্রবেশ করে। তার পায়ের আওয়াজ শোনে আফসার উদ্দিন কিন্তু তার দিকে তাকায় না। হাসিনা পুরোনো আমলের একটি ক্ষুদ্র ড্রেসিং টেবিলের সামনে চুল আঁচড়াতে বসে। মেঘের মতই তাকে অতি দূরে মনে হয়।

না, ধরতে গেলে কিছুই হয় নাই। তবু নিঃসন্দেহে সর্বশেষ সূত্রটি কাটা পড়েছে। হাসিনার চরম উদাসীনতার কারণ জানবার কোন কৌতূহল সে আর বোধ করে না।

মশারি সরিয়ে উঠে দ্রুত পদে আফসার উদ্দিন পেছনের ছায়া-শীতল বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে। আবদুল শীঘ্র এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে তার সামনে একটি নড়বড়ে, রঙচটা গোল বেতের টেবিলে রাখে। তাতে এক চুমুক দিয়ে সে নিম্ন গলায় বলে,

আজ দুপুরে টুওরে যাবো।

সফরে যাবে তা বারান্দায় এসে বসবার পরেই হঠাৎ সে স্থির করে। হঠাৎ কোথাও যাবার তাগিদ বোধ করে সে। বর্ষার পরে নেয়ামতগঞ্জের বাঁধের মেরামতের কাজটা শুরু করতে হবে। ভেবেছিলো দু'সপ্তাহের

মধ্যে যাবে। আজই গেলে ক্ষতি কী। উপরওয়ালার কাছে একটা তার পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

মনার মাকে বলে দিও রাতে এসে থাকতে। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আবদুলকে আবার বলে। সে যখন সফরে যায়, তখন মনার মা তাদের শোবার ঘরের পাশে ছোট ঘরটিতে রাত্রিবাস করে।

অনেক বেলা হয়েছে। এবার ক্ষীপ্রগতিতে উঠে আফসার উদ্দিন গোসলখানার দিকে রওনা হয়।

স্বামী-স্ত্রী এক সাথে সকালের নাস্তা খায়। আজও চোখাচোখি হয় না, সে-কথা আফসার উদ্দিনের আজ খেয়াল হয় না।

উঠবার আগে সে নিম্ন-গলায় বলে,

আজ দুপুরে টুওরে যাচ্ছি। আবদুল মনার মাকে খবর দেবে।

ক-দিনের জন্যে সে যাচ্ছে তা হাসিনা জিজ্ঞাসা করে না। নিজে থেকেই আফসার উদ্দিন বলে,

পরশু ফিরবো।

পোষ্টম্যান ডাক নিয়ে আসে। দুটি চিঠি হাসিনার জন্যে, তার জন্যে একটি। হাসিনার চিঠি দুটি এগিয়ে দিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েই সে তার চিঠিটি খোলে। কিন্তু পড়তে শুরু করলে অক্ষরগুলির উপর দিয়ে দৃষ্টি ভেসে যায়। সে ভাবে, দাম্পত্য জীবনের প্রহসন শেষ হয়েছে কিন্তু এ-কাহিনীর অন্ত কোথায়, কোথায়ই বা যবনিকা পড়বে?

সে-প্রশ্নের উত্তর সে পায় না। তবে একটি বিষয়ে সে নিশ্চিত বোধ করে। তার জীবন সে মরুভূমির ওপর সৃষ্টি করবে না। মরুভূমিতে প্রবেশ করবার জন্যেই সে কঠোর অধ্যবসায়ের সঙ্গে এত কষ্ট শ্রম করে মানুষ হয় নাই। কথাটা ভেবে মনে একটি বিচিত্র শান্তিই সে বোধ করে। আশা-আকাঙ্খার ঝড় অবশেষে থেমেছে, হেঁয়ালি ভাঙ্গার অদম্য কৌতুহলেরও অবসান ঘটেছে। তাছাড়া তার মনে হয়, তার পরাজয় হয় নাই।

সে আপন মনে বলে, আমি আরশাদ আলী সাহেব নই। আমরা একই ধাতুতে তৈরী নই।

কথাটা নিজের কাছেই একটু বিচিত্র ঠেকে। তবে তা বিশ্লেষণ করে দেখার কোন তাগিদ বোধ করে না। আজ সে একটি পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে আপন অস্তিত্ব ফিরে পেয়েছে। সে-অস্তিত্বটি প্রশ্ন-বিশ্লেষণে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায় না সে।

এবার তার হাতের চিঠির অক্ষরগুলি অর্থগম্য রূপ ধারণ করে। চিঠিটা তার মায়ের। মায়ের মানে তাঁর জবানের কথা যা শব্দের আকার নিয়েছে একজন সামান্য শিক্ষিত আত্মীয়ের হাতে। চিঠিতে সুখবর কিছুই নাই। কোনদিনই থাকে না। শারিরীক অসুস্থতার কথা, সাংসারিক অভাব-অভিযোগের কথা অন্যদিনের মত আজও সে-চিঠির বিষয়বস্তু।

চিঠিতে দ্রুতভাবে একবার চোখ বুলিয়ে তা টেবিলে রাখতে গিয়ে সে ক্ষীপ্রভাবে তুলে নিয়ে পাতলুনের জেব-এ ঢুকিয়ে দেয়। আজ সে-চিঠি হাসিনার চোখের সামনে ফেলে যেতে সংকোচ হয়। তার হাসিনা আজ সত্যিই পরনারীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

দুপুরে টিফিন ক্যারিয়ার-এ করে অফিসে খাবার আসে, বেডিং সুটকেস সোজা ষ্টেশনে যায়। আপিস থেকেই গাড়ী ধরতে যায় আফসার উদ্দিন।

দু-দিনের জায়গায় তিনদিন পরে প্রত্যাবর্তন করে বাড়ীতে পা দেবে এমন সময় আফসার উদ্দিন হাসিনার উচ্চ হাসির আওয়াজ শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বারান্দায় উঠলে আবদুল বলে,

বিবি সাহেবের আম্মা এসেছেন।

ভেতরে হাসিনার হাসি তখনো থামে নাই। কয়েক মুহূর্ত সে অত্যাশ্চর্য হাসি শুনে আফসার উদ্দিন প্রশ্ন করে,

কবে এসেছেন?

গত রাতে। একটু থেমে চাপরাশীর হাত থেকে সুটকেস বিছানা নিয়ে আবদুল আলগোছে বলে, বিবি সাহেব তার পাঠিয়েছিলেন!

পরে শাশুড়ি-জামাইতে সাক্ষাৎ হয়। মরিয়ম খানম মাথায় কাপড় তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে একটি গাম্ভীর্য নামে। কেবল হাসিনার মুখে একটা তরল, স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বলতা জেগে থাকে। মা-মেয়ের মুখভাব ভিন্ন হলেও এবং তাদের বয়সের অনেক বিভেদ থাকলেও দু'জনের চেহারায়

একটি স্পষ্ট সাদৃশ্য আফসার উদ্দিন আজ লক্ষ্য না করে পারে না। তবে তাতে বিচলিত হবার কোন কারণ থাকলেও আজ সে বিচলিত হয় না। যে-কাঠিন্য নিঃসঙ্গতাবোধ নিয়ে সেদিন সে সফরে বেরিয়েছিলো, সে-কাঠিন্য নিঃসঙ্গতা নিয়েই সে ফিরেছে।

ভদ্রতা মাফিক দু-একটা কুশল প্রশ্ন-উত্তরের পরেই সে-সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ শেষ হয়।

রাতে খাবারের সময় মা-মেয়ে দু'জনকে অতিশয় গম্ভীর মনে হয়। মরিয়ম খানমের মাথায় ঘোমটা, হাসিনার মুখে গাম্ভীর্যের আচ্ছাদন। সে-ই যে তাদের গাম্ভীর্যের কারণ সে-কথা বুঝে নত মাথায় সে ক্ষীপ্র ভাবে খাওয়ায় মনোনিবেশ করে। তারপর এক সময়ে বিনাড়াম্বরে হাসিনা নিম্নকণ্ঠে হঠাৎ ঘোষণা করে,

কাল দুপুরের ট্রেনে আম্মার সাথে যাচ্ছি।

মুহূর্তের জন্যে খোদাভক্তিতে মরিয়ম খানমের চোখ ঊর্ধ্বপানে নিক্ষিপ্ত হয়। গদগদ কণ্ঠে বলে,

ইন্‌শাআল্লাহ।

সে রাতে স্বামী-স্ত্রীতে একটি শব্দেরও বিনিময় হয় না। শুধু পরদিন সকালে হাসিনা বিছানা ছেড়ে উঠে যাবে এমন সময় আফসার উদ্দিন উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেই বলে,

একটা কথা বলতে চাই।

বলে অনুমতি প্রার্থনার ভঙ্গীতেই থামে। হাসিনার পিঠ তার দিকে। একবার মাথায় একটু ঝাঁকানি দিয়ে সে তার চুল সিধা করে, তারপর নিঃশব্দে বসে অপেক্ষা করে। যাবার দিনে হয়তো সে একটু বদান্যতার প্রয়োজন বোধ করে।

আমার দোষ কী জানি না। তোমাদের কেউ আমাকে সে-কথা বলো নাই।

পিঠ সোজা করে বসে হাসিনা নিশ্চল হয়ে থাকে। আবার একটু অপেক্ষা করে আফসার উদ্দিন বলে,

আমার কোন দোষ আমি দেখতেই পাই না। সেটা স্বাভাবিক। তবে শোধরাবার মত দোষঘাট শোধরাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবার জন্যে

তৈরী ছিলাম। অবশ্য এখন সে-কথা নিষ্প্রয়োজন। তবু যাবার আগে কথাটা তোমার জেনে যাওয়া উচিত।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর হাসিনা এবার বলে,

সে-কথা আগেও একবার বলেছেন।

সামান্য রক্তিমাভা দেখা দেয় আফসার উদ্দিনের মুখে। তবে সংযত কণ্ঠেই সে উত্তর দেয়,

প্রথমবার তুমি উত্তর দেও নাই বলে আবার বললাম।

হাসিনার মন্তব্যে যতটা সে অসন্তুষ্ট না হয় ততটা হয় এই দেখে যে, সে যে অতীতকাল ব্যবহার করেছে তা হাসিনা লক্ষ্য করে নাই।

হাসিনা পিঠ সোজা রেখেই কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকে। তারপর সহসা বলে,

কী বলবো জানিনা।

তার কণ্ঠে কেমন একটা নিঃসহায় ভাব। মনে হয়, সত্যিই সে জানে না। কী রহস্যময় আদেশ নির্দেশে তাদের চিন্তাধারা কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তা সে জানে না।

এবার আফসার উদ্দিন নীরব হয়ে থাকলে একটু অপেক্ষা করে হাসিনা উঠে চলে যায় অন্য ঘরে। সে-ঘরে মরিয়ম খানম তখন জায়নামাজে বসে ওজিফা পড়ায় মগ্ন।

দুপুরের ট্রেনে নিত্য ভীড় হয়। গাড়ী-প্লাটফর্ম লোকে-লোকারণ্য তবে প্রথম শ্রেণীর সামনে একটু ফাঁকা-ফাঁকা ভাব। সামনে দিয়ে আসা যাওয়া আছে কিন্তু আফসার উদ্দিন ব্যতীত দাঁড়িয়ে নেই কেউ। দরজার পাশে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে কড়া রৌদ্রের জন্যে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে সে মানুষের সন্ত্রস্ত চলাচল দেখে। তার কানটা সজাগ হয়ে থাকে তৃতীয় ঘণ্টার জন্যে।

প্রথম শ্রেণীতে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে মা ও মেয়ে বসে। হাসিনার পরনে উজ্জ্বল লাল শাড়ী। মরিয়ম খানমের দেহ কালো বোরখায় আবৃত। কেবল তাঁর মুখটি উন্মুক্ত। সে-মুখ দিনের আলোয় রক্তহীন, ফ্যাকাশে এবং ভাবশূন্য দেখায়। আড়চোখে আফসার উদ্দিন একবার হাসিনার দিকে তাকায়। তার মুখের পার্শ্বদিকটাই কেবল

নজরে পড়ে। মায়ের মুখের মত তার মুখও ভাবশূন্য। তবে দুপুর বেলার উজ্জ্বল সূর্যালোক তার লাবণ্যময় ত্বকে প্রতিফলিত হয় বলে তার ভাবশূন্যতা তত চোখে পড়ে না। ট্রেন এখনো ছাড়েনি, তবু মনে হয় ইতিমধ্যে অতিদূরে কোথাও তারা পৌঁছে গেছে।

হঠাৎ আফসার উদ্দিনের মন বিস্ময়ে ভরে উঠে। কোথায় যাচ্ছে মরিয়ম খানম এবং হাসিনা, কীই বা তাদের জীবনের লক্ষ্যস্থান, কোথায়ই বা তাদের আশা-আকাঙ্খার মণিমুক্তা লুকিয়ে ?

দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আফসার উদ্দিন আবার লোক চলাচল দেখে।

জনস্রোতের ওপর যখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ তখন সহসা একটি অপ্রত্যাশিত বিষয়ে সে সচেতন হয়ে উঠে। মরিয়ম খানমের পাশে বসেই হাসিনা হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং তার নিরাসক্ত মুখে ভীষণ দ্বন্দ্বের উপস্থিত হয়েছে। ক্রমশঃ সে-চাঞ্চল্য এবং দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার কী মত বদলেছে ? সে কী ট্রেন থেকে নেমে আসবে ? হাসিনার দিকে তাকাবার একটি প্রবল বাসনা বোধ করে আফসার উদ্দিন, কিন্তু দৃঢ় হস্তে সে-বাসনা সে দমন করে। তাকাবার সময় এখনো আসে নাই। তবে তার বুকে যে-স্পন্দন জাগে সে স্পন্দন সে থামাতে পারে না। তাদের শেষ সূত্রটি কী সত্যিই ছিন্ন হয় নাই ? হাসিনা কী সহসা বুঝতে পেরেছে যে, যে-মনোরম দুর্গে সে আবদ্ধ সে-দুর্গে তাদের সযত্নে পালিত জীবনটি পথে ফেলে দেওয়া রসশূন্য নারকেলের মত অন্তসারশূন্য, সে-দুর্গে এত আলো থাকলেও আসলে সেখানে ঘন তমিস্রা, যে-বিশ্বাসে একদিন তাদের স্বপ্নসৌধটি নির্মাণ করেছিলো সে-বিশ্বাস সামান্য ধুঁয়ার চেয়ে বেশী বাস্তব নয় এবং মানুষের হৃদয়ের চরম ক্ষুধা কেবল চোখের ওপর পর্দা টেনেই জয় করা যায় না ?

মনে হয় হাসিনা নেবেই আসবে। তার পাশে কালো বোরখায় আবৃত মরিয়ম খানমের চোখে ভীতি জেগেছে, তাঁর নিশ্চয়তার ভাব খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়েছে! কিন্তু হাসিনার চোখ তাঁর দিকে নাই। সে নেবেই আসবে। আফসার উদ্দিনের বুকের স্পন্দন আরো দ্রুত হয়ে ওঠে। হাসিনা নেবে এসে তার সামনে দাঁড়ালে সে কী করবে ? যখন দেখবে হাসিনার সে-মুখ আর সে-মুখ নাই, সে-চোখ আর সে চোখ নাই, তখন তাকে সে কী বলবে ?

সে জানে না। ভাববার সময় কোথায় ? হঠাৎ মনে যে-ঝড় উঠেছে সে-ঝড়ে সব কিছু শুকনো পাতার মত উড়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে সে আসছে আসুক। তিন ধাপে সিঁড়ি, তারপর কালো কঙ্কর ছড়ানো প্লাটফর্ম। সেখানেই নূতন জীবনের সূত্রপাত হবে।

তারপর তৃতীয় ঘণ্টা পড়ে, গার্ডের সুতীক্ষ্ণ বাঁশিও কাছাকাছি কোথাও শোনা যায়। বিস্মিত হয়ে আফসার উদ্দিন তাকায় ট্রেনের জানালার দিকে। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। তারপর কেমন একটা ঘূর্ণীবর্তের মধ্যেই একটি লাল শাড়ী ঝলমল করে ওঠে। একটা মুখও ভেসে ওঠে। সে-মুখ তার দিকে তাকায়, বোধহয় ভাবশূন্যতার মধ্যে নীরস ভদ্রতার একটা ক্ষীণ হাসি জাগে। তারপর হয়তো মরিয়ম খানমের কালো বোরখা ভেসে ওঠে। সেখানেও একটি মুখ ফিরে তাকায়। ঘূর্ণীবর্ত পুচ্ছ নাচায়।

প্লাটফর্মের শেষে রেলপথ হঠাৎ ডান দিকে মোড় নেয়। সে-বাঁকে ট্রেন শীঘ্র অদৃশ্য হয়ে গেলেও আফসার উদ্দিন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ ভাবে। তার মুখে যেন ঘামের স্রোত বইছে। তার চোখের সামনে লাল ও কালো রঙের ঢেউ তখনো থামে নাই।

অবশেষে আফসার উদ্দিন সুস্থির হলে এবার শান্ত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে সে সুস্পষ্টভাবে একটি মুখ দেখতে পায়। সে মুখ হাসিনার নয়, মরিয়ম খানমেরও নয়! সে-মুখ আরশাদ আলী সাহেবের। তাঁর বয়স-ক্লান্ত মুখে যেন গভীর পরাজয়ের ছায়া।

শাহেদ আলি

জিব্রাইলের ডানা

আজিমপুর হয়ে যে রাস্তাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চলে গেছে, তারি বাঁ-পাশে, গাছ-পালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট্ট কুটীর। ঘরের মেটে দেয়ালগুলোর উপরিভাগ গলে গেছে অনেক দিন—রোদ-বৃষ্টি আর হাওয়ার অবারিত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরানো টিনের সুরাখ দিয়ে দেখা যায় নীল আসমানের ছিটে-ফোঁটা।

মা ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিয়ে।

সন্ধ্যেবেলা হালিমা খুবই মেরেছিলো নবীকে। আট বছর গিয়ে ন'বছরে পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে। কাজ না শিখলে দিন-গুজরানের উপায় থাকবে না। নবীকে দুধের বাচ্চা রেখেই বাপ তার ইন্তেকাল করেছে। একা হালিমা কী-ইবা করতে পারে তার জন্যে?—নিজের পেট পালতেই সাত বাড়ী ঘুরতে হয় তার; কাজ না পেলে ভিক্ষে করতে হয় এবং সন্ধ্যে বেলা গিয়ে বসে থাকতে হয় গোরস্তানের গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান খয়রাত করে, তাদের কাছ থেকে দু'চার পয়সা হালিমার বরাতেও জুটে যায় কখনো-কখনো। নবী অবশ্যি বিনে মাইনেই বিড়ির দোকানে কাজ করে, দোকানী শুধু দুপুর বেলা একবার খেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা হয়ে ওঠেনি বিড়ি বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে মাস-মাস পাঁচ টাকা করে পাবে দোকানীর কাছ থেকে।

কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু করেছে আজকাল,—কোনো অছিলায় দোকান থেকে বেরিয়েই সে যে কোথায় চলে যায় কেউ বলতে

পারে না। সন্ধ্যে পর্যন্ত আর দেখাই মিলে না তার। এ নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে—আজ তাকে হুশিয়ার করে দিয়েছে, সে কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর,—অমন দুষ্টু ছেলেকে দিয়ে দরকার নেই তার। সারাটা বিকেল গোস্বায় আগুন হয়েছিলো হালিমা—ছেলে যদি কোনো কাজ না শিখে, তার কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে আজকের দুনিয়ায়? অথচ, ছেলে এমনি মগড়া যে এদিকে মনই বসে না তার। মন বসবেই বা কেন?—মা তো রয়েছে তার জন্যে ভিক্ষা করতে—বাঁদিগিরি করতে! সন্ধ্যায় নবী বাড়ী ফেরবার সংগে সংগেই হালিমা ধুম ধুম করে কতগুলো কিল বসিয়ে দেয় নবীর পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী?—জানতে পীড়াপীড়ি করেছিলো হালিমা, কিন্তু নবীর কাছ থেকে জওয়াব পাওয়া কঠিন, সে শুধু ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে নবী।

হালিমা খেতে বসেছিলো, কিন্তু দু'এক লোকমা গিলেই সে উঠে পড়ে—তার পেটেও ভাত গেলো না আজ! কত অনুনয়-বিনয় করেছে হালিমা, কিন্তু তাতে মন গললো না অভিমানী শিশুর, শুধু দু'একবার চোখ মেলে হালিমার দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর মুখ গম্ভীর করে সে নিজেকে সঁপে দেয় ঘুমের কোলে।

গলে যাওয়া দেয়ালের ওপর দিয়ে হালিমা তাকিয়ে আছে আসমানের দিকে। একটা হাত তার নবীর ওপর রাখা। নবীর পিঠে কঞ্চি ভেঙেও কোনোদিনই খুব ব্যথা পায়না হালিমা,—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়া ছেলের ওপর হাত রেখে তার মনটা হু হু করে ওঠে দুঃখে। সত্যি, এতোটুকু ছেলে, কী-ই বা বুঝে? বাপ তো মরে গিয়ে রেহাই পেয়েছে চিরদিনের জন্য, বাপ-মার যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হতভাগিনী হালিমা। এ-ভাবে যখন তখন ওকে মারপিট করা সত্যি অন্যায়।—কিন্তু কাজ যদি কিছুই না শিখে, ও বাঁচবে কী করে সংসারে? হালিমা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না যে নিজের দিন গুজরানের কথা নবীর না ভাবলেও চলবে!

হালিমার চোখ আঁসুতে ভরে আসে, আসমান থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে সে চুমো খায় নবীর কপালে!

নবী আস্তে আস্তে চোখ মেলে চায়—আর হঠাৎ একবার দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে—মা, এইডা কে ?

—কইরে ? বিস্মিত হালিমা প্রশ্ন করে।

উই যে গেলো, ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপরিচিতের যাওয়ার পথটি।

—কেউ না, নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দেয় হালিমা।

—তুমি লুকাইবার চাও ?—নবীর অভিমান যেন ফুলে ওঠে—খুব ছুন্দর একটা মানুছ গেছে না ? রাঙা ধব্ধবা—আর পিন্দনে ছুন্দর কাপড় ?

—ছুন্দর মানুছ ? হালিমার বিস্ময় এবার আরো বেড়ে যায়।

—হ, চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে নবী বলে—মিঠাই লিয়া আইছিল্—তোমার কাছে দিয়া গেছে না মা ?

—হ, দিয়া গেছে, একটা করুণ হাসিতে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে হালিমা—তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী এখন তুই ঘুমা—বিহান বেলা খাবিনে মিঠাই।

—লোকটা কোন্খান থে আইছিল মা ? নবী আবার প্রশ্ন করে—দুইটা পাখ্না দেখছো পিঠে ?

পাখ্না ?—হালিমার আক্কেল সত্যি হার মানে এবার। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতরো করে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারে না হালিমা।

নবী আবার বলে—হ, পাখ্না। —মউরের পেখমের মতো ছুন্দর।

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—ফিরিছ্তা আইছিল রে—ফিরিছ্তা। আজ ছবে-বরাত না! ঘরে ঘরে আইয়া খোঁজ খবর নিছে মানুছের! ফিরিছ্তাগো আজ ছুটি!

ফেরেশতা এসেছিলো! নবীর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক দারুণ উত্তেজনায় সে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। রাতটা কী চমৎকার! রূপা-গলা জোছনায় ধুয়ে চলচল করছে সারা পৃথিবীর গা। সন্ধ্যের ঘরে ফেরার সময় সে দেখেছে মসজিদে মসজিদে কোরান-

তেলাওৎ-রত ছেলে-মেয়েদের। এখন রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ্‌-বাড়ীর মসজিদ থেকে কোরআন তেলাওয়াতের শিরীন আওয়াজ ভেসে আসছে এখনো—গোরস্তান গমগম করছে মানুষে! আজ ঘুমিয়ে নেই কেউই, ফেরেশতার সংগে, মৃতদের রুহের আজ মোলাকাত করবে সবাই, নিজেদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খার কথা ফেরেশতা মারফত জানাবে আল্লার আছে। শুধু নবী আর হালিমাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে এ সুযোগটা। তাদেরই দুয়ারের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে আল্লার ফেরেশতা, অথচ তাদের চাওয়ার কথা—জীবন পিপাসার কথা কিছুই জেনে যায়নি সে—কিছুই জানানো হলো না তাকে।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলের হাবভাব। একবার বলে—কিরে তোর খিদা লাগছে খুব? ভাত খাবি এখন? নবী কোনো জবাব দেয় না তার, ক্ষিদের কথা সে ভুলেই গেছে একদম। মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক মধুর কঠিন ভাবনায়। ফেরেশতারা খবর নিয়ে যায় আল্লার কাছে। তাদের খবরও কি নিয়ে গেছে ফেরেশতা? সে কি গিয়ে বলবে না বরাতের রাতেও সে ঘুমে দেখে গেছে নবী আর হালিমাকে।

—ফিরিশ্‌তারে কিছু কইয়া দিছো মা? আবার জিজ্ঞাসু হয় নবী।

কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে হালিমা।

—দুয়ারের কাছ দে' গেলো আর কিছু কইয়া দিলা না? অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠে নবী, আমারে ডাকলা না ক্যান তুমি!

—আরে পাগলা, হালিমা তার জ্বালা চেপে রাখতে পারে না, ফিরিশতা আমাগো কতা ছুনবো ক্যান? বড় লোকগো খোজখবর করবার লাই না আইছে! আমাগো দুয়ারের কাছ দে তা'গো বাড়ীই হে গেছে।

নবী চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—তুমি নামাজ পড়ো না ক্যান্ মা? অসহ্য মুরুব্বিয়ানার সুর বেজে ওঠে তার প্রশ্নে।

—কি অইবো নামাজ পইড়া? একটা পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় হালিমার কণ্ঠে।

—কী, অইবো কি? এতোটুকু নবী জ্বলে ওঠে বিরক্তিতে, যারা নামাজ পড়ে তাগো বাড়ীতেই না ফিরিছতারা আহে; আল্লা তো তাগো কতাই ছোনে।

—না রে না, হালিমা একরকম চীৎকার করে ওঠে এবার, আল্লা তো ঘুমাইয়া রইছে কেঁতা গায় দিয়া। ছুনা-রূপা দিয়া ছেজদা করলেই হে চায়। গরীবের সোদা নামাজে হের মন ভিজে না।

আল্লার এই মহৎ গুণের কথা ভেবে একান্তভাবেই ঘাবড়ে যায় নবী। কাঙাল যারা, মিসকিন যারা, তাদের আর কোন ভরসাই নেই তাহলে। এতো সোনা-রূপাও তারা পাবে না, তাদের দিলের আরজুও গিয়ে পৌঁছাবে না খোদার কাছে। আর তাই তো, গরীবদের যারা নামাজ পড়ে তাদের তো মালদার হতে দেখা যায় না; দুঃখ তাদের ঘুচছে কই? সোনা-রূপার শিরীন আওয়াজেই তাহলে ঘুম ভাঙে খোদার! সেই জন্যেই বুঝি মালদাররা আরো মালদার হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্তর গুণ!

কিন্তু খোদা তো পয়দা করেছেন সবাকেই। তিনি কেন তার রহমত এক তরফা বিলিয়ে দেবেন মালদারদের মধ্যে? কোনো দিন কি ঘুমের ঘোরেও দরিদ্র বান্দার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না তার চোখ? সত্যি কি গরীবেরা ঘুম ভাঙাতে পারে না তার?

হতাশার অঁাধারে হাতড়ে ফিরতে থাকে নবীর মন। দুয়ারের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে ফেরেশতা, দব্‌দবে আগুনের মতো রঙ, ময়ূরের পেখমের মতো বিচিত্র বর্ণের দুটো ডানা তার পিঠে, আর গায়ে সে কী খোশবু! সাদা ধব্‌ধবে তাজী ঘোড়া কোমর নাচিয়ে নাচিয়ে চলেছে ফেরেশতাকে নিয়ে। নবী জেগে থাকলে আজ শুয়ে পড়তো ফেরেশতার পথে, আর মিনতি করে বলে যেতো তার রক্তের-ঢেউ ওঠা অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী। কথা না শুনলে সে ঝুলে পড়তো ডানায় ধরে—ফেরেশতার সাথে সাথে উড়ে উড়ে সেও চলে যেতো একেবারে আল্লার কাছে। অমনি চোখ মেলে নবী চীৎকার করতো গলা ফাটিয়ে খামচিয়ে রক্তাক্ত করে ঘুম ভাঙাতো আল্লার!

কিন্তু তা-তো আর হলো না। অথচ সবকিছুরই চাবি রয়েছে খোদার হাতে। তার ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেইবা আর খুলে দেবে ভাগ্যের মণিকোঠা?

বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে নবী। রাজ্যের যতো চিন্তা এসে জটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিবিয়ে গা এলিয়ে দেয় নবীর

কাছে। ছেলে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হালিমা তা দেখছে না, শুধু বুক দিয়ে অনুভব করছে নবীর বুকভরা অস্বস্তি। একবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে, নবী, অনেক রাত অইছে—তুই ঘুমা।

নবী আসমানের দিকে চেয়ে থাকে চুপ করে, আর একটা পথের খোঁজে কল্পনা তার হয়রান হয়ে যায়। আকাশ ভরে পৃথিবী ভরে এতো জোছনা—তবু যেন কতো অন্ধকার, চোখের সংগে মনও হারিয়ে যায় সে-অন্ধকারে।

হঠাৎ একবার বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায় তার চোখে, অকূল দরিয়ায় যেনো নারিকেলকুঞ্জ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। খুশিতে, আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। হয়েছে, আর ভাবতে হবেনা! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে টান দেবে সে। রশি তো হাতেই রয়েছে তার। এবার থেকে নির্বিকার ভাব ঘুচে যাবে খোদার।

পরদিন। আগের দিনকার পানিভাত দুটো খেয়ে দোকানে কাজ করতে যায় নবী—যাবার ইচ্ছে তার মোটে ছিল না, হালিমাই তাকে পাঠিয়েছে অনেক শাসিয়ে। হালিমা বলে, নিজের হাতেই আজ গড়তে হবে কপাল, আল্লার কাছে আরজি পেশ করলেই চলবে না।

কয়েকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে পিলখানার ওপাশে ফনিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। দোকান পালিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে ঐখানে সে রোজই ঘুড়ি ওড়ায় আপন মনে। এ-খবর সে ছাড়া আর কেউ জানে না সংসারে। পৃথিবীকে লুকিয়ে শিশু তার কচি হাতদুটো বাড়িয়ে দেয় আসমানের দিকে। কিন্তু হাত আর কদ্দুরই বা ওঠে? নবীকে তাই নিতে হয়েছে ঘুড়ি—ঘুড়ি ওড়িয়ে সে তার বাণীকে এতোদিন অজান্তে ওপর হতে আরো ওপরে আরশের দিকেই পাঠিয়েছে।

পেট ব্যথার অজুহাত তুলে নবী বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। মুহূর্তের জন্যেও সে স্থির হতে পারছে না আজ। অতি সন্তর্পণে বাড়ী পৌঁছে নবী। মা বাড়ী নেই। আনন্দের সীমা থাকে না নবীর! তিনটা পাতিল তচনচ করে সে বার করে দু'আনা পয়সা—ওহ! দুই আনার পয়সা তো নয়, সাত রাজার ধন! পয়সাগুলো মুঠোয় পুরে নবী ছুটে যায় নবাবগঞ্জে।

সূতো কিনে আবার সে দৌড়তে শুরু করে দেয়। এক নতুন অভিযানের নেশায় বুক তার কাঁপছে। জংগলের ভেতরকার এক পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মসজিদের অন্ধকার গুহা থেকে বের করে একটা ঘুড়ি আর লাটাই। এই ঘুড়িই তাকে রোজ বের করে আনে কাজ ভুলিয়ে, এই ঘুড়িই তাকে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আসমানের পথে নিয়ে যায়। আর সব ব্যাপারেই খই ফোটে নবীর মুখে, কিন্তু এই ঘুড়ির কথা কারো কাছে সে বলে না। এ যেন তার নেহাত পুশিদা খেলা, একান্তভাবেই নিজস্ব।

এক সময়ে নবী চলে যায় পিলখানার ওপাশে সেই ফনিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। পুরানো সূতোটার সংগে নতুন সূতোটা গেরো দিয়ে সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে। ঘুড়ি যতই ওপরে উঠতে থাকে উল্লাস অধীরতায় ততোই বিচলিত হয়ে ওঠে নবী, একটা স্মিতহাস্যে তার মুখ থেকে চোখ পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবার। আরশের পায়ে রশি লাগিয়ে আজ সজোরে টান দেবে নবী।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসে ঘুড়িটা। এক সময়ে যখন হাতের সূতো শেষ হয়ে গেলো, নবীর দুঃখের সীমা থাকে না। সূতো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ঘুড়ি যে দেখা যাচ্ছে এখনো। খোদা কি এত কাছে? তাতো নয়, মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অনেক—অনেক দূরে আরশের ওপর ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এতো কাছে হলে তো খালি চোখেই দেখা যেতো আল্লাকে। সূতো চাই তার আরো, অনেক সূতো—যে তার ঘুড়িকে নিয়ে যায় মেঘের ওপারে, আরশের একেবারে কাছটিতে। কিন্তু এখানেও দরকার পয়সার। সে যে সূতো কিনবে সে পয়সাই বা কই নবীর? তাদের দুর্দশা তা হলে আর ঘুচবে না! নবী আসমানের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতায় আর্তনাদ করে উঠে। ঘুড়ি ওড়ানো যতোদিন একটা শখ ছিলো, নেশা ছিলো, ততোদিন শুধু ঘুড়ি উড়িয়েই আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন এই ঘুড়ি একটা গভীর অর্থ নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে, সহস্র বেদনার সম্ভাবনার পথও অবারিত হয়ে গেছে তার জন্যে।

কিছুক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়েই বাড়ী চলে আসে নবী। এই সূতোয় হবে না, আরো অনেক সূতো চাই। বামনের হাত বাড়িয়ে আরশের পায়া

ধরা অসম্ভব। পরম যত্নে সে ঘুড়িটা লুকিয়ে রাখে ভাংগা মসজিদের নির্জন অন্ধকারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘরেও পয়সা নেই। মার কাছে পয়সা চাইতে গেলে হালিমা কঞ্চি দিয়ে তার পিঠের ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে দু'আনা পয়সা আজ সে চুরি করেছে তার জন্যেই তার বরাতে কী আছে কে জানে? তবুও লোভ সামলাতে পারে না নবী। আজলের লিখা পালটাতে হলে কিছু খরচ—কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বই কি। মার অংর্তমানে নবী উল্টে পাল্টে দেখে ঘরের সব কটা হাঁড়ি-পাতিল—ছেঁড়া কাপড়ের বোচকাগুলো খোঁজে তন্ন তন্ন করে। একটা পয়সা নেই কোথাও। পয়সা থাকবেই বা কী করে? ভিক্ষে করে পরের বাড়ীতে কাজ করে যা দু'চার পয়সা পায় তাতে করে মা-ছেলের আধপেটা খাবারই হয় না কোনোদিন, তারা আবার জমাবে পয়সা!

হঠাৎ নবীর মনে পড়ে যায়ঃ ইষ্টিশনে গেলে দু'চার পয়সা পাওয়া যেতে পারে। তার বয়সের ছেলেদের সে কুলিগিরি করতে দেখেছে অনেকদিন। নবী আর ভাবতে পারে না, একপেট খিদে নিয়েই সে ছুটে যায় ইষ্টিশনের দিকে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় তাকে! তারপর গাড়ী যখন এলো, তাজ্জব বনে যায় নবী—কতো বিচিত্র রকমের মানুষ, আর কতো রঙবেরঙের পোশাক। বাক্স-বিছানা, পেটেরা প্রভৃতিতে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে লাইনের কাছটুকু। 'মুটে চাই' চীৎকারে হারিয়ে যায় আর সব আওয়াজ।

সবার বরাতেই একটা না একটা কিছু জুটে যায়; কিন্তু নবীর কপাল বড় খারাপ 'মুটে চাই' বলে চীৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ এলো না তার গলায়—হাত দুটো চাওয়ার ভংগীতে ওপর দিকে উঁচিয়ে সে ছুটে যায় এক কামরার সুমুখ থেকে আরেক কামরার সুমুখে—চোখ তার করুণ আঁসুতে টলোমলো। ভিক্ষুক মনে করে কেউ কেউ তাকে নসিহত করলে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে, আর অতি আধুনিক কেউ কেউ দিলে গলাধাক্কা। কা'রো কাছ থেকেই নবী কিছু পেলো না।

ট্রেন চলে গেছে। ইষ্টিশনে বসে বসে নিজের বদ্ নসিবের জন্যে বেদনায় ভরে আসে নবীর মন। দুঃখটা এবার আরো বড়ো হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। মায়-বেটায় কোন দিন একবেলা পেট ভরে খেতে

পায় না তারা। কোনোদিন একেবারেই উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারতো তারা! সেই তার বাপ ছেঁড়া শততালি দিয়ে যে কাপড়গুলো রেখে গিয়েছিলো সেগুলোই আরো তালি দিয়ে এবং গেরোর উপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দু'জনে। ঘরের মেটে দেওয়াল তো প্রায় সবটায় গলে গেছে, বৃষ্টি হলেই টীনের সুরাখ দিয়ে 'উসসিলা পড়ে' পড়ে ঘর ভেসে যায় পানিতে। দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা নেই তাদের। আল্লার কাছে তাদের দিলের আরজ পৌঁছাতে পারলেই অবসান ঘটতো দুঃখ রাত্রির। কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবীও আরবী সুরা এবং রাকাতগুলো শিখবার সুযোগ পায়নি কখনো। আল্লা কেনই বা শুনবেন তাদের কথা!

ঘণ্টাখানেক পরে আর একটা ট্রেন যখন এলো, নবীর আনন্দ দেখে কে! ট্রেন থামবার আগেই 'মুটে চাই' 'কুলী চাই' বলে সে চীৎকার শুরু করে দেয় প্রাণপণে। ট্রেন থামলে একটা ঘড়ি-পরা বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঁড়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কামরার সুমুখে। ভদ্রলোক একটা এটাচি ও হোল্ডঅল্ দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—ওয়েটিং রুমে নিতে পারবি?

—ক্যান পারুম না? তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয় নবী, দেন আমার ঘাড়ে তুইলা।

—কতো নিবি? ভদ্রলোকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

—আমার বহুত পইছার দরকার, চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে উচ্চারণ করে নবী—আপনে কতো দিতে পারবেন।

ভদ্রলোক এবার দৃষ্টি প্রখরতর করে নবীর মুখের দিকে তাকান; অদ্ভুত ছেলে তো! বলেন—এতো পয়সা দিয়ে কি করবি?

—বারে, পইছার বুঝি কাজ নাই! নবী রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে, ঘুড়ির রছি কিনুম যে—অনেক রছি।

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হেসে ফেলেন এবং হোল্ডঅল্টা নবীর মাথায় দিয়ে এটাচিটা হাতে করে নেমে পড়েন গাড়ী থেকে; ওয়েটিং রুমে এসে চার পয়সার জায়গায় চার আনা দিয়ে বলেন—এই নে, অনেক সুতো হবে।

নবী সিকিটা ছুড়ে মারে ওয়েটিং রুমের মেঝেয়—না, আমি নিমু না। চার আনায় আমি কী করুম? আমার অনেক রছি লাগবো। আমার ঘুড়ি আছমান ছুইবো গিয়া।

সবাই অবাক হয়ে যায় নবীর মেজাজ দেখে। ভদ্রলোক সিকিটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—ঘুড়ি আসমান ছুঁলে তোর কি হবে?

—ক্যান, আরছের পারায় বাজাইয়া টান দিমু, এক স্বপ্নিল নেশা আর শক্তির স্ফুর্তিতে নবী মুহূর্তে যেন বিরাট কিছু হয়ে ওঠে—আল্লা খালি আপনাগো কতাই ছুনবো, আমাগো কতা বুঝি ছুনোন লাগবো না হের?

এবার সকলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। পরিবেশটা মুহূর্তে যেন কেমন থমথমে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। রাজভক্তদের সামনে যেন রাজদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে শিশুর মুখে। ভদ্রলোক পকেট হতে একটা আধুলি বের করে বলেন—এই নে, এখন হবে তো?

আধুলিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আঁখি ছলছল করে ওঠে নবীর। আন্তরিকতা মিশিয়ে বলে, আমাগো যখন অনেক পয়ছা অইব, আমাগো বাড়ী তখন আইয়েন—আপনের জেব ভইরা দিয়া দিব হেদিন।

নবীর কথায় হেসে ফেলে সবাই। যিনি আধুলিটা দিয়েছেন তিনি তো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁর আজকের এই মেহেরবাণীর কথা ভুলতে পারবে না নবী—দিন যখন ফিরবে, নবী দুই জেব ভর্তি করে পয়সা দিয়ে শোধ করবে তাঁর ঋণ। হাসতে হাসতেই বলেন—হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই আসবো, আমরা সবাই আসবো সেদিন।

নবী এসব শুনবার জন্যে অপেক্ষা করে না। সে সোজা চলে যায় চকের দিকে! অনেকটা সুতো কিনে যখন বাড়ী ফিরলো তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সুতোটা সে লুকিয়ে রেখে আসে মসজিদে—তার ঘুড়ির পাশে।

হালিমা ভিক্ষে করে আনা চালগুলো জাল দিচ্ছে আর স্নুরবুর হচ্ছে ধুয়োয়। গাছতলা থেকে ভিজে-বন কুড়িয়ে এনেছে আগুন ধরাবার জন্যে, নবীকে দেখেই চোখ কচলাতে কচলাতে বলে,—কিরে, অতোক্ষণে কোথে আইলি?

মার দরদ ভরা প্রশ্নে অত্যন্ত খুশী হয় নবী; তার মেজাজ তাহলে বিগড়ে যায়নি আজ! হয়তো পাতিল তচনচ করে পয়সা নেবার খবরটি সে জানতেই পারেনি এখনো। মনে মনে আল্লাকে সে শুকরিয়া জানায়।

—দোকান তে বার অইয়া একটু ঘুইরা আইলাম, মা,—মার দিকে চেয়ে সে বলে সহজ ভাবে !

চুলোয় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমার কণ্ঠে দরদ ভেঙে পড়ে—দোকান তে পালাস নে যেন !—কাজটা ছিখে ফেললে অনেক পইছা আইবো ঘরে, —কাজ না জানলে কি আর ভাতকাপড় জুটে ? আমাগো মা-পুতের কি এছাড়া আর উপায় আছে ?—এবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হালিমা প্রশ্ন করে—হারে নবী, তোর খিদা লাগছে, না ?

মা-এর আন্তরিকতায় নবী একরকম ভুলেই যায় তার খিদের কথা। তাছাড়া, একদিকে রশি কেনার আনন্দ, অন্যদিকে মার স্নেহ—দু'টোতে মিলে আজকের দিনটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে নবীর কাছে। হেসে সে বলে—না, মা—আমার খিদা লাগছে না। দোকানে আমাগোরে খাওরায় কিনা দুপুর বেলা।

—তাই ভালা,—হালিমা সায় দেয়—ভিক্ষার ভাত যতো কম পেটে দেয়া যায় ততোই ভালা। এ ভাতে ছেলে-মাইয়া গো 'বাইড়' থাকে না।

রান্না হলে নবী ও হালিমা, দু'জনেই কিন্তু ভিক্ষের ভাত পেটে ঢেলে স্বস্তিবোধ করে কিছুটা।

পরদিন দোকানের কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আজ আবহাওয়া খুবই অনুকূল—এবং নবীর হাতে অনেক সুতো ! পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আজ সে তার হাত পৌঁছিয়ে দিতে পারবে আসমানে।

নবী ঘুড়িটাকে পয়লা বুকের কাছে চেপে ধরে—বুক তার ঢিপ ঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘুড়ি উড়লো আসমানে,—হাওয়ার ভরে নেচে নেচে, দুঃসাহসের দোলায় কেঁপে কেঁপে ঘুড়ি উঠে যায় ওপর হতে ওপরে—আরো ওপরে ! সুতো আজকে ফুরোতে চায়না,—ঘুড়ি ক্রমেই ছোটো হয়ে আসছে—অই বুঝি ঘুড়ি হারিয়ে যায় দৃষ্টির ওপারে, অসীম শূন্যতায় ! আবেগে, ঔৎসুক্যে বড়ো হয়ে এলো নবীর চোখ দুটো। তার বুকের শ্বাস দীর্ঘ হতে দীর্ঘতরো হয়ে আসে, ঠোঁটের বাঁধন খুলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসির আমেজ লাগে তার সারা মুখে। ঘুড়ির নাচের

সংগে সংগে একটা অপূর্ব চঞ্চলতায় নাচতে থাকে তার বুড়ো-হয়ে আসা চোখের চকচকে তারা দুটো।

এক সময়ে টের পায় নবী—লাটাই আর ঘুরছে না—সুতো শেষ হয়ে গেছে। সেই নির্জন ফনি-মনসায় ঘেরা জায়গাটুকুতে নবীর চোখ পানিতে ভরে আসে। ঘুড়ি এখনো দৃষ্টি-সীমার ভেতরেই।

নবী ঘুড়ি নামিয়ে আনলো। আরো রশি চাই তার—অনে—ক রশি! খোদা তার আসন এতো দূরে পেতেছেন কেন, বুঝতে পারে না নবী। কিন্তু আসন দূরে পাতলেই কি আরশে বসে ঘুমোনো এতো নিরাপদ? সংসারে কি রশি নেই যে তাঁর আরশ ছোঁওয়া যাবে না, টলিয়ে দেয়া যাবে না পায়ায় রশি লাগিয়ে? নবীর আকাংখা আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাধা পেয়ে।

চিরদিনকার মতো মসজিদে ঘুড়ি আর লাটাই লুকিয়ে রেখে, আজো সে চলে যায় ইষ্টিশনে! পয়সা চাই তার, রশি কেনার পয়সা—যে রশি সে আরশের পায়ায় বেঁধে খোদাকে নামিয়ে আন্‌বে মাটির মানুষের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত দু'আনার বেশী আর জুটে না। কতোটুকু সুতোই বা আর কেনা যায় এ দিয়ে!

এমনি করে রোজ কিছু কিছু পয়সা আয় করে নবী—আর তাই দিয়ে সুতো কিনে পুরানো সুতাটার সাথে জুড়ে দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে।

পিলখানার ওপাশের ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন করে নিয়েছে অনেকদিন। অমন নির্জন নীরব পরিবেশে আসমান ছাপিয়ে ওঠে নবীর দুর্জয় সাহস। কিন্তু হাতের সুতো যখন শেষ হয়ে যায়, এবং ছোটো হতে হতেও ঘুড়ি যখন থেকে যায় দৃষ্টির ভেতরেই, নবীর তখনকার দুঃখ আর আক্রোশ দেখে কে? তবু মন তার ভেঙে পড়ে না—সাফল্যের নিকট সম্ভাবনা তাকে করে তোলে আরো সাহসী, আরো জেদী।

রোজ নবী দোকানের কথা বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কোথায় বা দোকান আর কোথায় বা নবী? ইষ্টিশনে, বাজারে মুটেগিরি করে যা দু'চার পয়সা পায় সবই খরচ করে সুতো কেনায়। দিনে দিনে সুতো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতরো হয়ে উঠে।

একদিন সতিাই ঘুড়িটা ছোটো হতে হতে একটা কালো বিন্দুর মতো হয়ে আসমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেলো। ডোর ধরে রেখে আসমানের দিকে চেয়ে আছে নবী, আর প্রচণ্ড কাঁপুনিতে থর থর করে উঠছে তার শরীর। উত্তেজনায় কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এলো তার, বিস্ময়ে-আশংকায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসে—একটা করুণ হাসিতে মধুর হয়ে ওঠে শিশুর মুখ। আজ যেন টানাটানি পড়ে গেছে আসমান আর পৃথিবীর মধ্যে—কে হারে, কে জেতে—এবং তারি আকর্ষণ সে অনুভব করছে হাতের রশিতে! শুধু একটা রশি—টন্‌টন্ করছে আসমানের আকর্ষণে। হয়তো দৃষ্টির আড়ালে থেকে কেউ টানছে রশিতে ধরে—আর সেই টানে ফুলে ফুলে উঠছে নবীর হাতের শিরা-উপশিরা।

রশি বেয়ে নবীর বিস্মিত দৃষ্টিও হারিয়ে যায় আসমানে। আজকে আর ঘুড়ির রশি গুটোবে না নবী; লোকচক্ষুর ওপারে ঘুড়ি উড়ে বেড়াক আপন ইচ্ছেয়—আপন ধর্মে! এক সময় হয়তো আটকে যাবে আরশের পায়ায়—আরো শক্ত টান পড়বে হাতে, রশিতে টান দিয়ে নবী টলিয়ে দেবে আল্লার আরশ। ভয়-চকিত আঁখি মেলে আজ তিনি তাকাবেন মাটির মানুষের দিকে—অনিচ্ছায়ও শুন্‌তে হবে দুঃখী বান্দার কাহিনী,—তাদের ইতিহাস!

নবী চেয়ে আছে ওপর দিকে—শুধু একটা সুতো—সেরাতের পুলের মতো সূক্ষ্ম একটা সিঁড়ি বেহেশত আর দুনিয়ার মাঝখানে। মাঝে মাঝে শাদা, কালো নানা রঙের মেঘ আনাগোনা করছে এবং আঁৎকা টান পড়ে পড়ে ঝন্‌ঝন্ করে উঠছে সুতোটুকু—মেঘ দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে-সুতোর ধারে! নবীর চোখ দুটো পানিতে ভরে আসে। আল্লার আরশ ঠিক কোন্‌খানটিতে তা সে জানে না, কিন্তু আজ তার মনে হলো-সে যেন তার বিদ্রোহের নিশান আরশের কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে—আর যেনো দূর নয় বেশী!

পেটের ক্ষিধে, মা ও সমস্ত সংসার—সব কিছু ভুলে যায় নবী। সন্ধ্যের পরও অনেকক্ষণ 'ডোর' ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। কই, কোথাও তো আটকে গেলো না ঘুড়ি! এক সময় সে সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে আনে নীচে এবং জমিন ছুঁবার আগেই ঘুড়িটাকে চেপে ধরে তার বুকের মাঝে;

ঘাড় নিচু করে সে পরশ নেয় ঘুড়ির,—কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় নাকে আর ঘুড়িটাকে মনে হয় ভেজা-ভেজা। আহ্,—নবীর বুকে খুশী আর সীমাই পায় না যেন! বহুদিন পর খোদা আজ তার গরীব বান্দার দুঃখে কেঁদেছেন আর তাঁরই আঁসুর ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে নবীর ঘুড়ি।

আরশের পায়া ধরে টান দিতে হলো না আর; এর আগেই খোদা কেঁদে ফেলেছেন তাঁর বান্দার দুঃখে। নবী আজ সত্যি বিজয়ী—সে সার্থক হয়েছে তার অভিযানে, আজ থেকে আর কোনো দুঃখই থাকবে না তাদের।

বাড়ী ফিরে দেখে—হালিমা বিছানায় পড়ে কোঁকাচ্ছে—জ্বর এসেছে তার। জোহরের সময়েই চলে এসেছিলো ঘরে—আজ তার কিছুই জুটেনি কপালে। মনটা খারাপ হয়ে যায় নবীর—খোদা যদি তাঁর বান্দার দুঃখে কাঁদবেন, তো তার মা-এর জ্বর হবে কেন আজ? তাদের ঘরে আজ ভাত জুটবে না কেন? এ তা'হলে আল্লার আঁসু নয়—শয়তানের পেশাব! শয়তান চায় না যে মানুষের দিলের আরজু পৌঁছুক গিয়ে আসমানে।

নবী বুঝতে পারে—আরো অনেক সুতোর দরকার হবে তার। সাত তবক আসমান পেরিয়ে গিয়ে তবেই না আল্লার আরশ! সকাল বেলা জ্বর নিয়েই উঠে পড়ে হালিমা। কয়েক বাড়ী ঘুরে কিছুটা ফেন যোগাড় করে নিয়ে আসে নবীর জন্যে। নবী বলে—তুমি খাইবা না, মা?

না,—হালিমা ধীরে ধীরে বলে—তুই খাইয়া দোকানে যা। নবী পিয়ে পিয়ে ফেনটা গিলে নেয়। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তুমি চিন্তা কইরোনা মা—আল্লা আমগো উপরে মুখ তুইলা চাইবো। এহাল আমগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা ছেলের দিকে চেয়ে একটু করুণ হাসি হাসে—কিছু বলে না। টল্‌তে টল্‌তে এক সময় সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে জানেনা যে নবী দোকানে যায় না এক দিনও—বাজারে, ইষ্টিশনে মুটেগিরি করে, আর পিলখানার ওপাশে ঘুড়ি ওড়ায়।

নবী মুটেগিরি করে রোজ কিছুটা সুতো কেনে। ঊর্ধ' হতে আরো ঊর্ধলোকে পাঠিয়ে দেয় তার বিদ্রোহের নিশান! কিছুতেই থামতে পারেনা নবী; যার নূরের তজল্লিতে সিনাই পাহাড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো তারি দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় দুঃসাহসী শিশু।

কিন্তু যতোই সুতো জুড়ে দিচ্ছে—ঘুড়ি ততোই ওপর হতে আরো ওপরে উঠছে—কোন কূল কিনারাই পায় না নবী। এতোদূরে—মানুষের নাগালের বাইরে এভাবে আত্মগোপন করার কী মানে থাকতে পারে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন নবী সন্ধ্যের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে এসে দেখে মা আজ বড়ো খুশী! পরণে তার নতুন শাড়ি—সান্‌কি আর বাটিতে ভাত-সালুন বেড়ে বসে আছে নবীর অপেক্ষায়!

বহুদিন পর সানকি-ভরা ভাত দেখে পেট জ্বালা করে উঠে নবীর। সে সোজা গিয়ে বসে পড়ে হালিমার কাছে। খেতে খেতে মাকে বলে—মা, এই ছব পাইলা কই আইজ?

আজো জ্বর ছিল হালিমার। কিন্তু এই মুহূর্তে নবীর খাওয়া আর খুশী দেখে সে যেন সুস্থ হয়ে ওঠে হঠাৎ। ধীরে ধীরে বলে—কাহারটুলির জমিদার বাড়ীর বউ মরছিল্ না। তারি ফাতিহা অইছে আইজ,—বহুত কাপড়-চোপড় আর টাকা পইছা দান খয়রাৎ করছে তারা। দেখনা তোর লাইগা একটা লুংগিও আনছি চাইয়া—হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট্ট নতুন লুংগি এনে দেয় নবীর হাতে।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় নবী। আজ বুঝি সত্যি তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন আল্লা, ঘুম তা'হলে ভেঙেছে তাঁর। আজ শুকরিয়ার বান ডেকে যায় তার বুকে। ছলোছলো চোখে মার দিকে চেয়ে বলে—কইছিলাম না মা—এ হাল আমগো বেছি দিন থাকবো না!

হালিমা নবীর এ-কথায় সায় দিতে পারতো না কোনদিনই! কিন্তু এই মুহূর্তে সে সায় না দিয়ে পারে না। নবীর চোখে যেন সে পরিচয় পেয়েছে—তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

জমিদার বাড়ীর দেয়া পয়সা আর চালে দু'দিন ভালোই যায় তাদের। আবার শুরু হয় আধ-পেটা খাওয়া আর উপোসের পালা। নবীর মন ভেঙে পড়ে—রাগে জ্বালা ধরে যায় তার সমস্ত সত্তায়। একি ছলনা—একি ছিনিমিনি খেলা বান্দার জীবন নিয়ে? তাদের আরজু তা হলে এখনো গিয়ে পৌঁছুয়নি খোদার কাছে!

নবী রোজ ঘুড়ি উড়ায় আর মনে মনে বলে – আল্লার আরশ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে এতো সুতো যদি সে কিনতে না-ই পারে এতো ফেরেশতা রয়েছে কী জন্যে ? তারাই তো মানুষের দিলের আরজু পৌঁছায় নিয়ে খোদার কাছে। আল্লার কাছ হতে তারাই তো পয়গাম নিয়ে আসে মানুষের কাছে ! আজকাল এতো নিষ্ক্রিয় কেন এই ফেরেশতারা ? কেন তারা নবীর ঘুড়িকে নিয়ে যায় না আল্লার কাছে ?

সে দিন সোমবার। নবী না খেয়েই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। সেই ফনিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকু। নবী দূর্বার উপর বসে নতুন সুতোটাকে জুড়ে দেয় পুরোনো সুতোটার সংগে। আসমান কেমন যেন মেঘ্‌লা মেঘলা। সূর্যের আলো পড়ে মেঘগুলো সাদা হয়ে গেছে আর ফাঁকে ফাঁকে চক্ চক্ করছে গাঢ় নীল আসমান। এক সময় নবী ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আসমানে,—হাতে তার লাটাই ঘুরছে আর শন্ শন্ করে ধাওয়া করছে ঊর্ধদিকে। নবী অপলক চেয়ে আছে ঘুড়ির পানে,—আর রশিতে টান পড়ে পড়ে ঝিন্‌ঝিন্ করে উঠছে তার সারা শরীর। অকারণ উল্লাসে ভরে উঠছে নবীর মন! নবী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না! মন তার আবেগে-উৎসাহে থর থর করে কেঁপে উঠছে, কল্পনা স্বর্ণ-ঈগলের মত ডানা মেলেছে আসমানে।

ঘুড়ি ক্রমেই ছোটো হয়ে এলো! একসময়ে নবী বিস্মিত হয়ে দেখতে পায়, তার ক্ষুদ্র ঘুড়িটার চার পাশে একটা বৃহৎ পাখী উড়ছে আর ঘুরছে। মাঝে মাঝে পাখীটা হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে,—আবার দেখা যাচ্ছে। বৃহৎ ডানা মেলে ঘুরছে ঘুড়িটাকে কেন্দ্র করে, আশ্চর্য, একবার ঘুড়ির রশি আটকে যায় পাখীর গায়, নবীর হাতে টান পড়ে আর তাতেই সারা দেহ অজানা আশংকায় দুলে ওঠে—পাখীটা ঘুড়ি নিয়েই ঘুরতে থাকে আরো দ্রুতবেগে। রশি আরো প্যাঁচ খেয়ে লাগে পাখীর ডানায় আর গায়ে। হঠাৎ একসময় নবী টের পায়, সুতো ঢিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে আর ঘুড়ি ঘুরছে পাখীর পিছে পিছে। নবীর এতোদিনের অহংকার মাটী হয়ে যায় আজ! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে আরশকে টলিয়ে দেয়া আর সম্ভব হলো না জীবনে!

একাকী শূন্য মাঠে ডুকরে কেঁদে ওঠে নবী। দু'চোখ-ভরা আঁসু নিয়েই একবার সে তাকায় ঘুড়ির দিকে। একটা কালো বিন্দুর মতো পাখীর পিছে পিছে ঘুরছে ঘুড়ি, আর পাখীটা শুধু ঘুরে ঘুরে উপরের দিকেই উঠছে। আচমকা নবীর মনে হলো—এ-তো পাখী নয়—এ যে ফেরেশতা—জিবরাইল এসেছে পাখীর সুরত ধরে তার ঘুড়িকে আল্লার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে! দু'চোখ ফেটে এবার কৃতজ্ঞতার আঁসু গড়িয়ে পড়ছে নবীর গাল বেয়ে; তার আঁসু-ধোয়া মুখে ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব হাসি—বেদনা আর আনন্দে ঝলমল-করা!

নিজের বোকামীর কথা ভেবে শরম হয় নবীর। এতোদিন পর ফেরেশতা এসেছে তার দিলের আরজু আল্লার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে! আর সে কি না কাঁদছে, পাখী তার ঘুড়ি নিয়ে গেলো বলে! চোখ মুছে সে তাকায় আসমানের দিকে—দেখে পাখীও নেই—ঘুড়িও নেই,—শুধু সাদা সাদা মেঘ, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে চকচক-করা গাঢ় নীল আসমান! অনেকক্ষণ নবী চেয়ে থাকে আসমানের দিকে, আবার তার চোখ ফেটে দরদর করে বেরিয়ে আসে কৃতজ্ঞতার আঁসু। আজকে সে সার্থক—আজকে সে জয়ী! আর কোনো ভাবনা নেই তার,—জিবরাইল এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি—নতুন পাতা খুলবে এবার জীবনের।

আবার আসমানের দিকে চেয়ে, এক ঝলক হেসে নবী বাড়ী ফিরে আসে। খুশীতে তার সারা শরীর আজ নেচে নেচে উঠছে। হালিমা উঠোনে বসে শাক বাছছিলো,—"মা—মা—হুন্ছো"—বলে নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে হালিমার কোলে।

হালিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে—তারপর রাগে ঠোঁট কামড়ে, টিপে ধরে নবীর ঘাড়ে—গর্‌গর্‌ করে বলে—কোথে আইলিরে হারামজাদা? আইজ তোর রঙ আমি না বাইর কইরা ছাড়ুম না!

নবী তার মার রাগের কারণ বুঝতে পারে না—তবু, তার খুশীর খবরটুকু সে না দিয়ে পারছে না তার মাকে—মা, আইজ জিবরাইলরে দেখছি—আম্‌গো খবর……

নবী কথা শেষ করতে পারে না—ধুম ধুম করে হালিমার শক্ত হাতের কিল পড়তে থাকে তার পিঠে। কিলোতে কিলোতেই বলে—

ওরা দিবো আর আমরা খামু বইয়া বইয়া? ঝাঁটা মার জিবরাইলের মুখে শতবার!

—মা মা—তুমি গাল দিয়ো না, চীৎকার করে ওঠে নবী—গুনা অইব মা, আল্লা রাগ কর্‌বো।

হালিমার রাগ আরো বেড়ে যায়—গালের ফোয়ারা থামতে চায় না তার। নিরুপায় নবী কামড়ে ধরে তার মার হাতে।

এবার যেনো আগুন লেগে যায় হালিমার গায়। বিড়ির দোকানের মালিক আজকে বলে গেছে—নবী দোকানে যায় না কোনোদিনই; সুতরাং কাজ তার ছাড়িয়ে দেয়া হলো আজ থেকে। দোকানীর কাছেই শুনেছে হালিমা—নবী নাকি কোথায় ঘুড়ি উড়ায় সারাদিন, আর সময় সময় ছুটে বেড়ায় বাজারে, আর ইষ্টিশনে। খবরটা পেয়ে অবধি গোস্বায় আগুন হয়ে ছিলো হালিমা। এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কা? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায়। —হারামজাদা, তোর ভালার লাইগাই না আমার মাথা-বিষ, আর তুই কিনা ফাঁকি দেছ আমারে! আমি মরলে জিবরাইল খাঞ্চা খাঞ্চা ভাত লইয়া আইবো না তোর লাগি।

আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় নবীর পিঠ—চীৎকার করে সে কাঁদে এবং কামড়ে রক্তাক্ত করে দেয় হালিমাকে। এক সময় প্রায় বেহুস হয়ে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রাতের বেলা হালিমার গায়ে জ্বর এসে যায়। নবী তার মার দিকে একবার চায়,—এবং কিছু না বলে ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়ে মাটির ওপর। কিছুই পেটে পড়লো না তার। শুয়ে শুয়ে, কপাল কুঁচকে ঠোঁট ফুলিয়ে সে কটমট করে তাকিয়ে থাকে হালিমার দিকে।

তারপর, কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়লো, সে নিজেই জানে না!

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নবী স্বপ্ন দেখলো, জিবরাইল তার ঘুড়ি নিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আসমানের দিকে ধাওয়া করছে। এক সময় নীল আসমান দু'দিকে সরে গিয়ে পথ করে দিলো জিবরাইলের জন্যে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আবার যাত্রা শুরু হলো—আবার একটা আসমান ফাঁক হয়ে

গেলো—আবার আরেকটা—ষষ্ঠ আসমান খোলার সংগে সংগে আগুন লেগে গেলো জিবরাইলের ডানায়,—জিবরাইল তবু এগোচ্ছে নবীর ঘুড়ি নিয়ে! তারপর এক সময় খুলে গেলো সপ্তম আসমানের দরজা আর তার ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র আলোকচ্ছটা এসে ঝলসে দিল নবীর চোখ দুটোকে। আর চাইতে পারলো না নবী—দু'চোখে হাত দিয়ে চীৎকার করে ওঠে ঘুমের ঘোরে—মাগো, আমার চোখ দুইটা পুইড়া গেলো!

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে নবী—গলে যাওয়া দেয়ালের উপর দিয়ে সূর্যের প্রখর আলো তার নাকে মুখে এসে লাগছে।

ময্‌হারুল ইসলাম

……

এপার ওপার

উল্লাপাড়া ষ্টেশন ছেড়ে পূবদিকে কিছুদূর এগুলেই করতোয়া নদী। নদীর পূবপারে একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম রসুলপুর।

এই গাঁয়েরই ছেলে মোমেন। মোমেন যখন ছোট্টটি তখনই কলেরায় ওর বাপ আর মা দুজনই মারা যায়। ওর বুড়ো দাদী ছাড়া মোমেনকে দেখবার শুনবার কেউই ছিল না। ধরতে গেলে দাদীর কোলেই ও মানুষ। সংসারে মোমেন আর ওর দাদী। আর সবাই চোখ বুজেছে একে একে। মোমেনের দাদী বৃদ্ধা জোমেলা। সংসারের সবাই যখন জোমেলাকে ছেড়ে চলে গেল তখন শূন্য বুকে ওই মোমেনকে কোলে করেই ঝড়ে ভাংগা বট গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকলো জোমেলা। গাঁয়ের সবাই ওর বেদনাকে জানতো-বুঝতো। সহানুভূতিও জানাতো অনেকেই। আবার অনেকেই সুযোগ বুঝে ওর জমি বাড়ী নিলামের চেষ্টা করেছে বহুবার, কিন্তু পারেনি। পারেনি, কেননা জোমেলার দৃষ্টি ছিল চারিদিকেই বিস্তৃত! খুব সুচতুরা আর বুদ্ধিমতী হিসেবেই গাঁয়ের অনেকে ওকে মান্য করে চলতো।

এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েও কিন্তু মোমেনকে স্কুলে দিয়েছিলো জোমেলা। গাঁয়ের লোকেরা অবশ্যি বুড়ীর এ কাজটাকে সমর্থন করতে পারেনি। ওর যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তারাও বলেছে, 'তোর এ কাজ সাজেনা বু, নাতীটারে কোথাও লাগালেও ট্যাহা পাবি, আমাগরে ভাগ্যে কি লেহাপড়া আছে।' কিন্তু সে কথায় কান দেয়নি জোমেলা। মোমেনকে লেখাপড়া শিখানোর অদম্য বাসনা ওর মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তুলতো ঝংকার ; কোচকানো চামড়ার নিচে হিমেল রক্তে রক্তে আনতো অদ্ভুত শিহরণ। নাতীকে সে দারোগা বানাবে। হাকিম বানাবে। যায় যাবে যে সাত

আট বিঘা জমি মোমেনের দাদা করেছিল বহু কষ্ট করে। আর না হয় জোমেলা শেষ পর্যন্ত ওর গায়ের মোটা মোটা রূপার গহনাগুলো বিক্রি করে দেবে। তবু নাতীকে জোমেলা মানুষ করবেই। নাতী ওর লেখা-পড়া শিখলে হয় তো হারানো সম্পত্তি আবার ফিরে পাবে। ওর এই অদম্য বাসনাকে কেউ টলাতে পারেনি কোন উপদেশ দিয়ে।

মোমেনের লেখাপড়া শেখানোর পিছনে ওর দাদীর এই অদম্য বাসনাই ছিল মূল। তাছাড়া মোমেন ছাত্রও ছিল ভাল। প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে শাহজাদপুর স্কুল থেকে যখন সে প্রথম বিভাগে দুটো লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলো তখন স্থানীয় অনেকেই বিস্মিত হয়ে গেছিলো। বুড়ী জোমেলাকে স্কুলের হেড মাষ্টার পর্যন্ত এসে উপদেশ দিয়েছিল তাকে কলেজে পাঠাতে। জোমেলা জানতো নাতী ওর খুব ভালভাবে পাশ করবে, তাকে আরো পড়াতে হবে। তাই সে প্রায় এক বছর হোল হাঁসের ডিম আর মুর্গীর ডিম না খেয়ে বেচে বেচে পয়সা জমিয়েছিল। একদিন মোমেনকে বাক্স খুলে একটি নেকড়ার পুঁটলী দেখিয়ে বললো, "গোনতো বাই পয়সাগুলি, তোর কলেজে যাওয়ার ট্যাহা এতেই হবি, ভাবত্যাছিস ক্যানে বাই, আমি থাকতে তোর ভাবনা নাই।" স্তম্ভিত হয়ে গেল মোমেন। গুণে দেখে অবাক হয় সে। দুই শো টাকা জমে গেছে দুই বছরে। আহ্লাদে ওর বুক ফুলে উঠলো। তা হলে সত্যিই তার কলেজে যাওয়া বন্ধ হবে না।

এক ভাল কলেজে ভর্তি হলো মোমেন। প্রথম শহরে এসে একটি নতুন দুনিয়া দেখে মোমেন একেবারে ভড়কে গেল। অবশ্যি ধীরে ধীরে সে খাপ খাইয়ে নিল নিজেকে শহুরে আবহাওয়ার সাথে। কিন্তু মুস্কিল, ওর দাদীকে ছাড়া মোমেন যেন কিছুতেই থাকতে পারতো না। এক মাস বাড়ী ছেড়ে থাকতেই ও হাঁপিয়ে উঠতো। ক্লাশে বসে মাঝে মাঝে ওর দাদীর কোঁচকানো মুখটার কথা মনে পড়ে মোচড় দিয়ে উঠতো মোমেনের প্রাণের ভেতর। এজন্য ঘন ঘন বাড়ী আসতো মোমেন। ওর দাদী কিন্তু তার একমাত্র নাতীর ঘন ঘন বাড়ী আসা ভালো চোখে দেখতে পারতো না। একদিন মোমেনকে বলেই ফেললো—'এত বাড়ী আসিস ক্যানে, পড়া-লেহা করতে হলে বাড়ীর মায়া ছাড়তে হয়।' অপরাধীর

ন্যায় জবাব দিল মোমেন—'তোমায় ছাড়া থাকতে পারি না যে, কেবল তোমার কথা মনে হয়।'

এত ঘন ঘন বাড়ী গিয়েও মোমেন পরীক্ষায় ভাল করলো। আই, এস-সিতে প্রথম বিভাগে পাশ করলো পদার্থ বিদ্যায় লেটার নিয়ে। তা ছাড়া মাসে কুড়ি টাকা করে বৃত্তিও পেলো মোমেন।

মোমেনের যদিও উচ্চশিক্ষার বাসনা ছিল কিন্তু দাদীর দুঃখ দেখে ওর বাসনাকে চাপা দিতে হলো। দাদীকে বললো—'এবার একটা চাকরী নেই, তুমি আর কত কষ্ট করবে। তোমার দুঃখ আমার সহ্য হয় না। তোমায় আমি আর কষ্ট করতে দেব না দাদী।' কিন্তু দাদী ওর দমবার পাত্রী নয়। সে মোমেনের কথা শুনে অবাক হয়ে বললো—'কস কি! তুই আর পড়বি না! তোকে যে আমি দারোগা বানাবো, হাকিম বানাবো, ব্যারিষ্টর বানাবো। বিদ্যার একেবারে শেষ পড়াবো। তোকে পড়তেই হবে। আমার জন্য তোর কুনু চিন্তা নাই। আল্লা আচে রে আল্লা আচে। তুই পড়তে যা।'

শেষ পর্যন্ত দাদীর চাপে মোমেনকে আবার পড়তে যেতে হোল। ঢাকায় ভর্তি হোল মোমেন। বি, এস,-সিতে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিল সে।

ঢাকায় এক অবসরপ্রাপ্ত দারোগার বাসায় জায়গীর থাকলো মোমেন। একটি মাঝারী রকমের দোতলা দালান, ওর নিচের তলায় একটি প্রকোষ্ঠে থাকবার জায়গা হোল মোমেনের। বাড়ীর অতি আধুনিক চালচলনের সাথে পরিচিত নয় বলে প্রথম প্রথম ওর বেশ একটু অসুবিধে হলো। কিন্তু সে শুধু দু'এক মাস। কিছু দিনের মধ্যেই মোমেনের চালচলনে বেশ-ভূষায় দেখা দিতে লাগলো আধুনিকতার সমস্ত লক্ষণ। কোট আর প্যাণ্ট, দু'চারটে জামা, শেরওয়ানী সবই তার দেহে শোভা পেতে লাগলো একে একে। আজ আর শুধু দেহাবরণের জন্যই জামা কাপড় নয়, দেহাবরণের চেয়ে দেহাকর্ষণ বাড়ানোই বড়। কিসে একটু ভাল দেখা যায় এর অযুত প্রচেষ্টা। মোমেনের হঠাৎ এই পরিবর্তনের অন্য সব কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল প্রধান। সেটা রূপানুরাগ। দারোগা সাহেবের বড় মেয়ে মাজেদাকে ওর খুব ভালো লাগতো। মাজেদার ঐ কালো

কালো চোখ দু'টো সরলতা মাখা মুখখানা আর দোহারা গৌরবর্ণ স্বাস্থ্য প্রথম দৃষ্টিতেই মোমেনের প্রাণে এনেছিল এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে রূপলাভ করলো অশ্রান্ত অনুরাগে। মোমেন কোনদিনও মেয়েদের সংস্পর্শে আসেনি। জীবনে প্রথম অনুরাগের ঢেউ এলো তার যে মেয়েকে দেখে, সে মাজেদা। তাই সে নিজেকে হাজার সংযত করতে গিয়েও পারলো না। পদে পদে যেন মাজেদার আকর্ষণ তাকে আঁকড়ে ধরলো। মাজেদাকে যতই ভুলতে চায় ততই যেন তাকে আরো আরো বেশী করে মনে পড়তে লাগলো মোমেনের। তার সমস্ত পৌরুষ যেন মাজেদার কাছে মাথা নীচু করে পরাজয় স্বীকার করলো। মাজেদার তরফ থেকেও সাড়া মিললো প্রচুর। সে আই, এস-সি ক্লাশের ছাত্রী। সময়ে অসময়ে সে আসতো মোমেনের কাছে পড়া বুঝে নেবার ছল করে। দারোগা সাহেবের এতে বাধা দিবার কিছুই ছিল না। মাজেদার মা অবশ্যি দু'এক মাসের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। দেখলেন মাজেদার চলা ফেরায় যে দুর্বার চাঞ্চল্য এসেছে, যে বেপরোয়া গতি এসেছে তা এর আগে কোনদিনও দেখা যায় নি। ব্যাপারটা আঁচ করে তিনি দারোগা সাহেবের কাছে একদিন বলেই ফেললেন। দারোগা সাহেব প্রথমটা মুখ ভারী করে বল্লেন—'হু, তাহলে এতদূর! আচ্ছা।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝে দেখলেন মোমেনের মত একটা ছেলের হাতে মেয়েকে সমর্পণ করা তেমন খারাপ কিছুই নয়, বরং এমন একটা ছেলে ক'জন পেয়ে থাকে।

শেষে সত্যি একদিন ওদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কথা মোমেন ওর দাদীকে লিখে জানালো। দাদী প্রথমটা কিছু বিস্মিতা, কিছু আহতা হোল, কিন্তু বুঝে দেখলো মোমেন তার ঠিকই করেছে। তবে তার চিন্তা হল মোমেনের লেখাপড়া শেষে নষ্ট না হয়। পাড়ার একটি ছেলেকে ডেকে সে মোমেনের কাছে চিঠি লিখাতো প্রায়ই। সে বেশ সুন্দর করে ছোট ছোট কথায় বুড়ীর মনের কথাগুলো লিখে দিত মোমেনের কাছে। এবারও লিখলো—

'স্নেহের ভাই, বিয়ে করেছো বেশ ভাল কথা। শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমাদের দু'জনকেই আমি আশীর্বাদ করি, সুখী হও। কিন্তু ভাই, লেখা-পড়ার দিকে নজর রেখো। আর আমার নতুন

বোনটিকে পেয়ে এ বুড়ী বোনকে ভুলে যাবেনা তো? সুযোগ পেলে আমার নতুন ছোট বোনটিকে সাথে করে এসে দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো। নিজের হাতে আশীর্বাদ করবো।—তোমার দাদী।'

দাদীর চিঠি পেয়ে মোমেন খুশী হলো, প্রেরণাও পেলো প্রচুর। প্রাণ-খোলা ভাষায় একটি উত্তরও দিল সে। কিন্তু পড়াশুনার চাপে এক বছরের মধ্যে ওর পক্ষে আর বাড়ী যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠল না। তার দাদীকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো মোমেন। দাদীও তার জবাব দিত যথা সময়ে।

শেষ পরীক্ষা দিয়ে মোমেন একবার দাদীকে দেখতে গেল বাড়ীতে। মাজেদাকে সাথে করে নেবার ইচ্ছে ছিল তার প্রচুর। কিন্তু মাজেদা অসুখের ছুতো দিয়ে যাওয়া অস্বীকার করেছিল। আর সাথে সাথে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিল যে, কোন এক নোংরা গাঁয়ের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে মারা পড়বার মত ইচ্ছে তার নেই। এমন কি, মোমেনের এই যাওয়াটাকে ভাল চোখে সমর্থন করতে পারেনি মাজেদা। মোমেন যেন অন্ধকার পল্লী থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসে, এ অভিপ্রায়ও মাজেদা জানিয়ে দিয়েছিল মোমেনকে। মোমেন মাজেদার কথাগুলোর কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি।

অনেকদিন পর জোমেলা মোমেনকে কাছে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। কিন্তু মোমেন আর সে মোমেন নেই। তার মধ্যে শহুরে হাবভাব খুব বেশী ঢুকে গেছে। পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট কুটিরে যে তার মোটেই মন বসছে না। দাদী তা বুঝতে পারলো না। ধরে নিল জোড়াছাড়া পাখী, তাই অমন ছটফট করছে।

মোমেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানবার ঔৎসুক্য জাগলো জোমেলার। একদিন সে জিজ্ঞেস করলো মোমেনকে—'তুই তা'লি এহন কি করবি মোমেন, চাকরি বাকরি দেখত্যাচিস কি।'

—না দাদী, চাকরি দেখছি না, তবে পরীক্ষায় ভাল হলে একটা কাজ করবো ইচ্ছে আছে,—শান্তভাবে জবাব দেয় মোমেন।

—কি কাজ!

—বিলেত যাব।

—বিলেত! ক'স কি! হেখানে গেলি নাকি লোকে ম্যাল্লোচ হয়। এত লেহাপড়া শিখ্যা তুই হেখানে যাবি ক্যানে।

—আরে বল কি, যারা জানে না তারাই ও কথা কয়। বিদ্যার গোড়াই তো সেখানে। সেখানে না গেলে কি বড় চাকরী হয় নাকি?

—কি জানি ভাই, তোরা সে সব জানিস, আমরা কিছু জানিও না। যা ভাল বুঝিস তাই কর। তবে দাদীর কথা মনে কর‍্যা সৎপথে চলিস। মনে রাখিস তুই গরীবের ছ্যালা।

—সে কথা জানি দাদী। তবে তোমার কষ্ট দেখলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় শুধু তোমাকেই দেখাশুনো করি।

—আমার আর কি কষ্ট। এখন কবে মরি কবে বাঁচি। তবে তুই যে মানুষ হলি এইটাই আমার বড় সুখের, আমি আর কুনু সুখ চাই না।

—না দাদী মানুষ এখনো হই নাই। মানুষ হতে হলে বিলাত না গেলে এ দেশের লোক তাকে মানুষ বলেই মানে না।

—তা যেতে চাস যা, তবে ট্যাহা কোথায়?

—টাকা লাগবে না, পরীক্ষায় ভাল ফল হলে বৃত্তি পাব। তাতেই চলবে।

—তা হলে যাওয়াই ভাল। আমি আশীর্বাদ করি খোদা তোর মনের আশা পুরা করুক। আমার জন্য ভাবিস না। খোদা একভাবে চালাবেই। তবে মর‍্যা গেলে আত্মা জিয়ারত করিস। তোর আতের এক মুঠ মাটি আমার কবরে দিস। দুনিয়ায় নিজের বলতে তো আর কেউ নাই।

মোমেন লক্ষ্য করেছিল, কথাগুলো বলতে বলতে বুড়ীর চোখ দিয়ে মুক্তার মত দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

বাড়ী থেকে যাবার আগে দাদীকে তত্ত্বাবধান করবার জন্য একটা ঝি মেয়েকে রেখে গেল মোমেন। তাছাড়া জমিগুলো একটা বিশ্বস্ত লোকের কাছে বর্গা দিয়ে তাকে বলে গেল যেন নিয়মিত ফসল দেয় এবং বুড়ীকে তত্ত্বাবধান করে। দাদীর যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়ে গেল ঝি-টাকে। তারপর একদিন বিকেলে দাদীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা হোল মোমেন।

যাবার সময় আশীর্বাদ শেষে দাদী বলে দিল—'বৌকে একবার দ্যাখাইয়া নিস!' মোমেন 'আচ্ছা' বলে পথ ধরলো। মোমেনকে যাবার পথে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিল তার দাদী। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত মোমেনকে দেখা গেল ততক্ষণ পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। মোমেন করতোয়া নদীর খেয়া পার হয়ে ওপারে আড়ালে মিশে গেল, আর দেখা গেল না! বুড়ীর দু'চোখ দিয়ে টস টস করে পানি গড়িয়ে পড়লো। কেন যেন সে অত্যন্ত বিচলিতা হয়ে উঠলো। কোন বারই মোমেনের যাবার সময় এমন তীব্র বেদনা তো তার বুকে লাগেনি! সে চেয়ে দেখলো একঝাঁক পাখী নদীর ওপারে পশ্চিম দিগন্তের পানে চলে গেল, আর ফিরে এলো না। তবে কি তার মোমেন, অনাথ পিতা মাতা হারা মোমেনও আর ফিরে আসবে না। চিন্তায় মন তার আরো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

সত্যি সত্যি মোমেন বিলেত গেল। সরকার থেকে বৃত্তি দিয়ে পাঠানো হোল তাকে সাগরপারে। যাবার প্রাক্কালে দাদীকে একটি চিঠিতে মোমেন জানিয়ে গেল সে বিলেত যাচ্ছে। মাত্র দু'বছর থাকবে সেখানে। তারপর এসে দাদীকে দেখাশুনো করবে, দাদীর যত্ন করবে; চিঠি পেয়ে দাদী খোদার কাছে হাজার বার মুনাজাত করল তার মোমেন যেন সুখে থাকে আর নিরাপদে ফিরে আসে ওর বাপের ছোট্ট ঘরে। সত্যি মোমেনকে লেখাপড়া শিখানোর স্বপ্ন জোমেলার সার্থক হয়েছে, এই খুনখুনে বৃদ্ধা বয়সেও এ জন্যই সে পরিতৃপ্তা।

দু'বছর চলে গেছে বছর তিনেক আগে। মোমেন ফিরে এসেছে। দেশে ফিরবার পূর্বেই ইসলামাবাদের বিজ্ঞান-গবেষণা কেন্দ্রে একটি বড় চাকুরীর অফার পায় মোমেন। সুতরাং ইংল্যাণ্ড থেকে ঢাকায় না ফিরে সোজা ইসলামাবাদে পৌঁছে চাকুরীতে যোগদান করে সে। মাজেদা ঢাকা থেকে গিয়ে ইসলামাবাদে তার সাথে মিলিত হয়। গবেষণা ও অফিস সংগঠন ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত থাকে মোমেন। মাসে তার প্রচুর বেতন। তার হুকুমে অনেক চাকর নফর ওঠে বসে।

খবরটি যে জোমেলা বুড়ীর নিকট পৌঁছেনি, তা নয়। মোমেন বিদেশে থাকাকালে দু'বছর সে এশার নামাজের পর প্রত্যেকদিন মোনা-

জাত করেছে তার মোমেন যেন ভাল থাকে, তার মোমেন যেন লেখাপড়ায় আরো ভাল করে, তার মোমেন যেন সহি সালামতে দেশে ফিরে আসে। কিন্তু দুটো বছর কেটে যাবার পর প্রত্যেক দিনই সে গভীর আশায় বুক বেঁধেছে, মোমেন এখন কবে যেন দেশে ফিরবে। তার জমিনগুলো বর্গা চষে যে বছিরদ্দি, তাকে ডেকে পর্যন্ত প্রায়ই ডাক ঘরে খোঁজ নেয়, কোন চিঠিপত্র এসেছে কিনা। কিন্তু কোন খবর নেই। দুটো বছরের সীমান্ত পেরিয়ে এরপর আরো দু'বছর গড়িয়ে চলে গেছে। তবু কোন খবর পায়নি জোমেলা।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি খবরটি এসেছে। মোমেন বিদেশ থেকে ফিরবার পর তিন বছরের মাথায় গ্রামের একটি ছেলেই বুড়ীকে খবর দেয়, তার কোন্ এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় নাকি মোমেনকে ইসলামাবাদে গাড়ী হাঁকিয়ে চলতে দেখেছে—সাথে তার স্ত্রী এবং ছোট্ট বেবী।

এ-খবরে জোমেলা প্রথম প্রথম বেশ মর্মাহতা হয়েছিল। সপ্তাহ খানেক সে ভালভাবে ঘুমুতেই পারলো না। কিন্তু পরে সে মনকে বুঝ দিল—বুঝ দিল এই বলে যে, মোমেন বড় চাকুরী করে। হাতে তার কত কাজ, তার অবসর হচ্ছে না, তাই আসতে পারছে না। তবে সময় ফুরসুত পেলেই মোমেন তার বুড়ী দাদীর কাছে আসবে—তার মৃত্যুর সময় শিয়রে বসে আয়তুল কুরসীর দোওয়া পড়বে, মুখে চামচে করে পানি দেবে এবং শেষে বুড়ীর দেহ কাঁধে করে গোরস্তানে নিয়ে যাবে। মোমেনের হাতের মাটি সে কবরে গেলে পাবেই।

মোমেনেরও যে মাঝে মাঝে বুড়ী দাদীর কথা মনে পড়ে না তা নয়—তবে আফিসে কাজের চাপে ডুবে থাকা, ঘরে গৃহিনী ও বাচ্চাকে সাহচর্য দান করা এবং মাঝে মাঝে পার্টি ডিনার ইত্যাদিতে যোগদান করা কিংবা সময় করে কখনো মাজেদা ও বেবীসহ দু'তিন সপ্তাহের জন্য মারী, নাথিয়া গলি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া—এই সবের মধ্যে তার জীবনের চাকা নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। সুতরাং মাঝে মধ্যে কদাচিৎ তার বুড়ী দাদীর কথা মনে পড়লেও এ-যেন একেবারেই একটি তুচ্ছ স্মৃতি-চারণ—যা কিনা বৃহত্তর এবং মহত্তর কর্ম ও চিন্তার চাপে পুড়িয়ে মথিত ও নিঃশেষিত হয়ে যায়। এ কারণেই মোমেনকে দেখলে মনে হয়, সে

যে একদিন বুড়ী জোমেলার ডিম বেচা পয়সায় লেখাপড়া শিখেছিল, একথা বোধ করি মোমেনের স্মৃতির খাতা থেকে মুছে গেছে। অবচেতন মনের পর্দায় এই স্মৃতির ছিটেফোঁটা কিছু এখনো জীবিত আছে কিনা, সে-কথাও কারো বলবার সাধ্য নেই। যদি থাকেও, বুড়ী জোমেলার তাতে কোন ফায়দা নেই।

বুড়ী জোমেলা আজ আর কোন ফায়দা কামনাও করে না। তার একমাত্র কামনা, মোমেন তার একবার এসে তাকে দেখা দিয়ে যাক, মরনের সময় তার কাছে বসুক, তার কবরে একমুঠো মাটি দিক। এ-যেন তার শুধু কামনাই নয়, এ তার অমোঘ বিশ্বাস। সে বিশ্বাস করে, যেখানেই থাকুক, যতটাকা বেতনের চাকুরীই করুক, যত লোকই তার কথায় উঠুক বসুক, যত বড় দফতরের কর্তাই সে হোক, বুড়ী দাদীকে মোমেন কোনদিন ভুলতে পারবে না—অন্তত নোংরা পল্লীর ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে চামড়া কোঁচকানো বুড়ী দাদীর কথা। সে একবার আসবেই। হয়তো এখন সময় পাচ্ছে না—কিন্তু একদিন পাবে, একদিন ঐ নিদারুণ শব্দ করা ট্রেনটি উল্লাপাড়া ষ্টেশনে এসে থামলে সেই ট্রেন থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে করে মোমেন তার মাটিতে নামবে—তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে এসে এই করতোয়ার খেয়া ঘাট পার হবে এবং রসুলপুর গ্রামে পা দিয়েই ডাকন—"দাদী, ও দাদী! আমি এসেছি।" এই বিশ্বাসে, এই অশান্ত ভরসায় এখনো প্রায় রোজই বিকেলে সে ছোট্ট খড়ের চাল-ভাংগা কুঁড়ে ঘর থেকে একটি লাঠি ভর দিয়ে কুাব্জ পৃষ্ঠে নদীর পূব পাড়ে রাস্তার ধারে নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসে। ওখানে বসে উদাস দৃষ্টিতে নদীর পশ্চিম পাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। বুড়ী হয়তো কুল-কুল স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—করতোয়া ঝির-ঝির করে বয়ে চলেছে, তার মোমেন যখন ছোট্ট ছিল, এই নদীর ধার দিয়ে শাহজাদপুর স্কুলে পড়তে যেতো, তখনো এমনি করেই নদী বয়ে যেতো। এখনো তেমনি বয়ে যায়। নদী আছে, শুধু তার মোমেন নেই। মোমেন নদীর ওপারে চলে গেছে। হয়তো নদীর ওপারে যে যায় সে আর ফিরে না। কিন্তু লোকে তো বলে, মোমেন আছে, সে ইসলামাবাদে অনেক টাকা বেতনে চাকুরী করছে। হয়তো সে ছুটী পাচ্ছে না। ছুটী পেলেই মোমেন তার বুড়ী দাদীকে দেখতে আসবে। বুড়ী জানে মোমেন ওর আসবেই। এই

বিশ্বাসে এবং এই ভরসায় রোজ রোজ বিকেলের ট্রেন চলে গেলে বুড়ী খড়ের কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে লাঠি ভর দিয়ে নদীর পারের দিকে আসে। আজকাল লাঠি ছাড়া সে আর চলতে পারে না, চলতে তার খুবই কষ্ট। পিঠ তার বেঁকে গেছে। চলতে গিয়ে মনে হয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।

প্রতিদিনই সে নদীর পাড়ে আসে আর সুর্যাস্তের পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে যায়, মোমেন তার আসে না। তবু সন্ধ্যার পূর্বে নদীর পাড়ে তার যাওয়া চাই, কখন কোন ফাঁকে তার মোমেন যদি এসেই পড়ে।

আবু ইসহাক

……

জোঁক

সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরো পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদর পূর্তির নাম চাষী-মজুরের ভাষায় পেটে জামিন দে'য়া। চা'ল যখন দুর্মূল্য তখন এ ছাড়া উপায় কি ?

ওসমান হুঁকা নিয়ে বসে আর মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল। হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছয় বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে—এই তেল মালিশ করলে কি অয় মা ?

—পানিতে কামড়াইতে পারে না ! উত্তর দেয় মাজু বিবি।

—পানিতে কামড়ায়। পানির কি দাঁত আছে নি ?

—আছে না আবার। ওসমান হাসে।—দাঁত না থাকলে কামড়ায় ক্যামনে ?

টুনি হয়ত বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে—ঘাস-লতা-পাতা, কচু ঘেচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া যায়। অই পানি গতরে লাগলে কুটকুট করে। ওরেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুঁকা রেখে হাঁক দেয়—কই গেলি তোতা, তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভালো করে মালিশ করে। মাথা আর মুখে মাখে সর্ষের তেল। তারপর কাস্তে ও হুঁকা নিয়ে সে নৌকায় উঠে।

তেরোহাতি ডিঙিটাকে বেয়ে নিয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা। ওসমান পায়ের চটচটে তেল মালিশ করতে করতে চারিদিকে চোখ বুলায়।

শ্রাবণ মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। থাম খেয়ালী বর্ষণ বৃষ্টির। আউশ ধান উঠে যাওয়ায় আমনধানের গাছগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগাগুলো চিকচিক করছে ভোরের রোদে।

দেখতে দেখতে পাট ক্ষেতে এসে যায় নৌকা। পাট গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছে, লম্বাও হয়েছে প্রায় দুই-মানুষ সমান। তার খাঁটুনি সার্থক হয়েছে। সে কি যেমন তেমন খাঁটুনি। রোদ বৃষ্টি মাথায় করে ক্ষেত চষো রে—ঢেলা ভাঙোরে—উড়া বাছোরে—তারপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোন। পাটের চারা বড় হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো! 'বাছট' করে খাটো দুর্বল গাছগুলোকে তুলে না ফেললে সবগুলোই টিঙটিঙে থেকে যায়। কোষ্ঠায় আর পাওয়া যায় না মোটেই।

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে-ত শুধু ভাগচাষী। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড় চাকরী করেন। দেশে গোমস্তা রেখেছেন। সে কড়ায় গণ্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময় তাঁর ছেলে ইউসুফ ঢাকা থেকে আসে। ধান পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময় ও এক-বার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপ সই নিয়ে গেছে ভাগচাষীদের। এর আগে জমির বিলি ব্যবস্থা মুখেমুখেই চলত।

দীর্ঘ সুপুষ্ট পাট-গাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবে আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত!

ওসমান লুঙ্গিটাকে কাছা মেরে নেয়। জোঁকের ভয়ে শক্ত করেই কাছা মারতে হয়। ফাঁক পেলে জোঁক নাকি মলদ্বার দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে নাড়ী কেটে দেয়।

ওসমান পানিতে নামে। পচা পানি লাল কেরোসিনের মত দেখতে। গত দু'বছরের মত বন্যা হয়নি এবার। তবু বুক সমান পানি পাট-ক্ষেতে। এ পাট না ডুবিয়ে কাটবার উপায় নেই।

কতগুলো পাট-গাছ একত্র করে দড়ি বাঁধে ওসমান। ছাতার মত যে ছাউনিটা হয় তার নিচে হুঁকা, তামাকের ডিবা, আগুনের মালশা ঝুলিয়ে রাখে সে 'টাঙনা' দিয়ে।

নৌকায় থেকে কাস্তেটা তুলে নিয়ে এবার সে বলে, তুই নাও লইয়া যাগা। ইস্কুলতন তাড়াতাড়ি আইসা পড়বি।

—ইস্কুল ত চাইরটার সময় ছুটি অইব।

—তুই ছুটি লইয়া আগে চইলা আইস।

ছুটি দিতে চায় না যে মাষ্টার সাব।

কামের সময় ছুটি দিতে পারবে না, কেমন কথা! ছুটি না দিলে জিগাইস আমার পাটগুলো জাগ দিয়া দিতে পারব নি তোগ মাষ্টার।

তোতা নৌকা বেয়ে চলে যায়। ওসমান ডুবের পর ডুব দিয়ে চলে। 'লোহারুর' দোকান থেকে সন্থ আল কাটিয়ে আনা ধারাল কাস্তে দিয়ে সে পাটের গোড়া কাটে। কিন্তু চার পাঁচটার বেশী পাট কাটতে পারে না এক ডুবে। এক হাতা পাট কাটতে তিন চার ডুব লেগে যায়। একের পর এক দশবারো ডুব দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা দমটাকে তাজা করবার জন্য জিরোবার দরকার হয়। কিন্তু এই জিরোবার সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করবার উপায় নেই। কাস্তেটা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে হাঁতা বাঁধতে হয় এ সময়। প্রথম দিকে দশ ডুবে তিন হাতা কেটে জিরান দরকার হয় কিন্তু ডুবের এই হার বেশীক্ষণ থাকে না। ক্রমে আট ডুব, ছয় ডুব, চার ডুব, দুই ডুব এমন কি এক ডুবের পরেও জিরান দরকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ডুব প্রতি কাটা পাটের পরিমাণও কমতে থাকে। শুরুতে যে এক হাতা পাট কাটতে তিন চার ডুব লাগে তা কাটতে শেষের দিকে লেগে যায় সাত আট ডুব।

পেটের জামিনের মেয়াদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাজ ভালোই হয়। মাঝে মাঝে তামাক খেয়ে একটু গরম করে নিতে হয় শরীরটাকে, এই যা। বেলা পিঠের ওপর উঠবার আগেই পেটের মধ্যের ক্ষুধারাক্ষস খাম-খাম শুরু করে দেয়। ওসমান আমল দেয় না প্রথম দিকে। পাট কেটেই চলে ডুব দিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমল দিতে হয় যখন মোচরানি শুরু হয় নাড়ী-ভুড়ির মধ্যে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা ঝিম ঝিম করে, হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

ওসমান একবার ভাবে ঘরে যাওয়ার কথা ; ডাকবে নাকি সে ছেলেকে নৌকা নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু কাজ যে অর্ধেকও হয়নি এখনো। আশী হাতা পাট কাটবার সঙ্কল্প নিয়ে সে জমিতে এসেছে।

পরক্ষণেই আবার সে ভাবে—তোতা ত এখনো ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। আর ঘরে এত সকালে রান্না হওয়ার কথাও ত নয়।

পাশেই কিছুদূরে একটা শালুক ফুল দেখতে পায় ওসমান। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পেটে জামিন দেওয়ার এত সহজ উপায়টা মনে না থাকার জন্য নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। এদিক ওদিক থেকে ডুব দিয়ে দিয়ে সে শালুক তোলে গোটা দশ বারো। ক্ষুধার জ্বালায় বিকট গন্ধ উপেক্ষা করে কাঁচাই খেয়ে ফেলে তার কয়েকটা। বাকীগুলো মালশার আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে নেয়।

ওসমান আবার শুরু করে—সেই ডুব, পাটের গোড়া কাটা, হাতা বাঁধা।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। প্রত্যেক ডুবের পর জিরোতে হয় এখন। পাট ত একটা দু'টোর বেশী কাটা যায় না এক ডুবে। অনেকক্ষণ পানিতে থাকার দরুন শরীরে মালিশ করা তেল ধুয়ে গেছে। পানির কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে এখন। ওসমানের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে গালাগালি দিয়ে ওঠে। আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি আর এই শালার পাটগুলো মোটা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান্ চিক্কন চিক্কন অইতে দোষ আছিল কী? হে অইলে এক পোচে দিতাম সাবাড় কইর্যা।

ওসমান তামাক খেতে গিয়ে দেখে মালশায় আগুন নিভে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল এক পশলা। পাটগাছের ছাউনি বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি।

ওসমান এবার ক্ষেপে যায়। গা চুলকাতে চুলকাতে সে একচোট গালাগাল ছাড়ে বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশ্যে। তারপর হঠাৎ জমির মালিকের ওপর গিয়ে পড়ে তার রাগ। সে বিড়বিড় করে বলে—ব্যাটাত ঢাকার শহরে ফটেং বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিয়া আগাডা ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডারে একদিন পচা পানির কামড় খাওয়াইতে পারতাম!

ওসমান আজ আর কাজ করবে না। সিদ্ধান্ত করবার সাথে সাথে সে জোরে ডাক দেয়—

—তোতারে—উ···

দুই ডাকের পর ওদিক থেকে সাড়া আসে ; আসি—অ···

—আয়, তোর আহিজ বাহির করমু হনে।—পাটের হাতাগুলো এক জায়গায় জড় করতে করতে গজগজ করে ওসমান।—আমি বুইড়্যা খাইট্যা মরি আর ওরা একপাল আছে বইসা গিলবার।

তোতা নৌকা নিয়ে আসে। এত সকালে তার আসার কথা নয়। তবুও ওসমান ফেটে পড়ে—এতক্ষণ কি করছিলি, অ্যা? তোরে না কইছিলাম ছুটি লইয়া আগে আইতে। ছুটি না দিলে পলাইয়া আইতে পারস নাই ?

—আগেই আইছিলাম। মা কইছিল—আর এটু দেরী কর। ভাত অইলে ফ্যানডা লইয়া যাইস।

—ফ্যান আন্ছস্। দে-দে শিগ্গীর।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশান এক খোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এ জন্যে স্ত্রীকেও সে ধন্যবাদ দেয় অব্যক্ত ভাষায়।

এ রকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ দশা হয়েছে। অথচ কতই বা আর তার বয়স। চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে নৌকায়। গুণে গুণে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে—কী রান্ছেরে তোর মা ?

—ট্যাংরা মাছ আর কলমী শাক।

—মাছ পাইল কই ?

—বড়শী দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশী হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কানিতে দুই হাতের ভর রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

—তোমার পায়ে কালা উইডা কী বাজান? তোতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে।

—কই?

—উই যে। জেঁাক না জানি কী! আঙ্গুল দিয়ে দেখায় তোতা।

—জেঁাকই ত রে! এইডা আবার কখন লাগল? শীগ্‌গির কাচিটা দে।

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরেই ধরেছে জেঁাকটা। প্রায় বিঘত খানেক লম্বা। করাতে জেঁাক। রক্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জেঁাকের বুকের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জেঁাকটা কাস্তের সাথে চেপে ধরে পোঁচ মারে সে। জেঁাকটা দু'টুকরো হয়ে যায়, রক্ত ঝরাতে ঝরাতে খসে পড়ে পা থেকে।

—আঃ, বাঁচলাম রে! ওসমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

—ইস, কত রক্ত। তোতা শিউরে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়, নে, এইবার লগি মার তাড়াতাড়ি।

তোতা পাঠ বোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জেঁাক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে,—বাজান কেমুন কইর‍্যা জেঁাকে ধরল তোমারে, টের পাও নাই?

—না রে বাজান। এগুলো কেমুন কইর‍্যা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে।

—জেঁাকটা কত বড়, বাপ্পসরে—

—দূও বোকা। এইডা আর এমুন কী জেঁাক। এর চে বড় জেঁাকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেওয়া, কোষ্ঠা ছাড়ান, কোষ্ঠা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো—এ সব কাজগুলোও কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। একজন কয়াল ও দাড়ি পাল্লা নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ীর ঘাটে।

বাপ বেটায় শুকনো পাট এনে রাখে উঠানে।

মেপে মেপে তিন ভাগ করে কয়াল।

ওসমান ভাবে—তবে কি তেভাগা আইন পাশ হয়ে গেছে। তার মনে খুশী ঝলক দিয়ে উঠে।

গোমস্তা হাঁক দেয়—কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দ্যাও।

ওসমান হা করে চেয়ে থাকে।

—আরে মিয়া চাইয়া রইছ ক্যা? যাও?

—আমারে কি এক ভাগ দিলেন নি?

—হ।

—ক্যা?

—ক্যা আবার! নতুন আইন অইছে জান না? তেভাগা আইন।

—তেভাগা আইন! আমি ত হে অইলে দুই ভাগ পাইমু।

—হ দিব হনে তোমারে দুই ভাগ। যাও ছোড হুজুরের কাছে।

—হ এহনই যাইমু।

—আইচ্ছা যাইও যখন ইচ্ছা। এহন পাট দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দিয়া কথা কও।

—না, দিমু না পাট। জিগাইয়া আহি।

—আরে আমার লগে রাগ করলে কি অইব যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কয়েন, তহন না হয় কানে আইট্যা ফিরত দিয়া যাইমু।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানার বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। তার পেছনে তোতা।

—হুজুর, ব্যাপারডা কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। ওসমান বলে।

—কী ব্যাপার? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ।

—হুজুর, তিন ভাগ কইর‍্যা এক ভাগ দিছে আমারে।

—হ্যাঁ, ঠিকই ত দিয়েছে।

ওসমান হা করে চেয়ে থাকে।

—বুঝতে পারলে না। লাঙ্গল-গরু কেনার জন্য টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচ শ'।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আমি টাকা নিছি! কবে নিলাম হুজুর।

—হঁ্যা, এখন ত মনে থাকবেই না। গত বছর কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে? গরু-লাঙ্গল কেনার টাকা দিয়েছি। এ জন্যে আমরা পাব দু'ভাগ, তোমরা পাবে এক ভাগ। তে ভাগা আইন পাশ হয়ে গেলে আধাআধা সেই আগের মত পাবে।

—আমি টাকা নেই নাই। এই রহম জুলুম খোদাও সহ্য করব না।

—যা-যা ব্যাটা, বেরো। বেশি তেড়িবেরি করলে এক কড়া জমি দেব না কোন ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ইউসুফ ক্রূর হাসি হেসে বলে—তেভাগা! তেভাগা আইন পাশ হওয়ার আগে থেকেই 'রিহার্সাল' দিয়ে রাখছি।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে—আইন! আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে! আমরা স্থঁচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই! হোক না আইন। কিন্তু আমরা জানি কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁহ্‌হুঁ।

শেষের কথাগুলো ইউসুফের নিজের নয়। পিতার কথাগুলোই ছেলে বলে পিতার অনুকরণে।

গত বছরের কথা। প্রস্তাবিত তেভাগা আইনের খবর কাগজে পড়ে ওয়াজেদ চৌধুরী এমনি করেই চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

আইনের একটা ধারা ছিল—"জমির মালিক লাঙ্গল গরু সরবরাহ করিলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইবেন।"—এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের জন্য তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে কাগজে কাগজে টিপসই আনিয়েছিলেন ভাগ-চাষীদের।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে,—বা'জান কেমুন কইর‍্যা লেইখ্যা রাখছিল। টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়—আহ্-হা-রে।

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনো দেখেনি।

চৌধুরী বাড়ীর সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে—করিম গাজী, নবু খাঁ ও আরো দশ বারোজন ভাগচাষী এ দিকেই আসছে।

করিম গাজী ডাক দেয়—কি মিয়া শেখের পো। যাও কই?

—গেছিলাম এই বড় বাড়ী, ওসমান উত্তর দেয়। —আমারে মিয়া মাইর্যা ফালাইছে এক্কেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচ শ'—

কথা শেষ না হতেই নবু খাঁ বলে—ও, তুমিও টিপ দিছিলা কাগজে?

—হ ভাই, কেমন কইর‍্যা যে কলমের খেঁাচায় কি লেইখ্যা থুইছিল, কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমনডা অয়। টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল, "জমি বর্গা নিবা তার একটা দলিল থাকা ত দরকার।"

—হ, বেবাক মানুষেরই এমবায় ঠকাইছে, করিম গাজী বলে—আরে মিয়া এমন কারবারডা অইল আর তুমি ফিরা চল্‌ছো?

—কি করমু তয়?

—কি করবা! খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী।—চল আমাগ লগে, দেহি কি করতে পারি।

ওসমান দেখে এদের সকলের হাতে লাঠি।

করিম গাজী তাড়া দেয়—কি মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যা? আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু?

ওসমান তোতাকে ঠেলে দিয়ে বলে, তুই বাড়ী যা গা।

তার ছিমিয়ে পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে—হ চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

কয়লা কুড়ানো দল

রাত শেষ হয়ে আসছে। এ সময়টায় অনেকেই একটু গা এলিয়ে ঘুমোয়। কিন্তু ষ্টেশনে মালগাড়ির ইঞ্জিনটা পনেরো কুড়ি মিনিট এমন গোল করতে থাকে যে, অতি আয়েশীরও না জেগে উপায় থাকে না। কয়লা-কুড়ানো ছেলেদের কাছ থেকে এর অন্য রকম মানে শোনা যায়। ওরা বলে, সারারাত ভারী ওয়াগনের বহর টেনে ইঞ্জিনটা বেজায় কাহিল হয়ে পড়ে। তাই খিদের জ্বালায় এমন তর্জন-গর্জন। পেট ভরে পানি খাইয়ে ছেড়ে দিলেই আবার পিলপিল করে চলতে থাকবে।

এ ব্যাপারে পদ্মমাসীর মনোভাবটা কি জানা যায়নি। তবে একথা ঠিক, তার ঘুম ভাঙার জন্যে কোনরকম গোলমালের দরকার হয় না। দূর থেকে গাড়ির চাকার আওয়াজ শুনেই চট করে চোখের পাতা খুলে যায় তার, আর সে একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসে বিছানার ওপর। আসলে, এসময়ের টানটা তার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। কোন কারণে গাড়ি না এলেও এসময়ে ঠিক এমনিভাবে ঘুম তার ভাঙবে। শরীরের কাপড় ঠিক করে আচ্ছন্নের মতো উঠে গিয়ে খিলটা খুলবে দুয়ারের, বাইরে বেরিয়ে বটগাছের ফাঁকে ঘাড় উঁচু করে দেখবে পূর্ব দিকটা ফর্সা হয়েছে কিনা। শুকতারাটা কোথায়। এরপর ঘরে গিয়ে পাতিলে তোলা আগুনে পাটশলা গুঁজে কেরোসিনের কুপিটা জ্বালবে।

অন্য দিনের মতো আজও তাই হল। আলোটা জলচৌকির ওপর রেখে পদ্মমাসী ঘরের এক কোণায় মাচানে রাখা হাঁড়ি পাতিলের কাছে যায়, কাঁসার থালাটা ধুয়ে তার মধ্যে চিপে চিপে রাখে পান্তা ভাত।

সব ঠিকঠাক করার পর আসল কাজ। তা হল, মনুকে ঘুম থেকে জাগানো, খাওয়ানো ; এরপর বাইরে পাঠানো। মুখে বলে ফেলা সহজ,

কিন্তু এ করতে রীতিমতো মগজ খাটাতে হয়। কোকড়ানো বালিশটা আঁকড়ে ধরে ও ঘুমোচ্ছিলো উপুড় হয়ে, পদ্মমাসী মুখ ধুয়ে এসে ওর পাশে গিয়ে বসে। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর ওর ঘাড়ে পিঠে আলতো-ভাবে ধরে সোজা করে বসায়। অচেতন মুখটা ঝুলে পড়ে তার বাঁ হাতের ওপর।

ডান্ হাতটা পাশের ঘটির ভেতরে ঢুকিয়ে আবার বার করে এনে পানির ছিটে দেয় মনুর চোখেমুখে। ভেজা আঙুলে মুখটা মুছতে মুছতে ওর কানের কাছে বেশ জোরে বলতে থাকে, 'সকাল হয়েছে। মনু, বাবা চোখ মেল!'

মনু 'উহু' শব্দ করে হয়তো বালিশ ভেবে মাসীর উরুর উপর শুয়ে পড়তে যায়। কিন্তু সে মুহূর্তে কাঁধে একটা প্রবল ঝাঁকানি অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ খুলে যায় আপসে। মাসী বলতে থাকে, "আর কটা দিন বাবা। এর পর তোকে আর একাজে পাঠাব না। সাড়ে সাত টাকা হয়েছে। আর আড়াই টাকা, ব্যস। দশ টাকা হলেই মুড়ি ভাজবার পয়সা হয়ে যাবে। তখন তোকেই স্কুল পাঠাব, কেমন?"

এসব কথায় মনু বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হয় না। গত তিনটি বছর ধরে সে প্যানপ্যান করছে পড়তে যাবে বলে, আর এসবই শুনে আসছে রকমফের ভাষায়। সে জানে, এ মাসীমার টালবাহানা। তবু চোখ কচলে ও উঠে দাঁড়ায়। বয়স বারোর মতো। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। উজ্জ্বল একজোড়া চোখ শুধু তার কৈশোরের অধিকারকে বাঁচিয়ে চলেছে। যে যাই বলুক, হৃদয়ের কতটুকু যায়গা ও দখল করে আছে, তা মাসী ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে চায় না। মনু না হয় তার আপন বোনের ছেলে নয়, তা' বলে কেউ বলতে পারবে যে, ওকে অনাদরে রেখেছে কোনদিন? পঞ্চাশের আকালের সময় পোয়াতি মেয়েটা কঁকাতে কঁকাতে এসে পড়ল বটগাছের তলায়, তখন কি গাঁয়ের কেউ এসে এর তদারক করেছিল? সে অভাগী কেমন বাপের বেটী কে জানে, চাঁদের টুকরো ছেলেটাকে মাটিতে ফেলেই একেবারে স্বর্গে চলে গেল। দুধের বাচ্চার মা না থাকলে তাকে পালাপোষা করা যে কেমন ঝকমারি, তা কেউ ভাবতে চায় না। পরের মুখের ঝাল খেয়ে সবাই বলে, মাসী এমন সোনার ছেলেটাকে সুটকি করে মারল। শত হলেও নিজের পেটে তো ধরেনি।

ভাত খাইয়ে মাসী কাপড় দিয়ে মুছে দেয় মনুর মুখটা। এরপর বেতের টুকরিটা ওর হাতে তুলে দেয়। মনু গামছা দিয়ে ঢেকে নেয় সার্টের ছেড়া অংশগুলো। টুকরিটা কাধের কাছে হাতে ধরে আস্তে আস্তে বারান্দায় গিয়ে নামে সে। মাসী এগিয়ে গিয়ে ওর পকেটে একটা কলা গুঁজে দেয়। বলে, 'আজকে বেশী দেরী করিসনে, কেমন ?'

মনু কারণটা কি জানতে চায়না। সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'আচ্ছা।'

চোখের পাতা একেকবার বুঁজে যেতে চায় তন্দ্রার ভারে। কেবল মনের জোরকে জাগিয়ে রেখে মনু চলতে থাকে। টিলা ছাড়িয়ে রেললাইনে যেতে মাঝখানে একটা ছোট নালা। পানি বেশি নেই। একটু সাবধানে গেলে কাপড় বাঁচে। তবু ওপরের বাঁশের পুলটা দিয়ে পার হওয়াই নিরাপদ। রাতের বেলা সাপের দুলালরা হাওয়া খেতে বেরোয়, মানুষের চামড়ার গন্ধ যে তাদের লোভনীয় নয়, তা কে বলতে পারে। কোমর ভাঙা সাঁকোটা নড়তে থাকলেও মনু গতরের ওজন ঠিক রেখে ওপারে গিয়ে ওঠে।

সকালের দিকে ষ্টেশনের বাতিগুলো ভূতের চোখের মতো জ্বলে। কংক্রিটের বেঞ্চিতে যাত্রীরা উঠে বসছে। প্ল্যাটফর্মে লোকজনের কিঞ্চিৎ নড়াচড়া শুরু হয়েছে। ইঞ্জিনটার পানি-খাওয়া এখনো শেষ হয়নি। মনু সিগনালের কাছে দাঁড়িয়ে ডানপাশের লাইনটার দিকে থাকে।

অন্ধকারই বলতে হবে। যে লাইনটা নিচের পাড়া থেকে লাইনের ওপরে উঠে এসেছে, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পরও তা চোখে ধরা যায় না। মনু সামনে পিছনে ডান বাঁয়ে তাকায় ঘুরে ঘুরে। তাহলে কেউ আসেনি এখনো? সেই প্রথম এসেছে ?

কিন্তু সোনাভানের কি হল ? অন্যদিন কাক ডাকার আগেই সে চলে আসে, অন্যেরা গিয়ে দেখে ওর টুকরি অর্ধেক ভরে গেছে। বয়স দশ হলে হবে কি, ওর ভারি চিকন বুদ্ধি। ওর সংগে পাল্লা দিয়ে কেউ পারে না। কয়লা অনেকেই কুড়ায়, কিন্তু তা দিয়ে পয়সা তুলতে পারে কয়জন ? আর সিলেটী হোটেলওয়ালারা যা চশম-খোর, বিনি পয়সার জালানি পেলেই যেন বাঁচে। ভরা এক টুকরি কয়লার দাম পাঁচ ছ' আনার বেশি দিতে চায় না। একলা পেলেই ঠকায়। কিন্তু সোনাভানের কাছে এসব জারিজুরি খাটেনা। সে ছয় আনার যায়গায় আট আনা ঠিক আদায় করে নেয়।

কেমন করে ? না, মুখের ধারে। দেখতেও খারাপ নয়, তাতে আবার এমন কায়দা করে কথা বলতে জানে, হোটেলওয়ালা বোকার মত খলখল করে হাসে, কখন দু'তিন আনা বেশি দিয়ে দেয়, টেরই পায়না। বেচারী সোনাভান। এত খাটুনির পরও ক'পয়সা আর মেলে ? অথচ অচল কানা বাপটারে, বলতে গেলে, সে-ই পালন করছে।

বেতের টুকরিটা কাঁধে আটকে ধরে মনু দাঁড়িয়ে থাকে। ইঞ্জিন কখন চলে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। কড়া হুইশেল আচমকা কানে বাজতেই হাত পা খাড়া হয়ে ওঠে ওর। তাড়াতাড়ি গামছাটা কোমরে পেঁচিয়ে নেমে যায় লাইনের পেটে সানের পাকায় গড়া খাদটার ভেতরে। দু'হাত চওড়া, আর হাত দশেক লম্বা পাকা খাদটা লোহার গন্ধ-মেশানো ধোঁয়ায় ভরা। মনু দু'হাত সঞ্চালন করে ধোঁয়াগুলো তাড়াতে চায়। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়না, ফুস-ফুসটা শুধু ভরে ওঠে। এদিকে আবার পা কামড়ে ধরে পোড়া কয়লার গরমে। কিছুদিন আগেও ওর একজোড়া ক্যানভাসের জুতো ছিল, তখন এতটা লাগত না। কিন্তু তাও গেছে ছিঁড়ে। নীচের ঠোঁটটা দাঁতে চেপে ধরে এক নিঃশ্বাসে অনেকক্ষণ কয়লা কুড়ায় সে, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ওপরের বাতাসে মুখ খুলে হাঁপায়।

কিছুক্ষণ পর ওপরের কাঁকরে খসখসে পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় মনু। এ শব্দ তার পরিচিত। সোনাভান এসেছে কিন্তু এত দেরী হল কেন আজ ? কতক্ষণ কাজ বন্ধ রেখে সে কানখাড়া হয়ে বসে থাকে। খুকখুক করে কাশছে কে ? রূপভানের অসুখ করেছে নাকি ?

মনু গলা উঁচু করে দেখতে চায়। কিন্তু তাতে মজাটা নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সে চুপচাপ বসেই থাকে। সোনাভানের খাটো গলার আওয়াজ শোনা যায়, 'দেখ রূপী, এখনো জ্বালাস যদি, বেশি ভাল হবে না। এমন অসুখ যেন আর কারো হয় না!'

সে রূপভানকে দু'হাতে ধরে এনে খাদে নামিয়ে দেয়। এরপর নিজে নামে টুকরি নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার তীক্ষ্ণগলার জিজ্ঞাসা, 'কে ?'

'আমি।' মনু মুখ বাড়িয়ে জবাব দেয়।

'ও।' সোনাভান অভিমানের সুরে বলে, 'তুইনা কইছিলি আমার আগে আসবি না ?'

'মাসি তুলে দিল, আমি কি করব!'

'মাসি তুলে দিলেই হল, তুই ওপরে বসে থাকলি না কেন?' সোনাভান মনুর টুকরিটা কাত করে দেখে বলে, 'দেখছ সব কয়লাই যে'—

মনু মৃদু প্রতিবাদ করে, 'এ বুঝি সব কয়লা! তোর খালি বেশতি কথা। এই হাতড়ে দেখতো। এখনো পাঁচ ছয় টুকরি হবে।'

সোনাভান আর কোনো কথা বলে না। মনু বুঝল, ওর রাগ হয়েছে। অবশ্য এর কোনো মানে হয় না, তবু রাগ হয়েছে একথা ঠিক। কেউ তার আগে উঠে আসবে এ সে ভাবতেই পারে না। তাছাড়া মনু কথা দিয়েছিল, কোনদিন আগে এসে পড়লে সে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। সকলেই নিজের নিজের মতলবে আছে। না হলে এমন একটা কাজ সে করতে পারে? মনের ঝালটা সোনাভান ছোট বোনের ওপর ঝাড়ে। রূপভানের পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলে, 'জলদি করিস না কেন?'

রূপভানের শরীর সত্যিই খারাপ। একে তো জ্বর, তার ওপর খুসখুসে কাশি। গায়ে তেনার মতো ডোমাটা জড়িয়ে সে জড়সড় হয়ে বসেছে।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে চারিদিক ফর্সা হয়ে আসার সঙ্গে একে একে এসে হাজির হয় দলের প্রায় সবাই। কে কার আগে টুকরি ভরবে, তখন সকলের এই এক দিশে। একেকবার আড়চোখে সোনাভানের মুখের দিকে চেয়ে দেখে মনু, সে মুখ কালি করে বসে কয়লা কুড়োচ্ছে। প্রথমটা মনুর হাসি পায়। কিন্তু বারবার চেয়েও যখন ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না, তখন ওর উৎসাহ নিভে যায়। যাক, কথা না বলুক এতে কি যায় আসে?

রূপভান বারে বারে কেশে ওঠে। বড়বোন কটমটিয়ে তাকায়, বলে না কিছু। ওর গালে চোখের পানি শুকিয়ে আছে। শেষ রাতের দিকে জ্বর একটু বেশিই ছিল, তাই কাঁথার নিচ থেকে জোর করে টেনে তোলায় সে কান্নাকাটি শুরু করেছিল। কিন্তু কাঁদলেই তো হল না। পেটে দানা-পানি দিতে হবে তো। আর তাছাড়া সোনাভান নিজের উপর পরখ করে দেখেছে, অসুখ করলে যদি কেউ বিছানায় পড়ে থাকে, তাহলে তা বাড়ে বৈ কমে না। অপর পক্ষে দাঁত কিড়মিড়িয়ে কষ্টটা সহ্য করে কাজে

লেগে থাকলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়। বিশেষ করে, জ্বরের বেলায় একথাটা আরো সত্যি।

সকালের আবছা আলোর আভায়, খাদের ভেতরে শুধু দেখা যায়, কতকগুলো জটপাকানো মাথা, ইঞ্জিনের ছেড়ে যাওয়া পোড়া কয়লার স্তূপের ওপর ঝুকে বসেছে, চামড়ায় সেটে-যাওয়া হাতগুলো নড়ছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর রূপভান ভীষণভাবে কাশতে থাকে। চোখ মুখ লাল হয়ে শ্বাসরোধের যোগাড়। চরম মুহূর্তে তাল রাখতে না পেরে, হঠাৎ এক সময় পড়ে যায় সে কাত হয়ে। মুখের দুই কষে ফেনা দেখা দিয়েছে।

'গেল, পড়ে গেল।' কানা চেঁচিয়ে উঠে এক পাশ থেকে।

'এইরে চোখ উলটিয়ে দিয়েছে।' মনু লাফ দিয়ে উঠে দু'জনাকে ডিঙিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার আগেই সোনাভান নিজের বোনকে তুলে কোলের ওপর নিয়েছে। মনু চেঁচিয়ে বলে, 'জল আনব? ওর মাথা ঘুরে গেছে। জল ঢালা দরকার।'

সোনাভান ওর কথায় কান দেয় না। কানাকে বলে, 'এই ধর ওপরে নিয়ে যাই।'

তিনজনে ধরাধরি করে লাইনের পাশে পাকার ওপর নিয়ে যায় রূপভানকে। খাদের ভেতরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মনু। তার গলা ঠেলে কান্নার ঢেউ পাকিয়ে উঠছে। সোনাভান কেন কথা বলছে না? কাশ দিচ্ছে না? মনু অনুভব করছে, যেন তার পা দুটো ডুবে যাচ্ছে কয়লা গুঁড়োর ভেতরে, সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যাচ্ছে সে নিজেও নিচের দিকে। সে যদি চেঁচিয়ে উঠতে পারত, তাহলে ভাল লাগত তার। কিন্তু কিছুই করতে পারে না। শুধু দুই ফোটা গরম পানি টপটপ করে ঝরে যায় গাল বেয়ে।

গেদু যোগাড়ে ছেলে। এক দৌড়ে প্ল্যাটফর্মের কল থেকে গামছাটা ভিজিয়ে এনে, তা চিপে চিপে রূপভানের চোখমুখ ভিজিয়ে দিতে থাকে পানিতে। অনেকক্ষণ পর ও চোখ মেলে চায়, সোনাভান তাকে কোলে রেখেই বলে ওঠে, 'আবার চাইলি। মরলি না কেন, তাহলে বাঁচতাম।'

মনু উঠে গিয়ে কানাকে ফিসফিস করে বলে, 'আমার কাছে একটা কলা আছে। ও খাবে ?'

'দে তো দেখি।' কানা হাত বাড়িয়ে নেয়।

কলাটা এগিয়ে দিতেই সোনাভান বলে, 'ইস বুদ্ধি! কাশির গতরে আবার কলা খায় নাকি ?'

মনু ভেবেছিল, কলাটা ও নেবে। সে মনে মনে খুশিও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সোনাভানের কথায় ওর মুখটা দপ করে নিভে যায়। তীব্র অভিমানের স্বরে বলে ওঠে, 'না খায়, এভাবে ফেরত দেয় না। আমি যেন কেউ নই, কিছু নই। সব দোষ যেন আমারই। আমি চাই না এ কয়লা। নিয়ে যা, সব নিয়ে যা তুই।'

বলতে বলতে ওর গলা ভেঙে যায় কান্নায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে খাদের দিকে যেতে থাকে। এক চোখে দেখতে পেলে কি হবে, কানার মাথা বেশ পরিষ্কার। মনুর মনের ভাবটা বুঝতে পেরে পিছনে দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে ওর কাঁধ। এত মেহনতের জিনিস ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে লাভ কি।

সোনাভান ওদিকে চেয়ে কি ভাবে। তার চোখের পুতুলিতে বেদনার ছায়া। মুখ নিচু করে, নিজের ডোমার পাড়ে বোনের চোখ মুখ মুছে নিয়ে, তাকে কাঁধে করে উঠে দাঁড়ায়। টুকরিটার অর্ধেকও ভরেনি। এখনি বাড়ি যাওয়া যায় না। সকালের আরও থেকে সের খানেক চাল, চার পয়সার সিঁদল সুটকি ও কিছু মিঠে আলু কিনে নিয়ে না গেলে, বাপের গালাগালে কানের পোকা পড়বে। খাদের কাছে এসে রূপভানকে ভাল করে বসিয়ে সে স্নেহস্বরে বলে, 'তুই ব' আমি যাই, কেমন ?'

রূপভান মাথা তুলতে পারে না। তবু ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। খাদের ভেতরে নেমে সোনা আবার কাজে লেগে যায়।

সূর্য উঠেছে। চট্টগ্রাম মেল আসতে বিশেষ দেরী নেই। গাড়ি আসার আগেই কয়লা কুড়ানো শেষ করতে হবে। তাই ওরা কাজ করে যায় ক্ষিপ্রহাতে।

কাঁধ ছেড়া সার্টের কলারে একটা ময়লা রুমাল বেঁধে টুকরি হাতে নিয়ে সবার শেষে আসে লালু। লাইনের ওপরে টুকরিটা রেখে আধ-পোড়া সিগারেটটা টানে খাদের ভেতর দৃষ্টি রেখে। তার কপাল কুঁচকে যায়। চোখের তারা দু'টো জ্বল জ্বল করতে থাকে। শেষ টান দিয়ে সিগারেটের মাথাটা ছুড়ে ফেলে খাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার দিকে নজর পড়তেই খাদের ভেতরকার সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

একটা ক্রূর হাসি খেলে যায় লালুর ঠোঁটে। সে বুঝতে পারে, কেন হঠাৎ ওরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বিখ্যাত কালু চোরের ভাই, এক সঙ্গে কাজ করলেও সংগীরা কোনদিন তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। এজন্যে তার ভাবনাও কিছু নেই। তবুও ওরা কেন এমন ভাববে ? ইচ্ছা করলেই সে এদের শিক্ষা দিতে পারে। চড়-চাপড় নয়, বেশ ভালরকম শিক্ষাই !

ঝাঁকড়া চুলগুলো উলটিয়ে নিয়ে নিজের টুকরিটা ছুঁড়ে ফেলে খাদের ভেতরে। এরপর ঝুপ করে নামে এক পাশে। সবার চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। লালু বরাবরই সকলের পরে আসে, আর একটা না একটা গোলমাল বাধায়। কোনদিন কাউকে চড় মারে সামান্য কারণে, বেফাঁস কথা বলে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না, সবারই কাছে ও দু'চোখের বিষ। কাউকে কোন কথা বলতে না দেখে লালু দাঁত খিচিয়ে জিগ্‌গেস করে, 'এই, তোরা সব কয়লা কুড়িয়ে ফেললি যে।'

সবই চুপচাপ ! একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কাজ করতে থাকে এক মনে। এইবার লালুর মেজাজ বিগড়ে যায়। সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কি, কারো মুখে রা নেই কেন ?'

সোনাভান নিচু গলায় বলে, 'রা করে কি হবে ?'

'কি হবে মানে ? তোরা সব কয়লা কুড়িয়ে ফেললি কেন ?'

'সে কি আমাদের দোষ ?' কানা জিগ্‌গেস করে।

'তোদের না কা'র।' লালু পায়ের পাতায় কয়লার গুড়োতে ছটকা দিয়ে বলে, 'তোরা জানিস না, যে আমি আসব ?'

'জানলে কি হবে ?' গেদু বলে, 'আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব ?'

মনু ওর কথা শুনে এত দুঃখেও ফিক করে হেসে ফেলে। লালু তেড়ে ওঠে, 'এই, তুই হাসছিস কেন?'

'হাসবে না তো কাঁদবে?' কানা জানতে চায়।

'না, কেন হাসবে? মানুষ চেনে না?' লালু নিজের টুকরিটা নিয়ে এগিয়ে যায়, 'ঢাল, তোর অর্ধেক কয়লা ঢাল।'

লালুর হাবভাব দেখে মনু থতমত খেয়ে যায়! তার বুকের ভেতরটা ভয়ে ধুকধুক করছে। ও যে রকম দাংগাবাজ, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মনু হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নিষ্ক্রিয়তায় লালুর রাগ আরো বেড়ে যায়, সে ওর টুকরিটা কাত করে নিজের টুকরিতে কয়লা ভরতে থাকে ক্ষিপ্তের মতো। এদিকে সকলের হাত থেমে যায়। ও করছে কি? এমন জুলুম মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে?

সোনাভান ওর কাণ্ডকারখানাটা দেখছিল। সে আর ঠিক থাকতে পারল না। একপাশ থেকে ঝট করে উঠে এসে ওর হাত ধরে, বলে 'ওর কয়লা জোর করে নিয়ে যাচ্ছ যে!'

'নেবো না তো কি করব?' লালু তেড়ে ওঠে, 'নেবো, একশ'বার নেবো। তাতে তোর কি? তুই আবার দরদ দেখাচ্ছিস কেন?'

'দেখাব, একশ'বার দেখাব।' সোনাভান ডোমাটা কোমরে পেঁচিয়ে নির্দেশ দেয়, 'সব কয়লা ওর টুকরিতে রাখ। না হলে ভাল হবেনা বলছি।'

'ভাল হবেনা? কি করবি তুই?' একটা অশ্লীল ইংগিত করে লালু। সোনাভান এক ধাক্কায় লালুকে ফেলে দেয় খাদের কোণায়। তৎক্ষণাৎ উঠে লালু তেড়ে এসে আক্রমণ করে তাকে। ধস্তাধস্তি শুরু হল দু'জনে। সোনাভানের চুলের মুঠি ধরে লালু কয়লার গুঁড়োর ওপর ওর মাথাটা ঠুকতে থাকে। বেকায়দায় পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে সোনাভান। অন্যেরা এসে ছাড়াবার আগেই এক পশলা মার হয়ে গেল। সোনাভান খামচিয়েছে কম নয়, কিন্তু অতবড় জোয়ান মরদটার সংগে পারবে কেন? তার চোখ মুখ অন্ধ হয়ে গেছে কয়লার গুড়োতে। দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। লালু উঠে দাঁড়িয়ে ওর কোমরে একটা লাথি মারল, সংগে সংগে আবার কঁকিয়ে উঠল সোনাভান। ততক্ষণে লালুকে অন্যেরা ধরে কাবু করে ফেলেছে। চিমটি

খেয়ে তার হাত থেকে রক্ত পড়ছে। সে হাঁপাচ্ছে। বোনের হাল দেখে রূপভান বসে বসে কাঁদছে।

চীৎকার শুনে খাদের কাছে দৌড়ে এসেছিল সুবেদালি কনেষ্টবল। ব্যাপারটা দেখে হাত নেড়ে তাড়া দিয়ে ওঠে, 'ভাগ। ভাগ এখান থেকে শয়তানের দল। না হলে মজাটা দেখাচ্ছি।'

পশ্চিমা স্টেশন মাষ্টার দুধ কিনতে এসেছিল প্ল্যাটফর্মের ওপর। দূর থেকে জিগ্‌গেস করে, 'কেয়া হুয়া সুবেদালি?'

কয়লার টুকরিসমেত সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে কনেষ্টবল চলে যায় স্টেশন-মাষ্টারের কাছে। বাজারের দিকে যেতে যেতে ওরা দূর থেকে দেখে, হাত নেড়ে নেড়ে ও কি সব বলছে।

মনটা খারাপ হয়ে যায় লালুর। সবাই চলে গেলে একটা খালি মালগাড়িতে উঠে টুকরিটা ছুঁড়ে ফেলে, জোর করে নেয়া পোড়া কয়লাগুলো ফেলে এসেছে খাদেই। দরজার কাছে বসে পা ঝুলিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ। প্রাণপণ খামচা দিয়ে ওর হাত থেকে চামড়া তুলে দিয়েছে সোনাভান। রক্ত চুইয়ে পড়ছে। গলা থেকে রুমাল খুলে নিয়ে সে হাতটা বাঁধলো। ও খুব ব্যথা পেয়েছে, না? ওই বোকাগুলো হা করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল কেন? প্রথমেই ছাড়িয়ে দিতে পারত না? ওদের সবার মাথায় গোবর, না হলে চোখের সামনে অমন মারামারি হয়! যাক, ভালই হয়েছে। এখন বুঝবে ঠেলাটা। কেউ মিছিমিছি অবহেলা দেখালে তাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে নেই।

এক সময় ওয়াগন থেকে নেমে চায়ের ষ্টলের চুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় লালু। ষ্টলের ম্যানেজারের সঙ্গে ও দোস্তি পাতিয়েছে। বোয়াম থেকে একটা মুচমুচে বিস্কুট বার করে চিবোতে চিবোতে অর্ডার দেয়, 'এক কাপ চা।'

ম্যানেজার পাকা লোক। সাধে এমন একটা ছেলের সঙ্গে খাতির করেনি। বিদেশে এসে দোকানের ঝক্কি সামলানোর জন্যে অনেক রকম লোকের সঙ্গেই পরিচয় রাখতে হয়, না হলে, কোন সময় কোন বিপদে পড়ে তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। তাছাড়া লালু প্রায় সব কাজেরই কাজি।

মাঝে মাঝে চা বিস্কুট খাইয়ে হাতে রাখায় তাকে দিয়ে এমন কাজ হাসেল হয়, যেগুলো কেবল পয়সা দিয়ে সমাধা করা মুশকিল।

বাজারের অলিতে গলিতে বিনা কাজে হেঁটে বেড়ায় লালু, এরপর দুপুর গড়িয়ে গেলে জাহাজঘাটার সিঁড়িতে গিয়ে বসে। কতক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে ওর মনে হয়, গা ডুবিয়ে গোসল করে নিলে কিছুটা ভালো লাগতে পারে। মেঘনার পারে ফেলে রাখা পাথরের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চকচকে পানির স্রোত এঁকে বেঁকে চলছে। অন্যদিন হোটেল-ওয়ালাদের কাছে কয়লা বিক্রি করে এসে সবাই এক সংগে গোসল করত, পানি ছিটোত, সাঁতার কাটত। আজ সে একা। তবু পানিটা বেশ লোভনীয়। লালু এদিক ওদিক চেয়ে দেখে লোকজন আছে কিনা। পুলের নিচেকার ঘাটে অনেকে গোসল করছে। এছাড়া নৌকায় ও জাহাজে সারেঙ মাঝিরা আছে। কে কার দিকে এত নজর রাখে। আর ওর বয়েস তো খুব বেশী নয়। দাড়িগোঁফ এখনো উঁকি দেয়নি। অবশ্য আলাদা কাপড় থাকলে কিছুতেই সে উলংগ হয়ে গোসল করত না।

জামা-কাপড় খুলে রেখে কোমরের মিহি দড়িটায় রুমালটা বেঁধে যেমন তেমন একটা নেংটি পরে লালু। এরপর এক দৌড়ে গিয়ে পানিতে পড়ে।

গোসল সেরে কাপড়-চোপড় পরার পর গাছের ছায়ায় এসে বেশ খিদে লাগে ওর। কিন্তু এখন ভাত কোথায় পাবে? আজকে কয়লা কুড়োয়নি, কাজেই বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। গেলেই ভাবী এসে ধরবে, তার জন্যে পান-সুপোরি এনেছে কিনা, জিনিস কিনে কত পয়সা বাড়তি হল। যদি বলে, আজকে কাজ করেনি, তাহলে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বলবে ফুর্তি করে উড়িয়েছে।

কোনো ফয়সলা করতে না পেরে আবার হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে এসে ষ্টলের ম্যানেজারকে বলে, 'দোস্ত, সাত আনার পয়সা দেন তো! বিশেষ দরকার।'

ম্যানেজার ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে নিয়ে প্রয়োজন সত্যি আছে কিনা, তা পরখ করে নেয়। এরপর কাঠের বাক্স থেকে একটা আধুলি বার করে দেয়। কোনো কথা না বলে বেরিয়ে আসে লালু।

রাত আটটার গাড়ী স্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর লাইন পেরিয়ে এসে গ্রামের রাস্তাটার ওপর নামে ও। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দুই পাশের আম গাছের ডালপালাগুলো পথের ওপর ঝুকে অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তুলেছে। তবু চলতে বিশেষ কষ্ট হয় না ওর। এই পথে গভীর রাত্রেও সে এতবার হেঁটেছে যে, কোথায় গাছের শিকড়, কোথায় গর্ত, এসব তার মুখস্থ হয়ে গেছে। কাঁঠাল বাগিচার ভিতর দিয়ে হেঁটে এসে একটা ছনের ঘরের পিছনে থেমে গেল ও। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাল। দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ধূমপান করার পর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে চলে এলো ঘরের কোণায়। ইখরের বেড়ায় অনেক ফাঁক। ভেতরে বাতি জলছে। একটা ফাঁকে চোখ রেখে দেখল, সোনাভান একটা বদনা দিয়ে কার মাথায় পানি ঢালছে। নিশ্চয়ই রূপভান। তাহলে ওর অসুখটা বেড়েছে? না বাড়লে এমন কাতরস্বরে কোঁকাত না। সোনাভানের চুলগুলো উসকো খুসকো। চোখে বিহ্বল চাউনির স্থিরতা। বাপটা হোগলার ওপর পড়ে আছে একধারে। এত সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? ও এমনি চামার, খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনাই যেন থাকে না।

লালু ডান পকেটে হাত রাখে একটি জিনিসের ওপর। সে কি ডাক দেবে ওর নাম ধরে? কিন্তু কেমন করে দেবে ডাক? ও যদি বুঝতে পারে কে ডাকছে, তাহলে হয়তো কথাই বলবে না। তাহলে, নিজে না খেয়ে, অর্ধেক পয়সা দিয়ে এমন কাকুতি-মিনতি করে যে জিনিসটা এনেছে, তা না দিয়েই কি চলে যাবে সে?

খানিকক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকে ও। এরপর ভিটির পাশের সরু পথটা দিয়ে হেঁটে চলে আসে দরজার সামনে। বাঁশের দুয়ার, একটু টান দিলেই ফাঁক হয়ে যাবে। কিন্তু সকাল বেলার ঘটনাটা মনে পড়ায় ও দমে যায়। এখন কি করবে সে?

হঠাৎ এক সময় এগিয়ে গিয়ে দরজার একটা খাপে টোকা দেয় আঙুলে। প্রথমটা মৃদু, এরপরে একটু জোরে আওয়াজ হয়। ভেতর থেকে আচমকা প্রশ্ন আসে, 'কে?'

লালু সাহস সঞ্চয় করে জবাব দেয় 'দরজাটা একটু খোল না।'

'কে তুমি ? মনু নাকি ?' একটানে দরজাটা খুলে চেয়ে দেখতেই সোনাভানের মুখ থেকে ফুটে বেরোয়, 'ও তুমি ? কেন এসেছ এখানে ? যাও, চলে যাও। নাহলে বাজানকে ডাক দেব ?'

ঘর থেকে ছড়িয়ে পড়া ম্লান আলোর আভায় লালুর মুখটা দেখা যাচ্ছে। ডানহাতটা বাড়িয়ে অপরাধীর মতো ও বলে, 'এই নাও বেদানাটা। রূপভানকে দিও।'

সোনাভান বেদানাটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে। ক্ষেপে উঠে বলতে থাকে, 'চাইনা তোমার জিনিস। তুমি যাও।'

ওর মুখের ওপর দরজাটা সা করে লাগিয়ে দেয় সোনাভান। লালু কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়। কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে উঠোন থেকে।

অনেক রাত হয়েছে। সকালের ট্রেন ধরবার জন্যে দূর থেকে যারা এসেছে, সিমেন্টের বেঞ্চি ও প্ল্যাটফর্মের ওপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে তারা। লালু একটা মাঝারিরকম বড়ো পাথর যোগাড় করে এনে, তা মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়ল ওয়াগনের ভেতর।

সকালে ঘুম ভাঙলে চোখ কচলিয়ে উঠে বসে ও দেখে পূবদিকটা লাল হয়েছে। একটু পরই সূর্য উঠবে। টুকরিটা নিয়ে মাটিতে নামতেই হঠাৎ ওর চোখ পড়ে ওয়াগনের পিছনটায় লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, দলের কয়েকজন। অন্য সময় হলে লালু ফিরেও চেয়ে দেখত না। কিন্তু এখন কেমন একটা খটকা লাগে ওর মনে। এখন তো মিছিমিছি এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়।

ও কাছে গিয়ে দেখে, মনু ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কথা বলার ইচ্ছে না থাকলেও, ওর মুখ থেকে আপসে প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, 'কি হয়েছে ?'

কানা রাগতস্বরে জবাব দেয়, 'কি হয়েছে ওখানে গিয়ে দেখ গে।'

'না যাওয়াই ভাল।' গেদু আপন মনে আওড়ায়, 'গেলে মার খেয়ে ফিরতে হবে।'

'কেন ? মার খেয়ে ফিরতে হবে কেন ?' লালু প্রশ্ন করে।

'কেন দেখনা গিয়ে। আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'কে ?'

গেদু বলে, 'কে আবার? ওই কনেষ্টবল শয়তানটা। আমাদের আর কয়লা কুড়াতে দেবে না।'

'দেবে না। ওর বাপের ধন নাকি!' লালু মাথা ঝাড়া দিয়ে বলে, 'চলতো দেখি।'

টুকরিটা লাইনের ওপর ফেলে রেখে লালু লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে যায় পোড়া কয়লার খাদের দিকে। আগে যারা দৌড়ে চলে এসেছে, তাদের বিশেষ উৎসাহ নেই। তবু ও যখন যাচ্ছে, ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্যে তারাও আস্তে আস্তে এগুতে থাকে।

সুবেদালি কনেষ্টবল পাকায় বসে বিড়ি টানছে। তার হাতে একটা ব্যাটন। লালু এসব অনেক দেখেছে। পরোয়া করেনা মোটেই। সামনে গিয়ে সোজা জিগগেস করে, 'মনু কাঁদছে কেন?'

'ও লালু নাকি? বিড়ি খাবে?' সুবেদালি উঠে দাঁড়ায়।

'না। আমার কথার জবাব দাও।'

কনেষ্টবল শুকনো মুখে বলে, 'কে কাঁদছে আমি তো কিছুই জানিনা।'

'কিছুই জাননা? তুমি ওদের ছোটানি দাওনি? মারনি?' লালু তীক্ষ্ণস্বরে জিগগেস করে।

কনেষ্টবল ওর কথার সুরে থতমত খেয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, 'ছোটানি দিয়েছি। তবে মারিনি। কে যেন পড়ে গিয়েছিল লাইনে। বোধ হয় চোট লেগেছে!'

লালুর দুই চোখের তারা থেকে আগুন ছিটকে পড়ে। ফিরে আসতে আসতে শাসিয়ে বলে, 'বোধ হয় চোট লেগেছে! রাখ দেখাচ্ছি মজাটা।'

কনেষ্টবল উঁচু গলায় ডাক দিয়ে বলে, 'অত রাগছিস কেন? শুনে যানা একটু!'

লালু প্রত্যুত্তর দেয়না। ওর কথা শুনে বাকি সবার সাহস ফিরে এসেছে। কান্না থেমেছে মনুর। কনেষ্টবল যখন তাড়া দিয়েছিল, তখন ও হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। বুড়ো আঙ্গুলের নখ কিছুটা আলগা হয়ে গেছে। রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। কানা ওর পুরনো গামছা থেকে কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছে ওর জখমটা। লালু সকলের আগে আগে চলছে। এক সময় চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'শালারে একটু শিক্ষা দিতে হবে।'

পদ্মমাসীর ওখানে বসে ওরা গোল হয়ে বসল উঠোনের ধারে ঘাসের ওপর। সোনাভান ছাড়া সবাই এসেছে। রূপভানের অসুখ না বাড়লেও নিশ্চয়ই আসত। অনেকক্ষণ ধরে ওদের পরামর্শ চলে, কিভাবে এর দাদ নেয়া যায়। কানা বলে, 'ওর ঘরতো চিনি। রাত্রে গিয়ে জানালার ফঁাকে পানি ঢেলে আসব ওর মাথায়।'

'তাতে কি হবে? আমাদের মারটা যাবে কোথায়?' গেদু প্রশ্ন করে।

সবার আলোচনার পর লালু যে বুদ্ধি বাৎলালো, তা মেনে নিল সকলে। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর না হলে চলেনা।

যে সময়ে ওরা কয়লা কুড়াতে যায়, পরের দিন ঠিক সেই সময়ে আবছা অন্ধকারে একটি ছায়া-মূর্তির দল হামাগুড়ি দিয়ে লাইনের ঢালুতে গিয়ে বসে। একজন বারে বারে মাথা তুলে দেখে, কনেষ্টবল আসছে কিনা। ইঞ্জিনটা হুইশেল দিচ্ছে। একটু পরেই আসবে কয়লা ছাড়তে, আর পানি নিতে। চারদিক আলোয় একটু ফর্সা হয়ে আসতেই ওরা দেখল, সুবেদালি খাদের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যাটনটা বগলদাবা করে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাবার জন্যে মুখ নিচু করতেই একটা পাথর গিয়ে পড়ল তার হাতের কব্জিতে। সঙ্গে সঙ্গে উহু করে হাত ঝাড়া দিয়ে উঠল।

এরপর সামনে চেয়ে কিছু ভাববার আগেই ঝঁাকে ঝঁাকে পাথর এসে পড়তে থাকে তার মাথায় ঘাড়ে পিঠে উরুতে। হাত দিয়ে কয়টা আর ফেরানো যায়? সহ্য করতে না পেরে অকস্মাৎ প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুট দেয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে, কেউ নেই। এ কি ভূতের কারবার? না, সুবেদালির মাথায় খেলে, নিশ্চয় ওই ছোকরাদের কাজ।

বিকেল বেলায় পদ্মমাসীর ওখানে আবার বৈঠক। সবাই গুম হয়ে বসে আছে। শিক্ষা তো দেওয়া হল, কিন্তু কাজের কি করা যায়? পাথরের ঢিল খাওয়া সত্ত্বেও সে তো পাহারা দেয়া বন্ধ করবে না। এদিকে, কয়লা না কুড়োলে উপোস থাকতে হবে। কিন্তু করা যায় কি?

'চল শালার মালগাড়ি ভাঙ্গি।' কানা বলে, 'তা না হলে, আমরা না খেয়ে মরব নাকি?'

এ-প্রস্তাবে কারো মনে উৎসাহের সঞ্চার হয় না। সব চুপচাপ। পদ্মমাসী এক সানকি মুড়ি এনে ওদের মাঝখানে রাখে। বলে, 'নে, তোরা খা।'

কোন কথা না বলে ওরা মুড়ি চিবোতে থাকে, অনেকক্ষণ ধরে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর লালু সোনাভানকে বলে, 'এই, এক গেলাস পানি নিয়ে আয়।'

কপাল কুঁচকে তাকায় সোনাভান। বলে, 'কি ঠেকাটা আমার পড়েছে?'

'আমাদের দেখে একটু মায়া হয় না?' লালু হাসতে থাকে, 'তোর রাগ এখনো পড়েনি, না?'

'না, পড়েনি।' কতক্ষণ মুখভার করে বসে থাকার পর সোনাভান উঠে যায়। এক বদনা পানি এনে ঝপ করে মাটিতে রেখে বলে, 'নাও, গেলো।'

'ইস, কি তেজ দেখ না!' লালু বদনার নালটা মুখে দিয়ে পানি খেতে থাকে।

ওদের পিছনে সুবেদালি কনেষ্টবল কখন এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায়নি। প্রথমে মনুর সে দিকে নজর পড়তেই সে শিউরে ওঠে। কানাকে চোখ ইশারা করে সে। এরপর সকলের গোচরে আসে ব্যাপারটা। লোকটার দিকে তাকিয়ে কারো মুখে অনেকক্ষণ কোনো রা ফোটে না। এখানে কেউ তাকে আশা করেনি। কি মতলব? মাথায় গামছা বাধা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় জখম হয়েছে। ওরা সবাই স্তব্ধ হয়ে বোবার মত বসে থাকে।

লালু ওর দিকে চোখ লাল করে তাকায়। দাঁত খিচিয়ে বলে, 'তুমি কি চাও এখানে?'

একটা দরাজ হাসি ফুটে ওঠে সুবেদালির মুখে। এক পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়ে বলে, 'চাইনা কিছু। তোদের কাছে একটু বসতে এলাম। আমার ওপর খুব রেগে আছিস, না?'

ওরা কেউ রা করে না। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকে। লালু একটা ঘাসের পাতা ছিড়ে দাঁত দিয়ে কাটে। মুখে হাসি টেনে সুবেদালি বলে, 'জানি তোরা খুব রেগেছিস,। কিন্তু আমি কি করবো?'

পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেটটা বার করে কনেষ্টবল একটা একটা করে এগিয়ে দেয় সবাইকে। প্রথমটায় নিতে ইতস্তত করলেও লালু যখন নিয়েছে, এরপর কেউ আপত্তি করেনি। বিড়ি টানতে টানতে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল কনেষ্টবল। ওর হাতের কব্জি ও কপালের বাঁদিকটা ফুলে উঠেছে। এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, এমনি ভাব সকলের মৌনতায়। লালুর ঠোঁটের কোণে এক সময় দুষ্টু হাসি খেলে যায় মাত্র।

আলাপ শেষ করে উঠে আসবার সময় সুবেদালি জিগ্‌গেস করে, 'আমি যে ভাবে বললাম, সেভাবে তোরা কাজ করতে পারবি তো?'

সকলে সায় দেয় ঘাড় নেড়ে।

পরদিন সকাল বেলা। একটু ফর্সা হয়ে আসতেই দেখা যায়, লাইনের খাদের ভেতরে কয়লা কুড়ানো দল একজোট হয়ে কাজ করে চলছে। তাদের হাতে অসম্ভব ক্ষিপ্রতা। সূর্য ওঠবার সংগে সংগে কয়লা কুড়োনো শেষ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি গর্ত থেকে উঠে টুকরিগুলো মাথায় নিয়ে ওরা চলতে থাকে, লাইনের পাশের পথ দিয়ে। ঘন পায়ে চলতে থাকে ওরা সাতজন। চলতে থাকে, আর মাঝে মাঝে দু'একজন পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে। যতই এগিয়ে যায়, বাড়তে থাকে হাঁটার গতি। কিন্তু আর বুঝি পাড়া গেল না! ওই যে দৌড়ে আসছে কনেষ্টবল। ব্যাটন হাতে তেড়ে আসছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে স্টেশন মাষ্টার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি আদেশ দিচ্ছে। কয়লার টুকরি মাথায় ওরা দৌড়োতে থাকে প্রাণপণে।

না, এই ধরে ফেলল। লাইনের ঢালু পথ দিয়ে ছুটে ওরা নেমে গেল নিচের রাস্তায়। তাদের পিছনে তেড়ে আসা লোকটাও নামল। ওরা ছুটতে পারছে না আর।

পা জড়িয়ে আসছে। পিছনে চেয়ে দেখে, সেই সুবেদালি কনেষ্টবল।

'এই থেমে পড়। আর দৌড়াতে হবে না।' কনেষ্টবল হাত নেড়ে বলে।

ইচ্ছে থাকলেও, ওরা আর দৌড়াতে পারবে না। একে তো খালি পেট, তার ওপর একেক জনের মাথায় বোঝার ভার কম নয়। ওরা দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁপাতে থাকে সব।

কনেষ্টবল কাছে এসে পিছন দিকের অনেক দূর পর্যন্ত তির্যকদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে বলে, 'শালার মাষ্টারকে আর দেখা যাচ্ছে না। এইবার একটু জিরিয়ে নিতে পারিস। এত চুরি করেও পেট ভরে না লোকটার। চোরামাল বুকিংয়ের ঘুষ তো আছেই, মাইনেও তো কম পায় না। তার ওপর আমাদের খাটিয়ে মারে। বলে বাজারটা কর, ওষুধ আনো, ঘর দুটো সাফ করে দাও। যেন তার কেনা গোলাম। শেষ পর্যন্ত নজর পড়েছে গিয়ে পোড়া কয়লার ওপর। বলে কিনা সুবেদালি, কয়লার জন্য অত পয়সা খরচ করে লাভ কি, একটু দেখাশোনা করলেই অনেক টাকা বেঁচে যায়। চামার কোথাকার। যাক, তোরা আরো একটু সকালে আসার চেষ্টা করিস। তাহলে আর এত দৌড়ানো লাগবে না।'

একটানা কথাগুলো শেষ করে থুথু ফেলে লাইনের দিকে ফিরে যায় সুবেদালি কনেষ্টবল। আস্তে আস্তে ওরাও হাঁটতে থাকে বাজারের পথ ধরে। তখন কয়লার টুকরিগুলোর ওপর সূর্যের নরম আলো ছড়িয়ে পড়ে চিকমিক করছে।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

লাল মেঘ

আকাশে একটু লাল রঙের মেঘ জমেছিল, প্রথম সন্ধ্যা-সূর্যের আভা। তার স্বর্ণাভ প্রতিচ্ছায়ায় গীর্জা-চূড়োর ক্রস্‌দণ্ডটি পর্যন্ত অপরূপ হয়ে উঠেছে।

একটানা খট্‌খট শব্দ বন্ধ করে ভামজী অফিসের দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল। পাঁচটা বেজে গেছে কখন। তেতলা বাড়ীর কামরা থেকে নীচে জনসমুদ্র চোখে পড়ে। মনে হচ্ছে যেন এক একটা ঢেউ উঠছে আর নামছে। বড় সাহেবের সমস্ত চিঠি আর অর্ডারগুলো টাইপ শেষ করে যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে ভামজী উঠে দাঁড়াল। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। একগাদা কাজ এসে জমেছিল সারা সপ্তাহ ধরে। বলতে গেলে চাপিয়েই দেওয়া হয়েছিল তার উপর। এরপরও ছিল বড় সাহেবের রক্তচক্ষু-ধমকঃ নাহে, তোমাকে দিয়ে কাজ হবে না, দুটো কাজ দিলে চার দিনে সারতে পার না। স্পীডি হ্যাণ্ড চাই, স্পীডি হ্যাণ্ড।

ভামজী কথা বলে না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর পর্দা ঠেলে ধীরে ধীরে আবার নিজের আসনটিতে এসে বসে। গত পাঁচ বৎসরে এই একতলা বাড়ীটি তেতলা হয়েছে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আয় দশগুণ বেড়েছে। বড় সাহেবের কাঠের চেয়ার পুরু গদিওয়ালা রিভলভিং চেয়ারে পরিণত হয়েছে। পুরনো থার্টি ফাইভ মডেল ফোর্ডের জায়গায় এসেছে ঝক্‌ঝকে হিলম্যান। টাইপিষ্টের কাজ বেড়েছে দশগুণ—কিন্তু লোক সেই একা ভামজী—ইব্রাহীম ইসমাইল ভামজী, বেতন মাসে পঁচাত্তর টাকা।

চেয়ার থেকে কোটটা তুলে গায়ে দিয়ে চশমাটা নাকের উপর ভাল করে চাপিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ভামজী। বিড়ি কিনতে গিয়ে কি

ভেবে দু'পয়সা দামের একটা দেশী সিগারেট কিনলো। পাকানো দড়ির আগুনে সবে সেটা ধরাতে যাবে এমন সময় পিঠে হাত পড়ল, ভামজী সাব।

—কওন্?

—আমি পেয়ার বক্স।

—ওঃ! ভামজী আশ্বস্ত হল। বড় সাহেবের খাস চাপরাশি। ভাঙ্গা বাংলায় বলল, কোন নোতুন সোম্বাদ আছে?

পেয়ার বক্স হাসল, তুমি সাহেব আস্ত ভামই। পাঁচ বৎসর বাংলা দেশে আছ, এখনও বাংলা কথা শিখতে পারলে না।

ভামজী বলল, কছু কছু—

পেয়ার বক্স বলল, কছু কছু না—কচু কচু।

ভামজী সিগারেটে সুখটান দিয়ে এতক্ষণে হাসল। বলল, তারপর সোম্বাদ কি?

—সংবাদ, তোমার কপাল পুড়েছে। কাজ-কামগুলো সব সেরে রেখেছো তো?

ভামজী মাথা নাড়ল, হ-হ্যা সোব।

পেয়ার দ্বিধাভরে মাথা ঝাকাল। তবু কি হয় বলা যায় না, একটা ছুকরি সাহেবের পিছু লেগেছে।

—ছুকরী?

পেয়ারের মুরুব্বিয়ানায় ভামজী বিরক্ত হল। বড় সাহেবের খাশ চাপরাশিগিরির দৌলতে পেয়ার আজকাল কাউকে বড় একটা কেয়ার করার প্রয়োজন বোধ করে না, এমন কি স্বয়ং চাকরিদাতা ভামজীকেও না। এমন ভাবে কথা বলে যেন, তার চাপরাশিগিরি আর ভামজীর টাইপিষ্টের চাকরি একই পর্যায়ের, কিম্বা পেয়ারই কিছুটা উঁচু পর্যায়ের। ভামজী প্রথমদিন থেকেই অবস্থাকে মেনে নিয়েছে। জিন্দেগীর রীতিই এই, না মেনে উপায় কি? এক দিন যাকে কৃপা করেছিল ভামজী, আজ তাকে ঈর্ষা করে!

একটা আধময়লা খাকী বুস-শার্ট গায়ে পেয়ারের প্রথম আবির্ভাব এই অফিসে। ভামজীর কাছেই কাতর কণ্ঠে বলেছিল, একটা চাকরি দিতে পারেন হুযুর। পরিবার পরিজন নিয়ে মারা যেতে বসেছি।

ভামজী বড় সাহেবের পার্সোনাল ফাইল ডিল করছিল, বিরক্ত হয়ে বলল, নকড়ি উকড়ি হোবেনা।

কিন্তু পেয়ারের মুখের দিকে তাকাতেই কেমন একটা আশ্চর্য বেদনায় টনটন করে উঠল তার বুক। মনে হল, সে নিজেই যেন কপর্দকশূন্য অবস্থায় লাক্ষ্ণৌ থেকে ঢাকা এসে চাকরির প্রত্যাশায় ন্যাশনাল বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর নিজে ফাইল থেকে কাগজ বের করে চাকরির দরখাস্ত টাইপ করে দিল। ম্যাট্রিক পাশ ইংরেজী-বিদ্যা দিয়ে গুছিয়ে লিখল পেয়ারের করুণ আবেদন। উল্লেখ করতে ভুলল না, যুদ্ধের সময় সে পাইয়োনিয়ার ফোর্সে ঝানু ফিল্ডম্যান ছিল। টাইপ শেষ হলে বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, যাও, এখন তোমার তকদের। ভামজী মাথা তুলল, সেই পেয়ার আজ? তবু বিরক্তি গোপন করে বললো, ছুকরি হিন্দু? পেয়ার ততক্ষণে একটা বিড়ি ধরিয়েছে। হেসে বলল, না হে না, মুসলমান।

ভামজীর বিস্ময় বাড়ল, বাঙ্গলি?

– হ্যাঁ হ্যাঁ বাঙ্গালী।

বাঙ্গাল আওরত কাজ করবে অফিসে? ভামজীর বিশ্বাস হলনা। হিন্দু জেনানা স্বাধীন, লেখাপড়া জানে, লাক্ষ্ণৌ আর কলকাতা থেকে তাদের ভয়েই পালিয়ে এসেছিল ভামজী ঢাকায়, অন্ততঃ এখানে জেনানা স্বাধীন হয়ে ছোট খাটো চাকরি থেকে অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষদের বিতাড়ন করতে এখনও এগিয়ে আসেনি। পর্দা পুসিদার বড় ঝোঁক বাঙ্গাল মুসলমান আওরতের, মাত্র পাঁচ বছরে সব উল্টে গেল।

রাস্তায় বিজলী-বাতি জ্বলে উঠল। পেয়ার বক্স পানের পিকে ঠোঁট লাল করে বিদায় নিল। ভামজী তখন চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর মোড়ে।

পরদিন হাজিরা বইয়ে সই না করতেই বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়ল। দুরু দুরু বুকে ভামজী স্প্রীংয়ের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ঢুকতেই মৃদু সৌরভে চমকে উঠতে হল তাকে। নাঃ, বড় বেশী কিছু নয়, তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সের একটি বাঙ্গালী মেয়ে। নক্সা ছাপা কাপড় পরনে, হাতে ছোট্ট একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। প্রসাধনের উগ্রতায় মুখের

রঙ বেমালুম ঢাকা পড়েছে। বোধ হয় পেয়ার বক্সের সেই খবছুরত ছুকরী।

ভামজীকে দেখেই বড় সাহেব হাতের ফাইলটা ছুঁড়ে মারলেন, এসব কি টাইপ, একে টাইপ করা বলে? টির মাথা-কাটা পড়েনি, এল হয়ে আছে আই, পড়লে চিঠির মানেই বদলে যায়, চোখে দেখে টাইপ কর না?

ভামজী মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এরকম কটূক্তি আজকাল আর গায়ে বেঁধে না। কিন্তু এই মেয়েটির সামনে অনেকদিন পরে আজ আবার তার বড় অপমান ঠেকল, দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল। মনে হতে লাগল, এর জন্যে যেন বড় সাহেবের চাইতে ঐ মেয়েটিই বেশী দায়ী।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! ভামজী নিজেই বিস্ময় বোধ করল। বয়স তার খুব বেশী নয়। যে বয়সে মেয়েরা চোখে রঙ ধরিয়ে দেয়, সে বয়স তার এখনও পার হয়নি। কতদিন স্যাভেজ রোডের অথবা ডি, আই, টি এভেন্যুর মোড়ে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ চোখে সে পান করেছে জীবনের এক বিমুগ্ধ ফাল্গুনের বিচিত্র রূপসজ্জা। কারও শাড়ী, কারও গাউন, কারও সালোয়ার-ওড়না, কেউ সুশ্রী, শুভ্র, কেউ শ্যামা, কেউ গোলাপী, বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র সমারোহ। আর এক অতৃপ্ত ক্ষুধার দীর্ঘশ্বাসে ভামজীর শীর্ণ বুকের পাঁজরগুলো কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

কিন্তু আজ এই শরৎ-সকালের সুরভি মাখানো মুহূর্তে কানায় কানায় যৌবনভরা শরীর এই মেয়েটির দিকে তাকিয়েও ভামজীর মন থেকে সেই বহু পরিচিত দীর্ঘশ্বাসটি বেরিয়ে এলো না। এক অক্ষম আক্রোশে সে মাথা নীচু করে রইল।

বড় সাহেব ততক্ষণে তার ধমকের পশলা শেষ করে ধাতস্থ হয়েছেন। বললেন, আসলে কাজে তোমার মন নেই। তাহলে জবাব দাও না কেন?

ভামজীর মনে পড়ল, সম্ভবতঃ তার চেয়েও বয়সে প্রাচীন টাইপ রাইটার মেশিনটির প্রায় অচল হওয়ার কথা কম হলেও সে বড় সাহেবের কাছে পঞ্চাশ বার তুলেছে। সে কথা স্মরণ করিয়ে লাভ নেই। বড়লোকের ভুল ধরিয়ে দিলে যে নিস্তার থাকে না একথা ভামজী হাড়ে হাড়ে

বোঝে। তাই ভাঙ্গা টি আর এল হরফের সব দায় ঘাড় পেতে নিয়ে সে মেঝেয় স্যাণ্ডেলের তলা ঘষতে লাগল।

বড় সাহেব সদয় হলেন। যাও, তুমি কোম্পানীর পুরনো লোক, তাই হঠাৎ করে আর জবাব দিলাম না। দেখে শুনে কাজ কর। আর এঁকে নিয়ে যাও। এখন থেকে ইনিই আমার ফাইল ডিল করবেন। তুমি অর্ডিনারী ফাইল দেখবে। নতুন একটা মেশিনের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সেটা ওঁকে দেবে।

ভামজী কৃতার্থ হয়ে বড় সাহেবের দিকে তাকাল। তিনি ফের মুখে পাইপ ঢোকালেন। মেয়েটাই এবার ভামজীর কাছে এগিয়ে এল, বলল, চলুন মিঃ ভামজী।

ভামজী চৎমকৃত হল। বাইরে এসে বলল, আপ হামার নাম জানেন?

মেয়েটি মাথা দোলাল। হ্যাঁ, বড় সাহেবের মুখেই শুনেছি। আর আমার নাম রোজিনা। ভামজী হাসল, মিস রোজিনা।

মিস রোজিনা সলজ্জ ভঙ্গীতে মৃদু হাসবার ভান করল।

দু'দিনের মধ্যেই ভামজীর ঘর বদলে গেল। ছোট্ট ঘরটার মাঝখানে পড়ল পাতলা নীলাভ স্ক্রীন। ওপাশে মিস রোজিনার জন্য ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল মায় নতুন টাইপ-রাইটার। দেয়ালে কোন এক বীমা কোম্পানীর চমৎকার ক্যালেণ্ডার। তাতে অজন্তা গুহার নৃত্যরতা স্বল্প-বসনা হুরপরীর ছবি। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে নিঃশব্দে। ভামজী যা কোনদিন কল্পনা করতেও পারেনি। তবু রোজিনার উপরে রাগ করা বা তাকে ঈর্ষা করার মত সুযোগ হল না তার! এতদিনে কল্পনার অধরা ছবিই যেন মূর্তিমতী হয়ে ভামজীর পাশে এসে ঠাঁই নিয়েছে, অথচ পরিচয়ের সহজ স্বচ্ছন্দে সে ভামজীকে এতটুকু দূরে থাকতে দিল না, কিম্বা তার রূপের আভায় একটা জ্যোতির্ময় ব্যূহ রচনা করে তাতে নিজেকে সগর্বে আড়াল করে রাখল না। ভামজী ভয় করবে, ঈর্ষা করবে কাকে? এমন সহজ স্বচ্ছন্দতায় সে অভিভূত হয়ে পড়ল। সত্যি এতটা সে আশা করেনি।

প্রথম দিনই রোজিনা নিজ হাতে পাতলা নীলাভ পর্দাটা সরিয়ে দিল। বলল, কাজ করি যখন একই, তখন আর এই ব্যবধান কেন, কি বলেন?

—আপকি মর্জি ! ভামজী হাসলো।

তার উর্দু শুনেই যেন হেসে লুটোপুটি খেল রোজিনা।

ভামজী অপ্রতিভ হল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাংলা না জানার দরুন এই প্রথম সে ভারী লজ্জা পেল। বলল, হাম বাংলা শিখবে, শিখলাবেন ?

রোজিনা সম্মতিসূচক একটা মধুভঙ্গী করল।

পরদিনই আর এক কাণ্ড। বড় সাহেবের চিঠি টাইপ করতে বসে রোজিনা হেসেই কুটিকুটি। হাসির শব্দে সচকিত হয়ে ভামজী তাকাল তার দিকে। রোজিনা বলল, ওমা, হাতের লেখার কি ছিরি !

ছিরি কথাটা বুঝতে না পেরে ভামজী চুপ করে রইল। রোজিনা তখন হাতের ছোট্ট রুমালটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাসল, হাভ ইউ এভার সিন সাচ এ হ্যাণ্ডরাইটিং ?

ভামজীর মুখ থেকে সহসা বেরুল, কভি নেহি।

রোজিনা হাসতে হাসতে তার পাশে এসে দাঁড়াল। ভামজী তাকাল চিঠিটার দিকে। হাতের লেখার বড় বেশী দোষ নেই। খুব খারাপ নয় বড় সাহেবের হাতের লেখা। আর পাঁচ বৎসরের অভ্যাসে এ হাতের লেখা তো ভামজীর কাছে সরল রেখার মত সহজ। তাই মৃদু হেসে বলল, হামি পড়িয়ে দেবে ?

রোজিনা মধুর ভঙ্গীতে হাসলো, পড়ে দিলে আর কি হবে সাহেব ? এ হাতের লেখা চিনে উঠতেই আমার সাতদিন লাগবে। বলে সে হতাশভাবে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। ভামজী আর কথা বলল না। হঠাৎ চিঠিটা এনে নিজের মেসিনে চড়িয়ে দিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, ঘাবড়িয়ে মৎ হামি সব ঠিক করিয়ে দেবে। পহেলা পহেলা একটু তকলিফ হোবেই। জেয়াদা নেহি।

রোজিনা কৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে একটা মুগ্ধ কটাক্ষ হানল।

ভামজীর জীবনে এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। এতদিনে পর্বত-গুহায় শিলীভূত তুষার যেন অকস্মাৎ প্রাণ পেয়েছে। রক্তে পার্বত্য নদীর উদ্দাম স্রোত। চোখে রঙের নেশা। অদ্ভুত সব কল্পনায় আর কামনায় যেন মনটা সাঁওতালী বাজনার মত দ্রিম দ্রিম শব্দে বাজতে থাকে। স্যাভেজ রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আর মেয়ে দেখে না ভামজী, ফুরসৎ কই তার ?

দেয়াল ঘড়ির কাঁটা চারটের ঘর পেরুল। রোজিনা তখনও অলস ভঙ্গীতে চেয়ারে বসে। তার হাতের কাজ সব ক'টাই শেষ করে দিয়েছে ভামজী। তবু ছুটির পরও তাকে বসে থাকতে দেখে ভামজী অবাক হল। তার পরিচিত ভাঙ্গা বাংলায় বলল, আপনি যাচ্ছে না?

রোজিনা বলল, না, একসঙ্গে যাব। তাড়াতাড়ি করুন।

বিস্মিত ভামজীর মুখে কথা বেরুল না। কে যেন তার সমস্ত স্নায়ু ধরে আচমকা জোরে নাড়া দিয়েছে। এক বিস্ময়কর অনুভূতির তীব্রতায় আচ্ছন্ন চেতনা, মনে হল, রোজিনা তাতে অসংখ্য ফুলের পরাগ মাখিয়ে দিয়েছে।

আলো ঝলমল সন্ধ্যায় দুজনে রাস্তায় বের হল। রোজিনার পরনের নীল রঙের শাড়ীতে শুভ্র উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন সারা দেহে এক আশ্চর্য নীলাভ জোছনা সৃষ্টি করেছে। কিছুক্ষণের জন্য ভামজী আত্ম-বিস্মৃত হল। সমস্ত দীনতা-হীনতার ঊর্ধে দিগ্বিজয়ী পৌরুষ চেতনা তাকে আচ্ছন্ন করল। মস্তিষ্কের কোষে যেন সম্রাট চেঙ্গিস খাঁর অশ্বখুরের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কে বলবে এখন সে ন্যাশনাল বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেডের অখ্যাত, লাঞ্ছিত, দরিদ্র টাইপিষ্ট।

লা সানির কাছে এসে রোজিনা থামল। চলুন, এক কাপ চা খাওয়া যাক। এতটা পথ আপনাকে হাঁটিয়ে আনলাম। ভামজী আমতা আমতা করল। রোজিনা হাসির তরঙ্গ তুলল, বেশ ত প্রতিদানে না হয় আর একদিন আপনি খাওয়াবেন।

এবার আর আপত্তি করা গেল না। সম্রাট চেঙ্গিস যেন বিজিত রাজ্যের দুর্গ প্রাকারে ঢুকছেন। অসংখ্য বিস্মিত, ঈর্ষান্বিত, মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি হেলায় এড়িয়ে বিজয়ীর পদক্ষেপে দরজা পেরুল ভামজী। আর সেই সঙ্গে নিয়ন গ্যাসের অত্যুজ্জ্বল আলোয় সাবানের ফেনার রঙিন বুদবুদের মত তার সমস্ত কল্পনা মুহূর্তে উবে গেল। রোজিনার পাশে নিজেকে দাঁড় করিয়ে সহসা মনে মনে বড় অপ্রতিভ হল ভামজী! ছিঃ, কি তার চেহারা, কি পোশাকের ছিরি। এতক্ষণ খেয়ালই করেনি সে। আজ দুদিন ধরে ব্লেডের অভাবে দাড়ি কামানো হয়নি। খোচা খোচা জংলা দাড়িতে সারা মুখটা ভরে আছে। তেলের অভাবে মাথার

চুল উস্কুখুস্কু। ততোধিক হতশ্রী কাপড়-চোপড়গুলো গায়ের। হাওয়াই শার্টটার রং এককালে "ডিপ-ব্লু" ছিল, এখন সে সম্পর্কে রীতিমত গবেষণা করতে হয়। সাদা প্যাণ্টটার এখানে ওখানে ধুলো আর কাদার ছিটে লেগে আছে। পায়ের কাবলি স্যাণ্ডেলটার বহু বিচিত্র বর্ণের চামড়ার জোড়াতালির চিহ্ন মিলে দেখবার মত বস্তু হয়েছে।

ভামজী মনে মনে লজ্জায় মরে গেল। ছিঃ ছিঃ এই কি রোজিনার পাশে এসে দাঁড়াবার মত চেহারা না পোশাক?

রোজিনা ততক্ষণে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেছে। ভামজীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলল, ওকি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন!

ভামজী পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিল।

পরদিন অফিসে ঢুকে আর নিজের ঘরে নয়, সোজা ক্যাশিয়ারের টেবিলে গিয়ে দাঁড়াল ভামজী। বলল, কছু এ্যাডভান্স।

—এ্যাডভান্স! ক্যাশিয়ার বিস্মিত হল। ভামজীর পাঁচ বছরের চাকরি-জীবনে এই প্রথমে সে এ্যাডভান্সের জন্য এসে দাঁড়িয়েছে।

বলল, কত?

—পঁচাস।

—পঞ্চাশ?

ভামজী মাথা নাড়ল, হুঁ।

বিস্মিত ক্যাশিয়ার আর কথা বলল না। সে জানে, ভামজী হিসেবী ছেলে। চাকরি জীবনে সে কোন দিন এ্যাডভান্স নেয় নি, আজ খুব ঠেকায় না পড়লে পঁচাত্তর টাকার মধ্যে পঞ্চাশ টাকাই আগাম চাইতে পারত না। তাই টাকা কটা গুণে দিতে দিতে বলল, বাকী মাসটা চলবে কি করে হে?

ভামজী জবাব দিল না। কথাটা সে-ও ভাবছিল। তার গোনাগুনতির টাকা। পাঁচ টাকা তার থাকার ছোট্ট গুদাম ঘরটির ভাড়া। ত্রিশ টাকা দিতে হয় মেসে। দশ টাকা দিতে হয় হ্যাপি রেষ্টুরেণ্টের মালিককে। বিনিময়ে সকাল বেলা দুটো টোষ্ট আর চা, একটি সিগারেট তার পাওনা। এর মধ্যে আবার ফাঁক খুঁজে খুঁজে ধোপা, নাপিত, সিনেমা, বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়নের খরচ যোগাতে হয়। সুতরাং মাস শেষ হওয়ার আগে এই

পঞ্চাশ টাকা আগাম খরচের ঝামেলা অনেক। তবে ভরসার কথা, গত পাঁচ বৎসরে ভামজী দেনা-পাওনার ব্যাপারে কারও সঙ্গে দ্বিরুক্তি করে নি, কথার খেলাপ করে নি। তাই হঠাৎ একটু টানাটানিতে পড়েছে বললে, হ্যাপি রেষ্টুরেণ্টের মালিক থেকে বাড়ীওয়ালা অবধি সকলেই তাকে অন্ততঃ দু-একমাস টাকার জন্য তাগাদা দেবে না।

পঞ্চাশ টাকা খরচ হতে দেরী হল না। সেদিন ভামজী অফিসে একটু লেট হয়ে গেল। রোজিনা বড় সাহেবের চিঠি হাতে টাইপ রাইটারের সামনে বসে হাঁসফাস করছিল। এমন সময় ভামজীকে দেখে হেসে ফেলল। আজ তার ক্লীন সেভ্‌ড্‌ মুখ, পরনে হোয়াইট জিনের কড়া ক্রিজের প্যাণ্ট। গায়ে সাদা হাওয়াই শার্ট। পায়ে কাবুলির বদলে প্রাচীন গ্রীক চপ্পল টাইপের স্যাণ্ডেল সু। রোজিনা হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গীতে বলল, সুপ্রভাত।

ভামজী কিছুটা অপ্রতিভ হল। সহসা তার এই পারিপাট্যে রোজিনা কিছু ভাবল কিনা, কোন অর্থ করে বসল কিনা ভেবে সে লজ্জিত হয়ে পড়ল। কথা বলতে পারল না।

রোজিনা আব্দারের ভঙ্গীতে বলল, কই বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

ভামজী জোর করে লজ্জামুক্ত হয়ে বসতেই রোজিনা হঠাৎ বিষণ্ণ মুখে দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়ল, আমার নকরি আর রইল না মিঃ ভামজী!

ভামজী মুহূর্তে কালো হয়ে গেল, বলল কেন?

সশব্দে নতুন মেশিনটাকে নেড়ে রোজিনা বলল, এই দেখুন না, এই মেশিনটাকে নিয়ে আমি আর পারছিনে। এদ্দিন তবু আপনি দয়া করে আমার কাজগুলো করে দিয়েছেন, তখন গোল ছিল বড় সাহেবের হাতের লেখা। এখন হাতের লেখা যা একটু বুঝে উঠেছি, অমনি গোল বাধিয়েছে মেশিনটা। নতুন মেশিনে কাজ করা এত ঝক্কি কে জানত, দেখুন।

ভামজী এগিয়ে এসে দেখল, একটা চিঠির অর্ধাংশ রোজিনা টাইপ করেছে। দেখেই বুঝল, এপ্রেন্টিসের কাজ। কোথাও লাইন বেঁকে গেছে। হরফ ঠিক মত বসে নি, স্পেস ঠিক মত হয়নি। তাই মেশিনটার

ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে প্রথম দিন বড় সাহেবের হাতের লেখা না বোঝার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল।

রোজিনা তার মনের ভাব আন্দাজ করে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। বলল, আপনি ভাবছেন আমি কাজ জানি না, না? ফাঁকি দিয়ে চাকরি নিয়েছি। এটা আপনার ভুল ধারণা, মিঃ ভামজী। আমার কাছে ইনল্যাণ্ড কমার্শিয়াল কলেজের সার্টিফিকেট আছে, দেখবেন?

ভামজী গভীর সহানুভূতির সঙ্গে মৃদু হেসে বলল, না, হামি বিসওয়াস্ করে।

রোজিনা গম্ভীর হয়ে বলল, নতুন মেশিন, এখনও তেলতুলো পড়েনি। তাই প্রথম দিকে ঠিকমত চলছে না। আপনি তো পুরুষ মানুষ, দেখুন না শক্ত হাতে এটাকে ঠিক করে নিতে পারেন কিনা।

ভামজী জবাব দিল না। ততক্ষণে তার সব সঙ্কোচ কেটে গিয়েছে। মেশিনটাকে নিজের টেবিলে তুলে নিয়ে অভ্যস্ত হাতে চিঠিগুলো টাইপ করতে বসে গেল। রোজিনা তার দিকে চেয়ে সলজ্জ মধুর ভঙ্গীতে হাসল।

সেই থেকে ব্যবধানটা আরও কমল। সেই সঙ্গে ভামজীর জীবনে আর রোজকার ঘড়ি বাঁধা কাজেও যেন পরিবর্তন এল। এখন রোজ দাড়ি কামানো, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখার দিকে তার গভীর মনোযোগ। ঘড়ির কাঁটা ধরে অফিস ছেড়ে বেরোয়, সঙ্গে রোজিনা। মাসের পয়লা দিকে রিকশায়, তারপর পায়ে হেঁটে। চালচলন কথাবার্তাতেই বাঙ্গালীয়ানা এল। চুলের মাঝে বরাবর আগে সিঁথি কাটত ভামজী, তা নামতে নামতে প্রায় কানের গোড়ায় নেমে এল। অফিসে ঢুকতেই তার প্রথম কাজ রোজিনার আর্জেণ্ট ফাইলগুলো সেরে ফেলা; তারপর রোজিনাকে নতুন মেশিন চালু করা শেখাবার নামে কাজ শেখানো। ছলটুকু দু'জনের কাছেই পরিষ্কার। ভামজীর ফাইলের কাজ দিন দিন স্তূপীকৃত হয়ে উঠে। সে ভাবে, ফুরসৎ মত একটা ছুটি দিলে দেখে সব করে রাখলেই হবে। রোজিনা উৎসাহ দেয়, একদিন দু'জনে মিলে করলে ও কাজ আর কতক্ষণ লাগবে?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে পরম আশ্বাসে ভামজী হাসে। শীতের শেষে বসন্ত ছোঁয়ায় নতুন পাতা শোভিত গাছের মত হঠাৎ যেন সেই জীর্ণশীর্ণ ভামজী নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

ঘড়ির কাঁটা চারটের ঘরে পোঁছতে আজ ভামজীই প্রথম বলল, চলুন, যাওয়া যাক।

এখন তার কথা আর ভাঙ্গা বাংলা ও উর্দু'র মিশ্রণ নয়। রোজিনা খুশি হয়ে বলল, এক মাসেই কিন্তু আপনি কথা বলায় চমৎকার উন্নতি করেছেন। চলুন। অফিস থেকে বেরিয়ে দু'জনে বিকেলের জনস্রোতে মিলিয়ে যায়।

জনস্রোতে হারিয়ে গিয়ে জীবনটাকে পরম রমণীয় মনে হল ভামজীর। এতদিনে যেন এই জীবনটাই সাদা-মাটা হয়ে খণ্ড খণ্ড রূপে আকাশে দিগভ্রষ্ট মেঘের মত ঘুরে বেড়াত, হঠাৎ তা সূর্যের ফাগ লেগে ফাল্গুনের কৃষ্ণচূড়ার মত রঙে বর্ণে অপরূপ রঙিন হয়ে উঠেছে। আকাশে গোধূলি মেঘের রক্তাভার দিকে তাকাল ভামজী—ঠিক অমনি।

ইচ্ছে ছিল সার্পেণ্টাইন লেকে বেড়াতে যাওয়ার। কিন্তু ছবি-ঘরের সামনে সুজন হেওয়ার্ডের লাস্যময়ী ছবিটা দাঁড় করাল ভামজীকে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলে সে, তারপর জোর করে দ্বিধা ঘুচিয়ে বলল, পিকচারটা দেখলে হ'ত না।

রোজিনা হঠাৎ দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ল, না।

ভামজী বিমূঢ় হল। এরকমটা হবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাই সহসা তার মুখে কথা যোগাল না।

রোজিনা তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে বলল, আমাদের নিয়ে অফিসে কথা উঠেছে, জানেন!

—কোথা, কিসের কোথা ?

রোজিনা ভ্রূ বাঁকাল, ছিঃ ছিঃ, এদ্দিনেও আপনার উচ্চারণটা ঠিক হল না। কোথা নয়, কথা।

ভামজী ভুল শুধরে বলল, হ্যা, হ্যা, কথা—কিসের কথা ?

রোজিনা উষ্ণস্বরে বলল, কিসের কথা তা আপনি বোঝেন না ? এই যে আমরা কাজ শেষ করে রোজ এক সাথে অফিস থেকে বেরুই,

এতেই অফিসের অন্যান্য লোকেরা ইঙ্গিতে হাসাহাসি করতে শুরু করেছে। তার উপর এক সাথে সিনেমা দেখছি দেখলে আর উপায় থাকবে না। বড় সাহেবের চাপরাশি, সেই যে কি নাম, হ্যাঁ, পেয়ার বক্স। সে তো আমাদের এক সঙ্গে দেখলে সামনেই হেসে ওঠে!

ব্যাপারটা বুঝে ভামজী গম্ভীর হয়ে গেল। রোজিনার আজকের ব্যবহার অহেতুক নয়। তাই সহানুভূতিতে তার মনটা আর্দ্র হয়ে এল। বলল, ঠিক ঠিক, ছবি দেখা উচিত হোবে না।

রোজিনা বলল, আজ তাহলে এখান থেকেই বিদায় নেই, কেমন? কাল আবার দেখা হবে। বলেই মৃদু হেসে, লঘু গতিতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতদিন যে ভয় ছিল মনের অগোচরে, মাস তিনেক না যেতেই তা মূর্তি ধরে এল। বাড়ীওয়ালা চার মাসের বাকী ভাড়ার তাগাদা করে গেছে। হ্যাপি রেষ্টুরেন্টের মালিক বলেছে, আর তাকে খাওয়ানো চলবে না। বন্ধু-বান্ধবের কাছে, পান বিড়ির দোকানে, এখানে সেখানেও ধারকর্জ হয়েছে প্রচুর। এদ্দিন তার উপর সকলের যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ছিল, হঠাৎ যেন তাতে ফাটল ধরে গেল। আর ফাটল ধরতেই পাওনাদারদের তাগাদা তীব্র হয়ে উঠল। আগেকার জীবনে সুখ ছিল না, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। এখন সুখের লোভে স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে চারি দিকে আঁধার যেন জমাট বেঁধে উঠল। অথচ তিন চারটি মাস পাখীর মত উড়ে পালিয়েছে, একটুও অনুভব করতে পারেনি ভামজী। রোজিনার সাহচর্যে পকেটের পয়সা খরচ করতে ক্লেশ ছিল না। ছিল অফুরন্ত আনন্দ। তিন মাস না যেতেই সেই আনন্দের ফোয়ারার উৎসবে কে যেন একটা পাথর চাপা দিয়ে দিল।

মন খারাপ। তাই ব্যাপারটা প্রথমদিন লক্ষ্য করেনি সে। দ্বিতীয় দিন অবাক হয়ে দেখল একই ঘরে রোজিনা আর তার মধ্যে সেই নীলাভ পাতলা পর্দাটা আবার কে যেন টানিয়ে দিয়েছে। রোজিনার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই সে হেসে বলল, রাগ করেন নি ত' আবার।

—কেন?

পর্দাটা আবার টানিয়ে দিয়েছি বলে।

ভামজী জবাব দিল না। মুহূর্তে তার মনের ভাব আন্দাজ করে রোজিনা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, অফিসের লোকের কানাকানি আর সহ্য হচ্ছিল না। তাই টেনে দিলাম। ভাবলাম, একটা ফর্মালিটি তো মাত্র, ওটা মানতে আর বাধা কি? তাতে যদি এই নির্লজ্জদের কানাকানি বন্ধ হয়।

ভামজী হাসবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল, বলল, বেশ করেছেন। তারপর শ্রান্ত পায়ে এসে নিজের চেয়ারে বসল। কিন্তু টেবিলে হাত দিয়েই সে চমকে উঠল, তার নিজের কাজের ফাইলটা কোথায়? প্রাণ-পণে খেটে সে কাজগুলো প্রায় শেষ করে এনেছিল। ভয় ছিল বড় সাহেব না এর মধ্যে আবার তলব করে বসেন। তাহলে কি তিনিই নিলেন? রোজিনার টেবিলের কাছে এসে সে দাঁড়াল, আমার ফাইল?

—বড় সাহেব নিয়েছেন।

নতুন মেশিনের খট খট আওয়াজে রোজিনার স্বর ডুবে গেল।

সারাদিন নিজের ভাঙ্গা মেশিনটার সামনে স্থানুর মত বসে রইল ভামজী। আর গুণতে লাগল রোজিনার নতুন মেশিনের খটখট ধ্বনি। প্রতিমুহূর্তেই তার ভয় হচ্ছিল এই বুঝি বড় সাহেবের ডাক পড়ে, কিন্তু ডাক পড়ল না। চারটে না বাজতেই রোজিনা এসে কাছে দাঁড়াল। ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটিয়ে আবদেরে ভঙ্গীতে বলল, আজ কিন্তু আপনাকে না নিয়েই যেতে হচ্ছে। হঠাৎ দরকারী কাজে আটকে গেছি রাগ করবেন না যেন, কেমন? কাল থেকে আবার এক সঙ্গে যাব।

মুহূর্তে যেন হালকা ডানায় উড়ে গেল রোজিনা।

বড় সাহেবের কাছে ডাক পড়ল পরদিন। পাইপ ঠোঁটে তিনি জরুরী কাগজপত্র ওলটাচ্ছিলেন। ভামজীকে দেখে বললেন, তোমার গত কয়েক মাসের কাজের যা রেকর্ড দেখলাম তাতে তোমাকে জবাব দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কোম্পানীকে স্রেফ ফাঁকি দিয়েছ তুমি। তবু পুরনো লোক বলে নোটিশ পিরিয়ডের বেতনটা তোমাকে দেওয়া হবে, যাও।

ভামজী কি বলতে যাচ্ছিল গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। বড় সাহেব ঠোঁট থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, উহু কোন আপিল চলবে না;

তোমার চেয়ে মিস রোজিনা নতুন লোক হয়েও ভাল কাজ দেখিয়েছে। তাই ভাবছি তোমার পোষ্টেও একটি চটপটে একটিভ ইয়াং গার্লকেই বসাব। আর কথা নয়, যাও। তোমার নোটিশ আমি সই করে দিয়েছি।

বড় সাহেব মিথ্যে বলেন নি। নিজের কামরায় ঢুকতেই ভামজীর চোখ পড়ল টেবিলের উপর মেটে রঙের খামটায়। খুলতেই টাইপ করা চিঠিটা যেন কথা বলে উঠল, ইওর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড ·· বাকী কথাগুলো ঝাপসা হয়ে এল। ভামজী চোখ মুছে ফের তাকাল, নীচে বড় সাহেব সই করেছেন, তারও নীচে টাইপিষ্টের নামের আদ্যাক্ষরটি, তার মানে রোজিনা। কোথাও লাইন বাঁকা-চোরা হয়নি। স্পেস কম বেশী পড়েনি, হরফ ওলট-পালট হয়নি.। চমৎকার নিখুঁত টাইপ করা চিঠি। ক্ষণিকের জন্য হলেও তৃপ্তিতে মুখ উজ্জ্বল হল ভামজীর।

শেষবারের মত নিজের চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। পেছনে পাতলা নীলাভ পর্দাটা মৃদু হাওয়ায় দুলছে। একটানা খটখট আওয়াজ রোজিনার মেশিনে।

ভামজী ধীর পায়ে রাস্তায় নেমে এল।

সৈয়দ শামসুল হক

কালামাঝির চড়নদার

থেকে থেকে বাতাসের দাপট। আকাশ জুড়ে ঘন মেঘ করেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, না যেন হাহাকার করে উঠছে বিশাল নদীটা। খলখল করে বয়ে চলেছে, আঁধারে একটা মাতাল দরিয়ার মতো মনে হচ্ছে বুড়ী ব্রহ্মপুত্রকে।

খেপছে। আজ আর ছাড়ান নাই। দিবো ডুবাইয়া।

ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলো আছড়াতে থাকে, যেন পানির কুমীর গলায় রশি দিয়ে কেউ বেঁধে রেখেছে। লেজ তুলে তুলে মারছে। শুয়ে থাকা যায়না। নৌকায় নৌকায় মাঝিরা গুটি মেরে বসে আছে, হুঁকোর আগুনটুকু ধরাবার মতো সুস্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না।

কেবল একটা নৌকা এক পো'ঘণ্টা আগে ছেড়ে গেছে। ওরা সবাই মানা করেছিল, তবুও। কালামাঝির গোঁ-টাই ও-রকম। আর, আল্লাহরও যেমন বুদ্ধি, সব আপদ-বালাই এক সঙ্গে দিতে না পারলে যেন তার সুখ নাই। কি দরকার ছিল সফেদ মল্লিকের বাপকে আজই মরণ-কাতর করবার। এই না হলে আজরাইল?

প্রথম দেখতে পায় ইদ্রিস। গলা বাড়িয়ে বলে—কেডা, কালামিয়া ভাই না? ফিরা আইলা বোধ করি?

উত্তরে ঝুপ করে একটা শব্দ হয় শুধু। শেষ কথাটা ঠাট্টা না সহানুভূতি বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে। লাফ দিয়ে পানিতে নেমে শক্ত করে বাঁধে নৌকাটা। হাঁপানির রুগীর মতো কষ্ট-শ্বাস নিতে নিতে আপন মনেই বলে।

সুমুন্দির বাতাস দিছে কি! যেন বেবাক গরত করবো। হঃ।

ওপরওলার উদ্দেশ্যেই ধিক্কারটা পাঠায় সে। জবাবে একটা বিদ্যুৎ চিরে যায় এঁকে বেঁকে, সবুজ সবুজ আলোয় এক পলকের জন্যে সারা ঘাট ঝলসে উঠে।

হ্যাঁ, ফিরে আসতে হয়েছে কালামাঝিকে। এত বাতাস যেন সমুদ্র উগড়ে পানি ঠেলে দিচ্ছে উজানে। একহাত এগুলে তিন হাত পেছুতে হয়। বৈঠা চলে না। লগি চালাবার জো নেই। দাঁড়ালে যেন আসমানে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়।

বাঁধা নৌকায় বসে ইদ্রিস অমন ঠাট্টা করতেই পারে। বেরিয়ে দেখুক তো! কোন্ বাপের পয়দা সে ঠাট করে বলে,

ফিরা আইলা বোধ করি।

নৌকায় উঠে বসতে বসতে সফেদ মল্লিককে আশ্বাস দেয় কালামাঝি।

হ্যান, এক রাইতে আপনের বাপ মরবো না। বিচার নাই? বাঁইচা থাকলি বিয়ানে রওয়ানা দিমু। তরতরাইয়া পোঁছাইয়া যামু। কি কন?

সফেদ মল্লিক কোন কথা বলে না। অন্ধকারেও কালামাঝি টের পায় লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এত যে সৌখিন দাঁড়ি তার, সেই দাঁড়িতেই হাত দিতে ভুলে গেছে সফেদ মল্লিক।

গঞ্জের হাটে কতদিন কালামাঝি চেয়ে চেয়ে দেখেছে সারাক্ষণ তাকে দাঁড়ি খিলাল করতে। সম্ভ্রমে সেলাম করেছে। সফেদ মল্লিক হেসে অনুগ্রহ করে বলেছে, কি মিয়া কেমুন আছো? দেহিনা যে!

ওটা একটা কথার কথা—না দেখাটা। তাতেই কৃতার্থ হয়েছে কালামাঝি।

যাও, এক বদনা পানি আইনা ছাও চে'—আছরের নামাজটা পড়ি।

পানি এনে দিয়ে ধন্য হয়েছে সে।

সেই সফেদ মল্লিকের ওপর ক্ষেপে উঠলো কালামাঝি। তাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে ঝংকার দিয়ে বলল, আমি করমু কি আর? দোষ য্যান আমার। নাও তো ছাড়ছিলাম। কোনো শালার তো হেই মুরাদটাও হয় নাই। কন?

নড়ে ও'ঠে বিহ্বল ছায়া-মূর্তিটা।

হ, তুমি কি কইরবা ভাই। দোষ দেই আমার বরাতের।

এতক্ষণে তবু যা হোক একটা কথা বেরুলো মুখ থেকে। তখন রাগটা হঠাৎ পানি হয়ে যায় মাঝির। অনুতাপে একটু দূরে সরে বসে। বলে,

শুইবেন? জাগা দিমু?

আর শোয়া আমার। কালাভাই, বাজানরে বোধ করি আর শ্যাষ দ্যাখা দেইখবার পারমু না।

পাইরবেন না ক্যান? আল্লার মরজি থাকলি কি-না হয়!

এতক্ষণ যে আল্লার ওপর অভিসম্পাত দিচ্ছিল কালামাঝি এখন তারই মাহাত্ম্য সোৎসাহে বর্ণনা করতে লেগে যায়।

একবার শোনেন কই—জষ্টিমাস। কলি মনে কইরবেন কালা একটা তুলকালাম মিছা কথা কয়। সোয়াগপুরের খোনকার বাড়ী, বড় মিয়াসাব আমাকে ডাক দিয়া কয়—

এসব কথা ভালো লাগেনা সফেদ মল্লিকের। তার বাবা মৃত্যু শয্যায় শুনে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে এই আগাম তুফানের মধ্যে ঘাটে এসেছে সে। বারো মাইল দূরে গাঁ, তাই যেতে পারছে না। রওয়ানা হয়েছিল কালামাঝি, ফিরে আসতে হয়েছে। সেই দুশ্চিন্তায় গলা পর্যন্ত কাঠ হয়ে যায় কালামাঝির।

থোও কালাভাই। তুমি চায়্যা দ্যাহো, তুফান কি কয়।

বাইরের দিকে অনাবশ্যক চেয়ে দেখে সে।

বোধকরি শ্যাষ রাইতের আগে থামবো না।

কও কি?

হ। আল্লা ভরসা।

সত্যি কেমন মায়া করতে থাকে কালামাঝির। আহা হা, বাপ মরে, ব্যাটা দেখতে যেতে পারছে না।

ঘাটে এসে একেকজনের পা ধরতেও কসুর করেনি সফেদ মল্লিক।

আমার যাওয়াই লাগবো বুইঝলা মাঝি। বাজান বোধকরি আর বাঁচবোনা—নিয়া যাও ভাই, যা চাও দিমু। তোমরা বলে কত ঝড় তুফান পাড়ি দিছাও। আইজ ডরাইলা?

কি করি কন? জান বাঁচায়া কাম করা লাগে।

যাইবা না?

একেবারে মুখের ওপর না করেনি কেউ। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। গঞ্জের বিত্তশালী কারবারী সফেদ মল্লিক, তাকে সরাসরি বলতে বাধো বাধো ঠেকে।

অবশেষে কালামাঝি রাজী হয়েছিল। কিন্তু সেও পারল না। বাতাসের দাপটে তার নৌকা ফিরে আসতে বাধ্য হলো ঘাটে।

কেডা ?

আমি ইদ্রিস।

কি চাস ?

কালামাঝি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

ম্যাচবাত্তিটা দেওচেন কালাভাই। তামুক সাজুম।

তামুক সাজবা। হঃ। আছাও শালার সুখে। টের পাও না।

জেদ করে বেরিয়েছিল, সকলে মানা করেছিল—কামটা ভালো কইরলা না কালাভাই—তারপর ফিরে আসতে হয়েছে। সেই লজ্জা ঢাকবার জন্যেই বোধ হয় অহেতুক উষ্মা ফুটে ওঠে তার গলায়।

যাও, দিবার পারমু না।

কেমন দেইখলা তুফান, অ্যাঁ ?

ইদ্রিস অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে। কালামাঝি কোন কথা বলে না। তখন সে গজ গজ করতে করতে ফিরে যায়।

একটা প্রবল বাতাস ওঠে। বৃষ্টি পড়তে থাকে গুড়গুড়।

আইসা পড়ছে, সফেদ ভাই।

কে ? কেডা ?

ধড়মড় করে উঠে বসে সফেদ মল্লিক।

তুফান।

ওঃ, তাই কও।

নৌকার বাঁধনটা যেন ছিড়ে যাবে, এত জোর বাতাস। আরেকটা বাঁধন দিতে পারলে হতো। কালামাঝি নামবার জন্যে নড়ে ওঠে, আবার কি ভেবে স্থির হয়ে বসে। বলে, তুফান যহন আইসা পড়ছে, থাইকবো না বেশীক্ষণ। আপনে জুৎ কইরা শোন। সুবিধা দেখলি আমি নাও ছাইরা দিমু।

কিন্তু সে ঝড় থামে না সহজে। পলে পলে যেন তার আক্রোশ বেড়েই চলেছে। নৌকার ভেতরে পাগলা পানি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে সব কিছু।

বাবার জন্যে কটা পাউরুটি নিয়েছিল সফেদ মল্লিক, সেগুলো ভিজে ফুলে একাকার। গামছা দিয়ে ঢেকে ঢুকে রাখবার চেষ্টা করে সে। কিছু হয় না।

কালামাঝি নিঃশব্দে নৌকাটার আকুলি বিকুলি দেখে আর চোরের মত অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, যেন অপরাধটা তার।

অনেকক্ষণ পর সফেদ মল্লিক বলে,

কালাভাই !

কন।

আর কিছু শোনা যায় না। কালামাঝিও দ্বিতীয়বার জিগ্যেস করে না। একটা ডাকের মধ্যে অনেক কিছু যেন তার শোনা হয়ে গেছে।

নদীর ওপরে অন্ধ বাতাস ফুঁসছে। কালামাঝি যেন সেইটে শোনবার চেষ্টা করে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এক করে।

আবার সেই ডাক।

কালাভাই !

পাশ ফেরে সফেদ মল্লিক। কেমন লজ্জা জড়িত কণ্ঠে বলে, গঞ্জে যহন কাটা কাপড়ের দোকান দেই কালাভাই।

হ।

বাজান আমাক কয়, রূপার হুকা বানায়া দিস আমাক। বাজানের খুব হাউশ আছিল একখানা ফর্সীর।

হ। তান্‌রে তো চিনি। হাউশ আলা মানুষ আছিল খুব? হাউশ, বলে হাউশ। তিনপদ সালুন না হলি ভাতের থালি ঢ্যালি দিয়া ফালাইয়া দিত।

হেইদিন কি আর আছে সফেদ ভাই? আমরা হইলাম গাফিল বান্দা, দুনিয়ার ব্যাক আজাব অহন আইয়া পড়ছে।

হুঁ।

সফেদ মল্লিক মুখে সায় দেয়। মনটা তার ঘুরতে থাকে বাপের কাছে কাছে। নিজের ফেলে আসা অতীতে। জোনাকীর মত স্মৃতির অন্ধকারে চোখ তার জ্বলে, নেবে, জ্বলে।

আবার সে বলে,

তোমার মনে আছে নাহি কালাভাই? সিংগার মেশিন ঘাড়ে নিয়া সোয়াগপুরের হাটে যাইতাম? নয় কোশ রাস্তা পাথারের মধ্যি দিয়া!

কালামাঝি আবার ধ্বনি তুলে সায় দেয়। সফেদ মল্লিক আবছা হাসে, দুঃখের মধ্যেও হাসে, বলে,

ঘাড়ে কয়ড়া পইড়া গেছিল। বাড়ী ফিইরা বিষে গতর তুইলতে পাইরতাম না। বাজান গোসা কইরা কইতো, ট্যাকার জন্যি তুই পাগল হয়্যা গেছাস সফেদ। আবার মায়েক ডাক দিয়া ত্যাল গরম কইরা মালিশ দিবার কইতো।

হ। খাইটছেন খুব সফেদ ভাই। বাপের জানতো। ব্যাটার বিষে তান্ না কানলি, কাইনবো কেডা?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সফেদ মল্লিক।

স্থাহোচেন, তুফান কি কয়? রওয়ানা দিবার পাইরবা? বোধ করি না।

আবার নীরব হয়ে যায় দু'জন। অনেকক্ষণ।

কালাভাই।

কন।

ঘুমাইলা?

কি যে কন সফেদ ভাই, তুফানে ঘুম আহে নাকি? আপনে শুইয়া থাহেন ভাই, গতিক ভালো দেখলি আমি নাও ছাইড়া দিমুনে।

না, না, হেকথা কইনা। তোমাক দোষ দেই না। এট্টু সজাগ থাইকো।

এতক্ষণে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। নাঃ, নৌকাটাকে আরেকবার না বাঁধলে চলছে না। কালামাঝি রশিহাতে নেবে পড়ে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে। আর্তকণ্ঠে সফেদ মল্লিক বলে ওঠে,

কি হইলো কালাভাই?

কিছুনা। আপনে আরাম করেন।

ক্ষিপ্রহাতে আরেকটা বাঁধন দেয় কালামাঝি। দুলুনিটা কমে আসে নৌকোর। আশে পাশের নৌকাগুলো আছড়াচ্ছে, তাদের ভেতর থেকে কোনো শব্দ আসছে না। ইদ্রিসকে বসালেও হতো। মনে মনে কালামাঝি আরো একটা মানুষের সঙ্গ খোঁজে সর্বনাশা তুফানে। পরক্ষণেই জলে উঠে আবার। না ডেকেছে, ভালোই করেছে। সব শালা ভীতু। বসে বসে তামাক টানবে আর কালামাঝির গোঁয়ার্তুমির প্রতি ইঙ্গিত করবে। মরুক, দোজখে যাক ইদ্রিস।

কালাভাই।

তার চেয়ে সফেদ মল্লিকের সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। চুক্‌চুক্ করে কালামাঝি আফশোষ করে। এ-রকম ভারী তুফান না উঠলে ঠিক গাঁয়ে পোঁছে দিত তাকে যেখানে তার বুড়ো বাবা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে। আজরাইল হয়ত এতক্ষণে তার কালো জোব্বা পরে বুড়োর বাঁ পাশে পায়ের কাছে এসে বসেছে। কালামাঝি শুনেছে, ঐ রকম করে এসে বসে মৃত্যুর ফেরেসতা। চেয়ে চেয়ে দেখে বাল বাচ্চা প্রিয়জনের মুখ। তাদের কান্না শোনে, আর মনে মনে আল্লাকে বলে,

ইয়া আল্লা, আমাক এতবড় একটা শক্ত কাম দিলা? হ্যাঁ, পারতো কালামাঝি। তুফানটা যদি না থাকত, পারত। আড়াই কুড়ি বয়স তার। এই বয়সে এত বড় তুফান আর দেখেনি সে। ক'টা জাহাজ আজ মারা পড়বে আল্লাহ জানে।

মনে মনে দরুদ পড়তে থাকে কালামাঝি।

ও কালাভাই!

সফেদ মল্লিক আবার তাকে ডাকে। ডাকটা প্রবল বাতাসের মুখে একটা চড়ের মতো কালামাঝির কানে আছাড় খেয়ে পড়ে।

ছোটকালে কালাভাই—

সফেদ মল্লিক ফিসফিস করে বলে,

বুইঝলা, বাজান আমাক হাটে নিয়া যাইতো। হাঁইটবার পাইরতাম না। এক কোশ রাস্তা তহনো বাকী। অমাবইস্যা। পাও বিষ করে। আবার ভূতের ডর করে। বাজান আমারে কান্ধে নিয়ে জোরে জোরে গান গাতি গাতি বাড়ী আইসতো। আমি ঘুমায়া পইরতাম। যহন

ধুপ কইরা বাড়ীর উঠানে নামাইয়া দিত ; মায়ে কইতো, বাপের ঘাড়ে চইড়া আইতে শরম করে না বুইড়া মরদা। বুইঝলা কালাভাই, বাজান শুইনা যে হাস কইরতো—য্যান কি মজার কথা।

এসব কথার কোনো জবাব হয় না। তার বদলে কান খাড়া করে কালামাঝি তুফানের গতি নিরিখ করবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে রাত দু'পহর হয়ে গেছে। আর কতক্ষণ এ রকম চলবে কে জানে।

অনেকক্ষণ পরে সফেদ মল্লিক আবার বলে,

বাজান চৌবাড়ী ইস্কুলে ভর্তি কইরা দিল। কপালে না থাকলি বিদ্যা হয় না কালাভাই। বই পুস্তক ফালাইয়া থুইয়া আমি দয়ে গিয়া ঢ্যাপ গুঁইজতাম। কওচেন, বিদ্যা—তা ফালাইয়া ঢ্যাপ। বাজানের বড় হাউশ আছিল, আমি দারোগার চাকরিত যাই।

হ। পাইরতেন মনে কয়।

বাজান যা মারছিল কালাভাই। ফেল কইরা সাতদিন বাড়ী যাই নাই। রাইতে পলায়্যা পলায়্যা বাঁশ ঝোঁপের পাছে মায়েক ডাক দিতাম। ভাত আইনা দিত। খ্যায়া আবার চম্পট। পরে শুনছিলাম, বাজান টের পাইছিল সব, তেও মায়েক কিছু কয় নাই। আমি কই, বোধ করি মাইরাই ফালাইবো। আমাকো, মায়েকেও।

তাকি হে পারে।

সান্ত্বনা দেয় কালামাঝি। কিন্তু গলাটা কাঠ হয়ে আসে তারো। আজরাইল এতক্ষণ কি করছে কে জানে। এতক্ষণে হয়ত আরো খানিকটা এগিয়ে বসেছে সফেদ মল্লিকের বাপের বিছানায়। কান পেতে শুনছে, কেউ কাঁদে কি-না। কালামাঝি শুনেছে, ছেলেমেয়েরা কাঁদলে আজরাইলও কাঁদে। তারা যখন কাঁদে তখন আর সে জান কবচ করতে পারেনা। তবু আল্লাহর হুকুম। বসে বসে সে ফাঁক খোঁজে—এক পলকের জন্যে ওরা কান্না বন্ধ করলেই সেই সুযোগে জানটা নিয়ে আল্লাহর কাছে চলে যায় আজরাইল।

চিন্তা কইরেন না সফেদ ভাই। তার হায়াৎ আছে, হে বাঁইচবো।

কেমনে কও ?

মনে কয়।

একটা কথা কই কালাভাই

কনচেন।

আমার য্যান মনে কয়, এইডা আলামত। আমি শুনছি মউতের আগে এই রহম আলামত দেহায় আল্লাহ্।

তা কি কইবার পারেন? না, আমরা গোনাগার হে বুঝবার পারি?

শুকনো সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে কালামাঝি। কিন্তু তার মনটাও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। নিশপিশ করতে থাকে দু'হাত। দুই কুড়ি বছর সে নৌকা চালায়, আর আজ একটা তুফান দেখে ভয় পেয়ে গেল? তখন না ফিরে এলেই হতো। যা হয় হতো? সফেদ মল্লিক বাপের কাছে বসে থাকলেও আজরাইল দ্বিধা করতো জান কবচ করতে। এখন তো তার মহাসুযোগ। হয়ত এতক্ষণে নিয়েই গেছে জান।

তৌবা, তৌবা। মাফ কইরো আল্লাহ। খারাপ মনে কইরা কই নাই।

কালামাঝি অস্থির হয়ে ওঠে। একি অলক্ষুণে কথা তার মনে উঠল। না, সে বাঁচবে তার হায়াত আছে। কত মানুষ পাঁচ কুড়ি পর্যন্ত হেসে খেলে বেঁচে থাকে। আর সফেদ মল্লিকের বাপ বাঁচবে না?

নৌকা থেকে লাফিয়ে নামে কালামাঝি।

কি কইরতাছো ভাই?

নাও ছাড়মু।

পারবা,

আল্লাহ ভরসা। শ্যাষ চেষ্টা কইরা দেখি। আপনে হাইলডা ধইরা রাখতে পারবেন না?

পরদিন গঞ্জের ঘাটে একা ফিরে আসে অবসন্ন কালামাঝি। ইদ্রিস শুধায়,

কালামিয়া ভাই না?

হ।

নাও কই তোমার?

মারা পড়ছে।

কও কি? ক্যামনে?

আজ আর তার ওপর বিরক্ত হয় না কালামাঝি। পরিহাস মনে করেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে না। এক হাত দুর্বল ভাবে আধো আকাশের দিকে নেড়ে বলে,

তুফান জোর ধরছিল মাইঝ গাঙ্গে। বাপেরে থুইয়া ব্যাটাকে নিছে আল্লাহ। হে বুড়া কয়—আমারে তুমি বাঁচাইয়া রাখলা ক্যান?—আর কপাল থাবড়ায়। শ্যাষ রাইতে তার বিমার কইমা গেছে, ইদ্রিস।

অহন ভালা।

চমকে ওঠে ইদ্রিস। সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

হের তুমি কি কইরবা কওচেন!

শেষ

20187

বসন্তে সবুজ বাগে
বিকশিত আলো-ছায়
শুধু অন্তর গানে॥
তবু অন্তর বাণী বন্দে।।।